সত্যসন্ধানী সতীনাথ ভাদুড়ী

# জাগরী ও ঢোঁড়াই চরিতমানস

ডঃ স্বস্তি মণ্ডল

DATA ENTERED

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

*SATAYA SANDHANI SATINATH BHADURI*
*JAGARI O DHORAI CHARITMANAS*
By SWASTI MANDAL
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073
Rs. 50.00

প্রথম প্রকাশ : ১লা জানুয়ারি ১৯৮৫
পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০১, মাঘ ১৪০৭

প্রচ্ছদ : মিলন বন্দ্যোপাধ্যায়

B
891.443509
B4691
C4

517334

দাম : ৫০ টাকা

ISBN-7612-721-3

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু অলোক রায়কে—

# ভূমিকা

প্রায় পনেরো বছর আগে নিছক ভালো লাগার আনন্দে সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস, ছোটগল্প পড়তে শুরু করি। ক্রমেই তা ভালোবাসায় পরিণত হলো। 'জাগরী ও ঢোঁড়াই চরিতমানস' নিয়ে নিজের ভাবনা-চিন্তা শুরু করে ছিলাম। একটা ছোটো বই লিখেও ফেলি। স্নেহাস্পদ শ্রী অনুপরঞ্জন চক্রবর্তী সেদিন বইটি ছেপে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছিলেন। আজ আবার তাঁরই উদ্যোগে এবং দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার শ্রীসুধাংশুশেখর দে-র একান্ত সহযোগিতায় বইটির দে'জ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই বইয়ের প্রকাশ আমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয়, দু-এক জায়গায় সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়েছি। সত্য-সন্ধানী সতীনাথ, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শিল্পকীর্তি নিয়ে অনেক কথা বলার আছে। তা করতে পারিনি, তাই অতৃপ্তিবোধই পীড়িত করছে। ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন সেকাজ করে উঠতে পারি, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

পরিশেষে, যাঁরা আমার ক্ষুদ্র বইটি খোঁজ করেন বা অনেক সময় উল্লেখ করেন, তাঁরা হয়তো দে'জ সংস্করণ পেয়ে সন্তুষ্ট হবেন। তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্বস্তি মণ্ডল

বাংলা বিভাগ,
হরিমোহন ঘোষ কলেজ,
জে, ২০৬ পাহাড়পুর রোড,
কলকাতা-২৪।

## প্রাক্-ভাষ

সতীনাথ ভাদুড়ী জনপ্রিয় সাহিত্যিক নন। একই গ্রন্থের বহু সংস্করণের সাফল্য তাঁর ভাগ্যে কমই জুটেছে। 'দরদী কথাশিল্পী', 'যুগন্ধর সাহিত্যিক', 'বহু আলোচিত লেখক'—এসব কিছুই নন। আর এই জনপ্রিয়তা, সাহিত্যিক বিশেষণ—এর কোনোটার জন্যই তিনি উন্মুখ আগ্রহী ছিলেন না। তিনি অনেক লেখেন নি, অনেকদিন ধরে লেখেন নি, বাংলা উপন্যাস গল্পের চিত্তাকর্ষক ঐতিহ্যধর্মী লেখা একটাও লেখেন নি। পরিচিত রোমান্সমূলক ত্রিভুজ প্রেমকাহিনীর বিচিত্র দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাস গল্পের বিষয়বস্তু নয়। তিনি 'সকলের লেখক' কোনো দিন-ই হয়ে ওঠেন নি ; এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহও ছিল না। তিনি লিখেছেন স্বল্পকাল, ছিলেন অত্যন্ত প্রচারবিমুখ। তাঁর প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা পনেরোর বেশি নয় (বাঙালী লেখকদের এত স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থের তালিকা আগেরযুগে ও বর্তমানকালে নেই বললেই হয়)। এত কম লেখার কারণ মাত্র পনেরো যোলো বছরের (১৯৪৮-১৯৬৫) সাহিত্যিক জীবন মনে করলে ভুল হবে। আসলে নিজের সম্পর্কে যেমন নীরব, বাক্‌কুণ্ঠ ছিলেন তেমনি বহুলেখা সম্পর্কেও তিনি ছিলেন উৎসাহহীন। তিনি বিশ্বাস করতেন অনেক লিখলেই লেখা হয় না বরং অজস্র লেখার ফলে অধিকাংশ রচনাই শেষপর্যন্ত 'বাজে লেখা' হয়ে পড়ে থাকে। বাংলাসাহিত্যে আজ পর্যন্ত বহু মহৎ লেখকের অধিকাংশ লেখাই তেমন উন্নতমানের নয়। তাছাড়া সতীনাথ বুদ্ধিমনস্ক স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষণের গভীর দৃষ্টিতে অভিজ্ঞ বিশেষ চেতনার অধিকারী লেখক। প্রতিটি লেখা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। গোপাল হালদারের 'স্মৃতিচারণ' থেকে জানা যায়, টেবিলে পড়ে থাকা লেখা সম্পর্কে তিনি কৌতূহল প্রকাশ করলে সতীনাথ বাধা দিয়ে বলেন ওটা এখনও হয়নি আবার দেখতে হবে। লেখা সম্পর্কে তাঁর আত্মতুষ্টি ছিল না। ছিল না বলেই "ঢোঁড়াই চরিতমানস" দুটি চরণ লেখার পর 'ঢোঁড়াই' প্রবন্ধে নিজের অতৃপ্তি প্রকাশ করেছেন। এই আত্মতুষ্টির অভাব সতীনাথের মতো বিশিষ্ট মানসিকতার লেখকদের বারবার 'আরো ভালো লেখার' নিদর্শন সৃষ্টি করতে দেখা যায়। সতীনাথ শুধু বিদগ্ধ মানসিকতা নিয়ে বিষয় সম্পর্কে, সমাজদর্শন সম্পর্কে গভীরতায় মগ্ন হন নি, প্রত্যেকটি উপন্যাসের রচনারীতির ক্ষেত্রেও আলাদা আলাদা ভঙ্গির পরীক্ষা করে গেছেন। ভালো লেখার জন্য যে আত্মমগ্ন নিরীক্ষার প্রয়োজন তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। নামের মোহ, যশের আকাঙ্ক্ষা, বাক্‌সর্বস্ব প্রশংসাসূচক বাক্য, সম্বর্ধনা-উপহার সম্পর্কে একেবারে নিরাসক্ত ছিলেন।

সতীনাথ মহৎ লেখক। 'তিনি লেখকের লেখক'—কথাটি বলেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। তাঁর নিঃসঙ্গ নীরব প্রবাসী জীবন তাঁর 'বিরল বিদগ্ধ মানসিকতা' গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ব্যক্তিজীবনে নিঃসঙ্গ হলেও জীবনদৃষ্টির গভীরতায় প্রগাঢ় এবং সমাজ ও সময়-সচেতনতায় ঋদ্ধ। এই জীবনমুখীনতা গড়ে উঠেছে সাধারণ 'জনজীবন'কে কেন্দ্র করে। তাঁর সাহিত্যে মানুষের চলিষ্ণু গঠমান সত্তার চিরন্তন স্বরূপটি ধরা পড়েছে। পরিবর্তিত জীবনস্রোত ও সমাজ পরিবেশের নিয়ত রূপান্তর ও ভবিষ্যৎ প্রবাহকে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রত্যক্ষ চেতনা দিয়ে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তিনি গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন 'মানুষ বদলায় পরিবেশকে এবং পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে।' এই দ্বান্দ্বিক সত্যটিকে ধরতে চেয়েছেন তাঁর প্রতিটি উপন্যাস ও গল্পে।

সতীনাথ কালসচেতন বাস্তব শিল্পী। এই বাস্তব প্রতিবেশ একান্ত ভাবেই তাচ্ছিল্য, লাঞ্ছনা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অজ্ঞতা আর সংস্কারে ভারাক্রান্ত জীবন—এ জীবন মধ্যবিত্ত নগরবিলাসী পাঠকের মনকে কিছুতেই আকৃষ্ট করে না। তাঁর সমকালীন সময় ধারার বিবর্তনের স্বরূপকে ব্যক্তিচরিত্রের ক্রমিক বিশ্লেষণমূলক ভাবনায় ধরবার চেষ্টার মধ্যে যে গভীরতা ও চিন্তার বিচিত্র ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায় তাও সাধারণ পাঠকের পরিচিত রসাস্বাদনের প্রবণতাকে আহত করে—ফলে সতীনাথ আজও অনেকের অপরিচিত। ভবিষ্যতেও হয়তো বিরাট সংখ্যক পাঠকের নাগালের বাইরেই থেকে যাবেন। আর একটি কারণও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য — বহু প্রচলিত নয় এমন এক পরীক্ষা নির্ভর অথচ সরল 'লেখভঙ্গী' যা বিদগ্ধ, বুদ্ধিমনস্ক অন্তর্মুখী শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব তার চর্চা করেছেন প্রতিটি উপন্যাসে। ফলে প্রতিটি উপন্যাসেই তাঁর নিরীক্ষাধর্মী শিল্পীমানসটি ব্যক্ত হয়েছে। এই শিল্পশৈলী ধৈর্যশীল বিশ্লেষণে আগ্রহী পাঠক ছাড়া কাহিনী অনুরাগী, বর্ণাঢ্য বিষয় রোমাঞ্চে শিহরিত পাঠকের মনকে বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে না।

এইসব নানা কারণে সতীনাথ ভাদুড়ীর পাঠক বেশি নেই। সম্প্রতি তাঁকে নিয়ে বিদগ্ধ পাঠক শ্রেণী নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন। তাঁর বুদ্ধি মনস্ক গভীর বিষয়ভাবনা, সমষ্টি ও ব্যক্তির বিবর্তিত জীবনপ্রবাহের পরিবর্তমান আবর্তকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখার চেষ্টা, শিল্পরীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গভীর বিশ্লেষণী শক্তির সাহায্যে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধান ও অন্তর্মুখীনতা তাঁকে পাঠক প্রিয় লেখক করে নি। সতীনাথের মতো আরও কয়েকজন বাঙালী লেখকের নাম মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে—তাঁরা হলেন প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরাও পাঠকপ্রিয় লেখক নন কিন্তু স্ব-ভূমিতে সার্থক শিল্পী।

সতীনাথের স্বল্পস্থায়ী লেখকজীবনের কোন রচনাই সেই অর্থে বহু পরিচিত নয়। একমাত্র "জাগরী"[১] (১৯৪৫) ও "ঢোঁড়াই চরিতমানস" প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ (১৯৪৯, ১৯৫১) সবচেয়ে উল্লিখিত উপন্যাস। এছাড়া "চিত্রগুপ্তের ফাইল" (১৯৪৯), "সত্যি ভ্রমণকাহিনী" (১৯৫১), "অচিনরাগিনী" (১৯৫৪), "সংকট" (১৯৫৭), "দিগভ্রান্ত" (১৯৬৬ মৃত্যুর পর প্রকাশিত)-র মতো উপন্যাস এবং "গণনায়ক" (১৯৪৮), "অপরিচিতা" (১৯৫৪), "চকাচকি" (১৯৫৬), "পত্রলেখার বাবা" (১৯৫৯), "জলভ্রমি" (১৯৬২) ইত্যাদি গল্পসঙ্কলনের পরিচিতি খুব বেশি নয়। তবু সতীনাথ বাংলাসাহিত্যে বিশেষ মানসিকতার—জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষতা ও বাস্তবসমাজ-রাজনীতি সচেতন সজাগ মনোভঙ্গি ও গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন লেখকরূপে চিন্তাশীল পাঠকের কাছে অপরিহার্য।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জী রচনা করার মতো তথ্য তেমনভাবে পাওয়া যায় না। লেখক স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বাক্‌কুণ্ঠ ছিলেন। তাঁর সামান্য জীবনতথ্যের ওপর ভিত্তি করে শিল্পীমানসের পরিচয় সন্ধান করলে দেখা যাবে এক নিঃসঙ্গ অকৃতদার সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, দেশী-বিদেশী, বিশেষত ফরাসী সাহিত্য ও দর্শনে

অনুরাগী পাঠক, সমাজ-অর্থনীতি সচেতন মানুষ স্বকীয় চিন্তা-শিল্পভাবনায় স্বয়ংক্রিয় সাহিত্যিক ছিলেন সতীনাথ। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির কোনোটাই বিচ্ছিন্ন একক নয় ; সকলগুণের সম্মিলিত রূপই তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে সাহিত্যিক জীবনের সার্থকতায়, জীবন-রসিক মানবিক বোধসম্পন্ন শিল্পচেতনার সামগ্রিকতায়।

সতীনাথের পরিবারের আদি নিবাস নদীয়ার কৃষ্ণনগরে হলেও পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী (১৮৬৯-১৯৪৪) ওকালতি করতে আসেন পূর্ণিয়ায়।২ পূর্ণিয়ার ভাট্টাবাজারে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর সতীনাথের জন্ম হয়।৩ পূর্ণিয়া তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। জন্ম, বাল্য শিক্ষা, কর্ম ও রাজনীতিতে যোগদান ও ত্যাগ, সাহিত্যিক সাধনা ও অন্তিম মুহূর্ত সবই ঘটেছে পূর্ণিয়ায়। সতীনাথ ভালোবাসতেন পূর্ণিয়াকে। গভীরভাবে চিনতেন পূর্ণিয়ার মাটি ও মাটিসংলগ্ন মানুষকে। তাদের স্বভাব, সংস্কার, জীবনধারা, সেখানকার জলহাওয়া, প্রাকৃতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশকে নিজের অভিজ্ঞতার নিরীক্ষায় অন্তরঙ্গ করে রেখেছেন "জাগরী", " ঢোঁড়াই চরিতমানস" প্রথম ও দ্বিতীয়-চরণের মতো উপন্যাসে ও অসংখ্য গল্পে। কলকাতায় আসতেন প্রবাসী আত্মীয়ের মতো ; কিন্তু ভালোলাগত না নাগরিক জীবন ও তার কৃত্রিমতা। পূর্ণিয়া তাঁর জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়েছিল। তিনিও পূর্ণিয়ার মাটির স্পর্শ, গন্ধ, শব্দে শেষদিন পর্যন্ত অনেককিছু সন্ধান করে ফিরেছেন।

স্কুল জীবন থেকেই সতীনাথ ছিলেন কৃতী ছাত্র। লাজুক নম্র স্বভাবের এই মেধাবী ছাত্র পূর্ণিয়া জেলাস্কুলের অন্যান্য সহপাঠী, ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রিয় ছিলেন। স্কুলের হেডমাস্টারমশায় আর সংস্কৃতের পণ্ডিত তাঁর সাহিত্যে ('চকাচকী', 'বৈয়াকরণ' গল্পে) স্থান পেয়েছেন। সহপাঠীদের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'তে। এখান থেকেই ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সতীনাথ ফার্স্ট ডিভিশনে ডিভিশ্যনাল স্কলারশিপ পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর ১৯২৪-১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন পাটনায়। ১৯২৬-এ পাটনা সায়েন্স কলেজ থেকে আই. এস. সি. পাশ করে পাটনা কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। এখান থেকেই ১৯২৮-এ অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে দ্বিতীয়শ্রেণী পান। এরপর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩০-এ অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ করেন ও ১৯৩১-এ পাটনা ল' কলেজ থেকে বি. এল. পাশ করে ওকালতিতে যোগ দেন। ১৯৩২-৩৮ সাল পর্যন্ত ওকালতি করেন। এ জীবনের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে 'অনাবশ্যক' গল্পে। ওকালতি জীবনকে যে মেনে নিতে পারেন নি—তা ঢোঁড়াই চরিতমানসের উকীল চরিত্রসৃষ্টি থেকে বোঝা যায়।

ওকালতি জীবনে অবসর সময়ে সাহিত্যচর্চা করতেন তা তাঁর একটি মুদ্রিত চিঠি থেকে জানা যায়। তখন পূর্ণিয়ায় থাকতেন সাহিত্যিকদের 'দাদামশায়' কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে সতীনাথ নিত্য সাহিত্যের আসরে যোগ দিতেন। কেদারনাথও সতীনাথের শিল্পী-মানস সম্পর্কে আস্থাবান ছিলেন। সাহিত্যিক ভবানী মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যাচ্ছে বাংলা ১৩৩৮ সনের (১৯৩২) অগ্রহায়ণ, "বিচিত্রা" পত্রিকায় তাঁর প্রথম লেখা 'জামাইবাবু' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এছাড়া বন্ধু বিভুবিলাস

ভৌমিককে সতীনাথের লেখা চিঠি থেকেও জানা যাচ্ছে—'"নবশক্তি" পড় না বোধহয়। ওতে আমার লেখা গোটাকতক Satire বেরিয়েছে। এখন দ্বিগুণ উৎসাহে লিখছি।" এ থেকে বোঝা যাচ্ছে তেমনভাবে না লিখলেও সতীনাথের সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল তাঁর তরুণ বয়স থেকেই। কিন্তু পরিপূর্ণ সাহিত্যিক জীবনে প্রবেশ করলেন রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে ১৯৪৮ সন থেকেই — সে কথা পরে আলোচনা করা যাবে।

১৯৩২-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোটামুটি সাধারণ ব্যবহারজীবীরূপে জীবন যাপন করেছেন সতীনাথ। কলেজ জীবনে তিনি সক্রিয় রাজনীতি করেছেন বলে শোনা যায় না। তবে ১৯৩০-এ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের প্রভাব বিহার অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৪-এ গান্ধীজী পূর্ণিয়ায় আসেন এবং নওরত মাঠে ভাষণ দেন— সতীনাথ সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। " ঢোঁড়াই চরিতমানসে" গান্ধীজীর সভায় ঢোঁড়াই ও সাগিয়ার গান্ধী দর্শনে, মরণাধারের কাছে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের চিত্র বা ভলিনিটয়ারে 'সতিয়াগিরা' (সত্যাগ্রহ)—এসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সতীনাথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। অসহযোগের সময় পরিপূর্ণ রাজনীতি না করলেও সতীনাথ সঙ্গীদের নিয়ে ভাট্টাবাজারে মদের দোকানে পিকেটিং শুরু করেন এবং পুলিশের সঙ্গে তাঁর বহু তর্ক বিতর্ক চলে। এছাড়াও ইংরেজি শিক্ষা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নিজের পুরোনো জেলাস্কুলেও পিকেটিং করেন। এসময় গ্রন্থাগার স্থাপন, সমাজ সেবা কাজে সতীনাথের ছিল খুব আগ্রহ। বন্ধু বিভুবিলাস ভৌমিককে চিঠিতে লিখেছেন—'এছাড়া বাহাদুরী আর বাহবা নেবার জন্য কতকগুলি public activity দেখাচ্ছি। টুলের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা মেরেছি। একটা Public Trust Fund দেখবার জন্য এখানকার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছি। পূজোয় বলি তুলে দেবার জন্য mass meeting আহ্বান করচি।'

১৯৩৯ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর সতীনাথ কিছুটা আকস্মিকভাবে পূর্ণিয়ার টিকাপট্টির আশ্রমে যোগ দেন। আশ্রমের প্রধান ছিলেন সর্বোদয় নেতা বৈদ্যনাথ চৌধুরী। এই সময় থেকেই তিনি কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী বলে গণ্য হন। অবশ্য এর আগেই পূর্ণিয়ায় জেলাকংগ্রেস গড়ে ওঠে। তার নেতা গান্ধীবাদী গোকুল কৃষ্ণ রায়, সর্বোদয় নেতা বৈদ্যনাথ চৌধুরী প্রমুখ পূর্ণিয়ায় কংগ্রেস সংগঠন সক্রিয় করে তোলেন, তা সতীনাথের অপরিচিত ছিল না। তাছাড়া ওকালতির অবসরে তিনি রাজনীতি, গান্ধীবাদ, মার্কসবাদ,র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম, ক্যাপিটালিজম্, সোস্যালিজম, বৃটিশ ডেমোক্রেসি ; রাশিয়ার অর্থনীতি সমাজনীতি নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করতেন। তাঁর আকস্মিকভাবে রাজনীতিতে যোগদানের উপযুক্ত কারণ না জানা গেলেও মন যে আগে থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিল তা অসহযোগ আন্দোলনের ঘটনা, সমাজসেবা, তত্ত্বদর্শন পাঠের পরিচয় থেকেই বোঝা যায়। ১৯৪০-এর জানুয়ারী মাসে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করে হাজারীবাগ জেলে কারাবাস করেন। এসময় জেলজীবনে তিনি সময় কাটাতেন উর্দু ও ফরাসী ভাষা চর্চা করে এবং তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' পড়ে। সতীনাথের একান্ত সুহৃদ ডঃ বীরেন ভট্টাচার্যের 'সকল কাজের সেরা'[৪] থেকে জানা যাচ্ছে কংগ্রেসে যোগ দিলেও সতীনাথ কখনও রাজনৈতিক গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেন নি। ১৯৩১-এ 'তিনি মনে প্রাণে সোস্যালিস্টদের পক্ষপাতী। কম্যুনিস্টদের

সংগঠন ক্ষমতার তিনি প্রশংসা করতেন।' রাজনৈতিক নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে তাঁর আলাপ বহুকালের। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ৪২-এর আন্দোলনের পর জেল থেকে বেরিয়ে। সতীনাথ বিহারের সোস্যালিস্ট আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি এই দলে অল্পকালের জন্য যোগ দিয়েছিলেন। আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেবার সঠিক সাল তারিখ জানা যায় না। তবে যোগ যে দিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় জয়প্রকাশ নারায়ণের লেখা 'স্মরণাঞ্জলি'[৫] থেকে— 'আমার রাজনৈতিক জীবনের মধ্যবেলায় সতীনাথের সঙ্গে পরিচয়। কবে কোনসময়ে সতীনাথের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার—তা আজ মনে নেই। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পর জেল থেকে বেরিয়ে এসে ওঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। এরপর যখনই পূর্ণিয়া গেছি, সতীনাথের সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাৎ করতাম। সতীনাথ তখন পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের কর্ণধার। ওঁর বিশাল প্রাসাদ ছিল রাজনৈতিক কর্মীদের কেন্দ্রস্থল। আমার সোস্যালিস্ট পার্টি আগে কংগ্রেসের অংশ ছিল। এইজন্য সতীনাথ সহজেই এইদলের সংস্পর্শে আসেন এবং যোগদান করেন। তাঁর সংবদনশীল হৃদয় নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের দুঃখে দ্রবীভূত হয়ে যেত। সমাজবাদের মধ্যে তিনি দরিদ্রের মুক্তির পথ দেখতে পান আর ফলে আমার সহকর্মী হয়ে চলে আসেন।' শুধু জয়প্রকাশ নয়, অনুগামী বন্ধু ডঃ বীরেন ভট্টাচার্যও 'সকল কাজের সেরা' প্রবন্ধে এক জায়গায় এই তথ্যেরই অনুরূপ বক্তব্য রেখেছে— 'কংগ্রেসে থাকাকালীন তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণ, গঙ্গাশরণ সিং এবং বিহারের আরও সোস্যালিস্ট কর্মীদের সংস্পর্শে আসেন, এবং তিনি তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে মনস্থির করেন। ১৯৪২ আন্দোলনের পূর্ণিয়া জেলার সংগঠনের ভার সতীনাথের উপর ন্যস্ত ছিল গোপনে। বিপুল অর্থের হিসাব, রিভলভার আনা নেওয়া ও সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজ সতীনাথ ও আমরা কয়েকজন মিলে করি। সতীনাথ ধরা পড়লেন। আমার নামে বেরুলো ওয়ারেণ্ট। ..... ১৯৪৫ সালে সতীনাথ আবার কংগ্রেসের কাজে মেতে গেলেন। পূর্ণিয়ার গ্রামে গ্রামে তাঁর পরিভ্রমণ বিহারের জনতার কাছে "ভাদুড়ীজী" নামে তাঁর পরিচয়।'

এই দীর্ঘ দুটি উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাচ্ছে সতীনাথ সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন জয়প্রকাশ ইত্যাদির প্রেরণায়। দ্বিতীয়ত তিনি গোপন কাজ, অস্ত্র সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজের জন্য ধরা পড়ে কারাবরণ করেন ৪২-এ এবং তার পরে ৪৪ সালে। এর আগে ১৯৪১-এ ছ'মাসের জন্য কারাবরণ করেন। সে সময় তিনি পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। ৪২-এ ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে বসে "জাগরী" লিখেছেন। এসব থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে ১৯৪১ এর পর থেকে —'৪৪ পর্যন্ত তিনি গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতা হয়েও সোস্যালিস্ট কার্যকলাপে বিশ্বাসী ছিলেন। ডঃ বীরেন ভট্টাচার্যের এক উক্তি থেকেই পাওয়া যাচ্ছে তিনি ১৯৪৫-এ আবার কংগ্রেসের কাজে মেতে ওঠেন। তৃতীয়ত মনেপ্রাণে তিনি সমাজবাদী ছিলেন। এর আগে একটি উক্তিতে লক্ষ্য করা গেছে কম্যুনিস্ট সংগঠনের তিনি প্রশংসা করতেন ; কিন্তু বিদেশী অনুসরণ নীতিকে পছন্দ করতেন না। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় তাঁর ঝোঁক ছিল সমাজবাদে। শোষিত জনগণের ব্যথা বেদনায় তিনি সহানুভূতিশীল। কম্যুনিস্ট আনুগত্য ছিল বলেই তিনি ১৯৪৯-এ ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে রাশিয়া যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাশিয়া সরকারের আপত্তিতে যাওয়া হয়

নি। তিনি বরাবরই সাম্যবাদী চিন্তাধারার অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু অন্ধভক্ত কোনোদিনই হন নি। ৪২-এর আন্দোলনের সময় থেকেই তাঁর যুক্তিবাদী মন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, আদর্শগত গোঁড়ামি ও গান্ধীবাদী আদর্শের প্রতি অন্ধভক্তি সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দলাদলি, নেতা ও কর্মীদের সুবিধাবাদী মনোভাব, গান্ধী-আদর্শে আইনঅমান্য, অসহযোগের সুযোগ নিয়ে রাতারাতি প্রধান হয়ে ওঠার চেষ্টা ও এদের মধ্যে নতুন শাসক শ্রেণী, পুঁজিবাদী নয়া বুর্জোয়া সমাজ সৃষ্টি হচ্ছে দেখে ক্রমেই রাজনীতিতে আস্থা হারান। এসব অভিজ্ঞতা "ঢোঁড়াই চরিতমানসে" লাডলীবাবু, রাজাসাহেবের মতো আধিয়ারদের শোষক চরিত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। মতাদর্শের বিরোধের চিত্র ফুটে উঠেছে, "জাগরী"তে, ঢোঁড়াই-এর 'আদাজ দস্তা'য়।

সতীনাথ কিন্তু নিজের রাজনৈতিক মত প্রকাশে নীরব ছিলেন। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার পরও তিনি কংগ্রেসে ছিলেন এবং জেলার কংগ্রেস সম্পাদক পদটিতে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৮-এ জেলা কংগ্রেসের বিশাল ভবনটি তৈরী হচ্ছিল, সেই সময় কংগ্রেসে তিনি ইস্তফা দেন। কোনোদিন এই ভবনটিতে আর পা দেন নি। মৃত্যুর পর আত্মীয়দের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পূর্ণিয়াবাসীর একান্ত ইচ্ছায় তাঁর শবদেহ জেলাভবনের সামনে কিছুক্ষণ রাখা হয়। তাঁর রাজনীতিতে যোগদান ও ত্যাগ দুটিই বড়ো আকস্মিক ঘটনা—এবং ছাড়বার কারণ জিজ্ঞেস করলে বরাবর তিনি পাশ কাটিয়ে গেছেন। কংগ্রেস ছাড়ার চারমাস পরে তিনি সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন কিন্তু সেখানে 'কিষান মজদুর সমস্যা' নিয়ে সতীনাথ সক্রিয় হয়ে উঠলে দলের ধনী সদস্যরা ক্ষিপ্ত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই সোস্যালিষ্ট পার্টি ত্যাগ করে বেছে নেন জীবনধর্মী সাহিত্যিকের পথ। এসময় থেকে সতীনাথ পুরোপুরি সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন। ১৯৪৮ সালে "দেশ" পত্রিকায় " ঢোঁড়াই চরিতমানস" প্রথমচরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৯-এ "চিত্রগুপ্তের ফাইল", " ঢোঁড়াই চরিতমানস" প্রথমচরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ বছরের সাতাশে সেপ্টেম্বর তিনি লণ্ডন হয়ে প্যারিসে পৌঁছোন। ফরাসী দেশ ও ভাষা সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ বহুকালের। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর নিজের ইচ্ছামত পড়াশোনার ব্যবস্থা হয়। প্যারিসের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে "সত্যি ভ্রমণকাহিনী" (১৯৫১)র পাতায় পাতায়। এই সফরে ১৯৫০-এ তিনি জার্মানি, অস্ট্রিয়াতেও যান। রাশিয়ার জীবনধারা, সমাজউন্নয়ন প্রকল্প, অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অনুমতি না পাওয়ায় যাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ১৯৫০-এ ফ্রান্সে থাকতেই তিনি "জাগরী" উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্রপুরস্কারে ভূষিত হলেন। ১৯৫০-এর জুন মাসে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এসে পূর্ণিয়ার বিরাট বাড়ীতে ফুল ফুটিয়ে ঋতুতে ঋতুতে পাখিদের আসা যাওয়ার প্রতি নজর রেখে আর সাহিত্যচর্চা করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেন। ১৯৫১ থেকে '৬৫র মধ্যে তাঁর অন্যান্য উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৬৫-র ৩০ শে মার্চ তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে বড়ো নীরবে কিন্তু খুব দ্রুত মৃত্যু আসে। তাঁর মতো প্রজ্ঞাদীপ্ত, শিল্পসচেতন, মিতবাক, প্রচারবিমুখ অকৃত্রিম বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠার অধিকারী এক মহৎ লেখকের জীবনাবসান ঘটে।

## টীকা

১. "জাগরী" উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পরই বিভিন্ন সমালোচকের অভিনন্দন লাভ করে। ১৯৫০-এ প্রথম রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপক গ্রন্থ এটি। সতীনাথের এই গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ হয়েছে। "জাগরীর" ইংরাজী অনুবাদ "ভিজিল" ইউনেসকো-তে মনোনীত ও প্রকাশিত হয়। ইংরাজী অনুবাদ করেন শ্রীমতী লীলা রায়।

২. 'পূর্ণিয়া শহরে বাঙালী সমাজের পত্তন হয় আজ থেকে এক শতাব্দী আগে সিপাহী বিদ্রোহের পর। ইংরেজ সরকারের চাকরিতে অফিসের কেরাণী ( সে যুগে 'বাবু' সম্বোধনে সম্মানিত), কোর্টের উকিল, মোক্তার,ডাক্তার হিসেবে তখন পূর্ণিয়ায় বাঙালী সমাজ গড়ে ওঠে। ...... এই পরিবেশে কৃষ্ণনগর থেকে পূর্ণিয়ায় এলেন প্র্যাকটিশ করতে শ্রীইন্দুভূষণ ভাদুড়ী। ১৮৯৬ সাল। কৃষ্ণনগরের খাঁ ভাদুড়ী পরিবারের এক অংশ ছিটকে বেরিয়ে পড়লো বিহারের এই সুদূর অঞ্চলে।' 'ইতিকথা', সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, "সতীনাথ স্মরণে", ভারতী ভবন, পাটনা-১ ; পৃ ঃ ১-২।

৩. সতীনাথের পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী (১৮৬৯-১৯৪৪, ২০ শে জানুয়ারী) মায়ের নাম রাজবালা দেবী (মৃত্যু ৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৮)। ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী পূর্ণিয়াতে কর্মোপলক্ষে বাস করেন ১৮৯৫-১৯৪০ সাল পর্যন্ত। সতীনাথেরা তিনভাই ও চার বোন। সতীনাথ সর্বকনিষ্ঠ সন্তান।

৪. 'সকল কাজের সেরা', ডঃ বীরেন ভট্টাচার্য, "সতীনাথ-স্মরণে", সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৬২।

৫. 'স্মরণাঞ্জলি', জয়প্রকাশ নারায়ণ ; তদেব, পৃঃ ১৪।

# জাগরী

(সতীনাথের সাহিত্যচর্চার প্রমাণ স্কুল ম্যাগাজিন বা পরে ''বিচিত্রা'' ১৩৩৮। ''নবশক্তি'' পত্রিকায় গান্ধীজী বিষয়ক প্রবন্ধ বা স্যাটায়ার জাতীয় রচনা প্রকাশ পেলেও প্রকৃত অর্থে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রস্তুতি ও উদ্যোগ পর্বের সূচনা ১৯৪২-৪৩-এ ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলের নির্জন সেলে। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে গান্ধীবাদী এক্স নাম্বার (অর্থাৎ অতি সাংঘাতিক) ডেটিন্যু হয়ে প্রথমে পূর্ণিয়া জেলে ও পরে জেলভাঙ্গা আন্দোলনের অংশীদার সন্দেহে ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলি হন। এর আগে ১৯৪০-এ সত্যাগ্রহী রূপে, ১৯৪১-এ ছমাস ও পরে ১৯৪৪-এ ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য কারাবাস করেন।)

(১৯৪২-এ সতীনাথ ছিলেন প্রথম শ্রেণীর বন্দী। কিন্তু জেলের অন্যান্য কোলাহল থেকে দূরে নিজেকে নিজের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পেতে চেয়েছিলেন। জেল সুপারকে বলে ট্রায়াল সেলে বসে লিখেছিলেন ''জাগরী''র চারটি অধ্যায়—ফাঁসির সেল, বাবা—আওরৎকিতা—নীলু। ব্যক্তিগত জীবনের বহু ঘটনা, বহু চরিত্র, পূর্ণিয়ার রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশও মানুষ, জেলের বিচিত্র ঘটনা, বন্দীদের বিচিত্র মানসিকতা ধরা পড়েছে ''জাগরী'' উপন্যাসে) বিহার-পূর্ণিয়া-মজঃফরপুর ৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল— সে ঘটনায় সতীনাথ প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন। (প্রথমবার হাজারিবাগ জেলে এসে দেখতে পান তাঁর পূর্বপরিচিত গান্ধীবাদী নেতা পুরুলিয়া জেলাস্কুলের প্রধান শিক্ষক নিবারণ দাশগুপ্ত ও তাঁর ভাই সুধীর দাশগুপ্তকে। এই প্রধান শিক্ষক ১৯৩০-এ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে চাকরী থেকে ইস্তফা দেন। এই চরিত্রের ছায়া পড়েছে বাবা চরিত্রে। তাছাড়া পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেস সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা গোপালকৃষ্ণ রায় ও নিজের পিতার আদর্শ জীবন থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন লেখক বাবা চরিত্র সৃষ্টিতে। (বিলু, নীলু স্বয়ং লেখকের রাজনৈতিক ভিন্নমতাদর্শের বাহক।) (মা, জ্যাঠাইমা প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনে দেখা রমণীর স্নেহময়ী রূপটিকে শাশ্বত করে রেখেছেন।)[১]

(''জাগরী''র প্রথম পাঠক ফণীশ্বর নাথ 'রেণু'। তিনিও সে সময় ঐ জেলে সোস্যালিস্ট কর্মী রূপে বন্দী ছিলেন। তিনি প্রতিটি অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন। তিনি সতীনাথের অনুপ্রেরণায় লিখতে শুরু করেছিলেন।) সেবার জেল থেকে বেরিয়ে সতীনাথ বন্ধু গুপ্ত বীরেন ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন জেলে বসে বিভিন্ন ভাষা শিখেছেন, আর একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছেন—অর্থাৎ উপন্যাস লিখেছেন। দাদামশায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেন ভট্টাচার্যের মুখে এই কথা শুনে সজনীকান্ত দাসকে পাণ্ডুলিপিটি দিতে বললেন। কিন্তু লেখাটি সজনীকান্তের দপ্তরে পড়ে রইল পাঁচ ছয় মাস। তিনি ছাপলেন না। ভিন্ন প্রসঙ্গ হলেও এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে সজনীকান্ত দাসের উৎসাহে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''পথের পাঁচালী'' প্রকাশিত হয়েছিল। পরে সমবায় প্রকাশনী থেকে সাধারণ কাগজে সাধারণ বাঁধাইয়ে সতীনাথের ''জাগরী'' প্রকাশিত হলো ১৯৪৫-এ।

"জাগরী"ই সতীনাথের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই লেখক অভিনন্দিত হয়েছিলেন। "দেশ" পত্রিকায় পুস্তক পর্যালোচনা করেছিলেন শ্রীঅতুল গুপ্ত।[২] আরো দুই বিদগ্ধ ব্যক্তির মনোজ্ঞ মতামতও প্রকাশিত হয়েছিল।[৩] তিনিই প্রথম রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপক (১৯৫০)। "জাগরী"ই তাঁকে এ সম্মানের অধিকারী করেছে। "জাগরী"ই সতীনাথের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই এটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করেছেন।[৪] "জাগরী" জনপ্রিয় ভিন্নস্বাদের বিশিষ্ট উপন্যাস হলেও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি পূর্ণভাবে গৃহীত হবে কিনা সেটা বিচার্য বিষয়।

একটি রাজনীতি সচেতন পরিবারের কাহিনী "জাগরী"। তিরিশ-চল্লিশের দশকে ভারতের স্বাধীনতাকামী মানুষের মনের একমুখী ভাবনার সূত্রে গ্রথিত একটি পরিবারবিবৃত জীবনের ইতিহাসকে লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

"জাগরী" অর্থ 'জাগরণকারী'। একটি পরিবারের চারজনের জীবনের আদ্যপান্ত কাহিনী নয়। একটি রাতে পরিবারের চারজনের বিচ্ছিন্ন ভাবে বিনিদ্র রজনী যাপনের কাহিনী "জাগরী"। পরিবারের বড়োছেলে বিলু ফাঁসির সেলের আসামী। ৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি বিহার অঞ্চলে যে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালায় তাতে নেতৃত্ব দিয়ে বিলু ধরা পড়ে ও তার ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির আগের সন্ধ্যার সূচনায় বিলুর আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। এই জেলেরই আপার ডিভিসন ওয়ার্ডে বন্দী রয়েছেন বিলুর বাবা, প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক, বর্তমানে আদর্শ গান্ধীবাদী নেতা। তিনিও রুদ্ধশ্বাসে বড়োছেলের ফাঁসির আগের রাতে নিঃশব্দে দুঃখ জয় করবার চেষ্টা করছেন। আওরৎ কিতায় স্বামীর আদর্শের অনুগামিনী বিলুর মা ক্ষোভে অনুশোচনায় আত্মপীড়নে দগ্ধ। তিনি পুত্রের জীবনের চরম মুহূর্তটিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। বাইরে জেল-গেটে সেই অন্ধকারে এই পরিবারের একমাত্র মুক্ত, কনিষ্ঠ পুত্র নীলু জেলার সাহেবের চিঠি নিয়ে অপেক্ষা করছে। তারই হাতে দেওয়া হবে দাদার মৃতদেহ।

একটি অন্তিমক্ষণের বৃত্তকে কেন্দ্র করে চারজনেই সম্পূর্ণ একাকী আত্মজিজ্ঞাসায় মগ্ন হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজেকে এবং একে অন্যকে বিচার বিশ্লেষণ করেছে বর্তমানের অনুষঙ্গে অতীত স্মৃতিচারণায়। চারজনের আপাত বিচ্ছিন্ন, এলোমেলো স্মৃতিচারণে, স্বগত কথন ও বিশ্লেষণের সাহায্যে পরিবারের অন্তরঙ্গজনেরা তাদের দোষ-ত্রুটি, ভাল-মন্দ সংস্কার উদারতা নিয়ে পরিপূর্ণ, অন্তর্মুখী, স্বতন্ত্র, ব্যক্তি চরিত্ররূপে পাঠকের কাছে ধরা দিয়েছে। সেই সঙ্গে এই শতকের তিরিশ-চল্লিশ দশকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংগ্রামের চেহারা, বিভিন্ন মতবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের দলাদলি, মতবিরোধ, সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা, দলের লোকদের স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী মনোভাব ; দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ—তাদের রাজনৈতিক সামাজিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস ; সামগ্রিক দুঃখবেদনা, জেলের জীবন—তার বিচিত্র অনাচার, অন্যায়, লোভ, শাসন-শিথিলতা, বন্দী কয়েদিদের বহু বিচিত্র অপরাধ ও আচরণ নিপুণ শিল্পীর অভিজ্ঞতার দক্ষ কলমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জেলজীবন এ উপন্যাসে গোটা ভারতবর্ষের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ভারতবর্ষের অতীত

বর্তমান ও আগামীদিনের বিপন্নতার রূপ ফুটে উঠেছে পরোক্ষে।

কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা রয়েছে। একটি চূড়ান্ত মুহূর্ত জড়িয়ে আছে একটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে। পাঠকের কৌতূহলকে বরাবর টানটান রেখেছে সেই ঘটনা। চারজনের ভাবাদর্শ মণ্ডিত জীবনধারা আজ যেখানে এসে থেমেছে তার মূলেও জড়িয়ে আছে পরিবারেরই একজন ; বাহিরের কেউ ঘটনাকে 'ক্লাইম্যাক্সে' নিয়ে যায় নি। ছোটোভাই নীলু বরাবর জেদী স্বভাবের। এককালে সেও দাদার রাজনৈতিক মতাদর্শ ও জীবনধারায় বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু পরে কম্যুনিস্ট মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে দাদার মত ও পথ থেকে সরে আসে। ৪২-এর আন্দোলনে দেশের ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে এই দলটি দেশের শাসকশক্তিকে সমর্থন করে। সোস্যালিস্ট দলের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ তাদের কাছে আপত্তিকর হয়ে ওঠে। শুধু সোস্যালিস্ট নয়, গান্ধীবাদীরাও এই সময় শাসক শক্তির দৃষ্টিতে 'অতি ভয়ানক' বলে চিহ্নিত হয়। দেশের সাধারণের কাছে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক সোস্যালিস্ট দল কিরকম ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিল তার বাস্তব পরিচয় 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' দ্বিতীয়চরণে আছে। কম্যুনিস্ট সংগঠনও এইসময় তেমন জনস্বীকৃতি পায় নি। শুধু কংগ্রেসই বিশেষত গান্ধীবাদী কংগ্রেসই সর্বভারতীয় মর্যাদা লাভ করেছিল। কিন্তু বিয়াল্লিশে শাসকশক্তিকে সমর্থন করে কম্যুনিস্ট দল কিছুটা স্থায়িত্ব পেয়েছিল। আলোচ্য উপন্যাসে নীলু আদর্শের দিক থেকে বিলুর বিরুদ্ধে যায় এবং রাজসাক্ষী হয়। পরে অবশ্য নীলু বুঝেছিল তার পার্টি 'স্যাবোটেজ' ইত্যাদি সমর্থন না করলেও অন্য রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানকে সমর্থন করে নি। যাই হোক এই ঘটনাটি চেষ্টা করেও চারটি চরিত্র আত্মবিচার মুহূর্তে একবারও ভুলতে পারে নি। প্রত্যেকেই বিচিত্র স্মৃতির সূত্র ধরে এই চরম সত্যকে আড়াল করতে চেয়েছে—বিশেষত বিলু। সে যতবারই নীলু প্রসঙ্গে এসেছে, ততবারই নীলুর সাক্ষী দেওয়ার ঘটনাটি ভুলতে চেয়েছে। মা-ও জেলে বসেই শুনেছেন এ তথ্য, কিন্তু বিশ্বাস করতে ভয় পেয়েছেন। নীলু কিন্তু নিজের মত ও কাজ সম্পর্কে অনেক বেশি স্পষ্ট। সে বার বার আত্মসমর্থন করতে চেয়েছে এইভাবে—'দাদা তাকে ভুল বুঝবে না কারণ দাদা তাকে ভালোবাসে'। তার বিশ্বাস, দাদা বুঝবে আদর্শের জন্যে নীলুর এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু কেউই আশ্বস্ত হতে পারে নি, আত্মপক্ষ সমর্থনে হাজার যুক্তি খাড়া করেও। প্রত্যেকেই মোটরের হর্ণের শব্দ, বুটের আওয়াজে শঙ্কিত হয়ে ঐ শব্দের হাত থেকে রেহাই পেতে চেয়েছে। বিলু-বাবা-মা-এর আত্মচারণা এখানেই শেষ। শুধু নীলু অংশ তারও পর এগিয়েছে—নিস্পন্দপ্রায় পাঠককে শেষ চমক দেওয়ার জন্য। নীলু ভোরের আলোয় সারারাতের উৎকণ্ঠার উপান্তে শুনেছে "মিলিটারি এলাকা ছাড়া ভারতবর্ষের আর সর্বত্রই আগস্ট আন্দোলনের সময় 'স্যাবোটেজ'এর জন্য যাদের উপর ফাঁসির হুকুম হয়েছে, তাদের ফাঁসি অনিশ্চিত কালের জন্য স্থগিদ হয়েছে। .... আজ ফাঁসি হয়েছে সাধারণ কয়েদির। ..... আপনার দাদাকে আর এক নম্বর সেল থেকে সরানো হয় নি। সাহেব বললে, কি দরকার মিছে হাঙ্গামা বাড়িয়ে। সেইজন্যই misunderstanding হয়েছে।"[৫]

এই হোলো "জাগরী"র কাহিনী। এটি একটি পারিবারিক স্নেহ সম্পর্কের কাহিনী। রুদ্ধশ্বাসপ্রায় করুণ কাহিনীটি লেখকের অসাধারণ শিল্প কৌতূহল সৃষ্টির নিপুণতায়

শেষপর্যন্ত মধুর রসাবেদন সৃষ্টি করেছে। বিলুর ফাঁসি না হওয়ার পাঠক নিশ্চিন্ত বোধ করেছে। নয় তো এমন ভ্রাতৃঘাতী ঘটনাটি সত্য হলে পাঠককে কোন জায়গায় পৌঁছে দিত কে জানে?

"জাগরী" নামটির মধ্যে দিয়ে সতীনাথ অনেক না-বলা কথাকে গভীরভাবে ব্যক্ত করেছেন। জাগরীর আক্ষরিক অর্থ জাগরণকারী। কাহিনীতে চারজনের উৎকণ্ঠিতরাত্রি যাপনের পরিচয় আমরা পেয়েছি। কিন্তু এ জাগরণ শুধু একটি "রাষ্ট্রীয় পরিবারের"[৮] নয়। এই পরিবারের চারজন ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিনিধি। আরো ব্যাপকভাবে বলা যায় তারা প্রত্যেকে ভিন্নমতাদর্শে বিশ্বাসী জনপ্রতিনিধি। তিরিশ-চল্লিশের দশকে ভারতব্যাপী জনজাগরণের প্রকাশ ঘটেছিল। সাধারণ মানুষ কমবেশি পরিমাণে রাজনীতির উত্তাল প্রবাহ সম্পর্কে ধীরে ধীরে সজাগ ও সক্রিয় হয়ে উঠছিল। সেই সামগ্রিক গণঅভ্যুত্থানের সাহায্যে আগামীদিনের সমস্যা সঙ্কটে জর্জরিত ভারতবর্ষের চেহারাটা জনগণের জাগ্রত চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে। বিলু, নীলু, বাবা প্রত্যেকেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই সত্য উপলব্ধি করেছে—'জনশক্তির প্রকৃত স্বরূপ।' সংশয়গ্রস্ত হয়েছে হীনতা, চক্রান্ত, পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেখে! কিন্তু এটাই "জাগরী"র শেষ কথা নয়। কারণ সতীনাথের লক্ষ্য "রাজনৈতিক" উপন্যাস লেখা নয়। রাজনীতি প্রভাবিত ব্যক্তিমনের সংশয়গ্রস্ত সত্যকে উদঘাটিত করা ; নিজের 'গোপন আমি'কে জানা। এই মানবিক দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে মানুষের সম্পূর্ণ চেহারাটাকে যুগ-কাল-সমাজ-রাজনীতির প্রেক্ষিতে যাচাই করা। সেই আলোকেই প্রকাশিত হয়েছে চারটি চরিত্রের অন্তর্লোক। প্রতিটি চরিত্রই আসন্ন অনিবার্য মৃত্যুর আবর্তে নিজের স্বরূপকে জেনেছে। এতদিন প্রত্যেকে নিজেকে যেমনটি জানতো এবং পরস্পরের চোখে পরস্পরের যে আদর্শ সত্তাটি বিশেষ আকার পেয়ে আসছিল, তার কোনোটাই তারা নয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যবিত্ত মানসিকতার সঙ্কট থেকে এরা কেউ-ই রেহাই পায়নি। বাবা নিজেকে আদর্শ গান্ধীবাদী নেতা বলে অহংবোধকে তৃপ্ত করে আসছিলেন। কিন্তু চরম সঙ্কট মুহূর্তে তার ভেতরকার-আমি তাঁর সামনে তুলে ধরেছে আসল চেহারাটা। মা নিজেকে স্বামীর অনুগামিনী, স্নেহময়ী সন্তানবৎসলারূপে তৃপ্তির আবরণে ঢেকে রেখেছিলেন, এই মুহূর্তে তাঁরই গভীর অন্তঃকরণ থেকে বেরিয়ে এসেছে বিস্ফোরণজনিত উত্তপ্ত লাভাস্রোত। তিনিও আত্মান্বেষণে সন্ধান পেয়েছেন মধ্যবিত্ত রমণীর সাধারণ মানসিকতাকে। সহজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা এবং প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার ষোলোআনা ব্যর্থতায় তিনি রুষ্ট, ক্ষিপ্ত, অনুতপ্ত, বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন হয়ে পড়েছেন। সবচেয়ে গভীরভাবে নিজেকে জেনেছে বিলু। সে আদর্শবাদী নেতা, পুত্র, দাদা—এই-ই ছিল তার গর্ব, তার আত্মতুষ্টি এতেই। কিন্তু ঝুলন্ত মৃত্যু-ফাঁসটির সামনে বসে তার অন্তরের ভয়ত্রস্ত, স্নেহ প্রেমে আকুল, জীবনাকাঙ্ক্ষায় অস্থির সত্তাটি যে কতো প্রবল তা জেনেছে। নীলু কাজেকর্মে, স্বভাবের গোঁয়ার্তুমিতে একরোখা, মতাদর্শের অন্ধ অনুগামী, ন্যায় অন্যায় বোধহীন—এইটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। সেও অন্তরে অন্তরে ঈর্ষাকাতর, আত্মসমালোচক, দ্বন্দ্ববিক্ষিপ্ত। প্রত্যেকের অবচেতন-অচেতন স্তর থেকে বেরিয়ে আসা 'দ্বিতীয় আমি'-টির কাছে প্রত্যেকেই নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। নিজের প্রকৃত

মনটাকে জেনে নেওয়ার কাহিনী "জাগরী"। আত্মার বা সত্তার "জাগরণই" জাগরী"র শেষ কথা।

"জাগরী" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই এটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস শ্রেণীভুক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু 'রাজনৈতিক উপন্যাস' — এই রকম শ্রেণীগত বিচার করা যায় কিনা এটাই একটা বড়ো প্রশ্ন। বাংলাসাহিত্যে রাজনৈতিক উপন্যাস বলে আলাদা কোনো ধারা আদৌ আছে কিনা সেটাও বিচারের বিষয়। এ পর্যন্ত বাংলায় 'রাজনৈতিক উপন্যাস' রূপে চিহ্নিত করা হয় বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ", রবীন্দ্রনাথের "ঘরেবাইরে", "চার অধ্যায়", শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী", উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "রাজপথ", স্বাধীনতার বিপ্লবাত্মক দিক নিয়ে লেখা মনোজ বসুর "ভুলিনাই", সতীনাথ ভাদুড়ীর "জাগরী", তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ধাত্রীদেবতা", মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জীয়ন্ত", গোপাল হালদারের "একদা", "অন্যদিন" প্রভৃতিকে। উপন্যাসে রাজনৈতিক ঘটনা, পরিবেশ, আন্দোলন, বিপ্লব, প্রতিবিপ্লবের চিত্র ; রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী সক্রিয় চরিত্র ইত্যাদি থাকলেই তাকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যাবে না। এই লক্ষণগুলির দুটি একটি বা অসংখ্য থাকলেও রাজনৈতিক উপন্যাস হবে না। অতি সম্প্রতিকালে রাজনীতি প্রসঙ্গ বহু ঔপন্যাসিককে বিশেষ মর্যাদা দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে এবং এইসব উপন্যাস নিয়ে হৈ-চৈ করার চেষ্টাও একদলের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব উপন্যাস রাজনীতির বিবরণ, সাংবাদিকতা, তথ্যবহুল উত্তেজক ঘটনার সমাবেশ, বিপ্লবধর্মী চিত্রের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হচ্ছে। সর্বোপরি লেখকের নিরপেক্ষ ভূমিকা অনেকাংশেই পক্ষপাত দুষ্ট, প্রচারধর্মী হয়ে উঠছে। ফলে বাংলায় রাজনৈতিক উপন্যাস একটাও লেখা হচ্ছে না।

এর আগে যে উপন্যাসগুলি রাজনৈতিক উপন্যাস অভিধা পেয়েছে অর্থাৎ "আনন্দমঠ", "ঘরে বাইরে", "চার অধ্যায়"—ইত্যাদিকেও রাজনৈতিক উপন্যাস বলার প্রবণতাও যথার্থ মনে হয় না। "আনন্দমঠে" সন্ন্যাসী বিদ্রোহের, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা, দেশাত্মবোধক মনোভাব ইত্যাদি আছে। পরবর্তীকালে প্রথমযুগের দেশপ্রেমিকের কাছে "আনন্দমঠ" 'গীতা সদৃশ' ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস করতে চান নি।

পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলন, বিলিতিদ্রব্য বর্জন ও সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের চেহারা স্পষ্ট হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র', 'একরাত্রি' প্রভৃতি ছোটগল্পে "ঘরে বাইরে", "চারঅধ্যায়" ও "মালঞ্চ" উপন্যাসেও অল্পবিস্তর রাজনৈতিক উত্তেজনা, স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব মেনে নেওয়ার ঘটনা আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য ছিল না এবং রাজনৈতিক উপন্যাস তৈরী করার মানসিকতা রবীন্দ্রনাথের কোনদিনই ছিল না। "ঘরে বাইরে"র মূল বক্তব্য নিহিত আছে অন্যত্র—বিমলা নিখিলেশের দাম্পত্য সমস্যাকে আন্তর্বিশ্লেষণের সাহায্যে একটা গভীর জীবনসত্যজাত উপলব্ধির পথে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। "চার অধ্যায়" তাঁর মতে বিপ্লবী উপন্যাস নয়, প্রেমের উপন্যাস। এই দুটি উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিশে যায় নি ;

B 891.443509
B 4691

বরং ভারবহ করেছে। উপন্যাস হিসেবে "ঘরে বাইরে" বা "চার অধ্যায়" বিশেষধারার সূচক হলেও রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাবে উপন্যাস দুটিতে রাজনৈতিক পটভূমি সমান্তরাল পথ নিয়েছে। "ঘরে বাইরে"তে সন্দীপকে দেশসেবক না করলেই বরং যেন ভালো হোতো এবং তাতে মূল সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠে মানব-রহস্যকে স্বরূপে প্রকাশ করতে সাহায্য করতো। "মালঞ্চে" সরলার আকস্মিকভাবে দেশের কাজে সাড়া দেওয়া, হঠাৎই ফিরে আসা ; রমেন চরিত্রের মুখে সন্দীপ সদৃশ রাজনৈতিক ভাবালুতার প্রকাশ যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্র বিপ্লবীজীবনের বিচিত্র লোমহর্ষক কাহিনীর উত্তেজনায় বাঙালী পাঠককে বিস্মিত করেছেন। "পথের দাবী" উপন্যাসটি রাজরোষে বাজেয়াপ্ত হওয়ায় লেখকের দেশপ্রীতি, রাজনৈতিক মতামত নিয়ে খুব হৈ-চৈ করাও হয়েছিল। সাংঘাতিক সক্রিয় রাজনৈতিক উপন্যাস বলে পরিচিতি পেয়েছিল "পথের দাবী" রাজনীতির ভূমিকা যতটা আবেগপ্রসূত কল্পনা দিয়ে গড়া, ততটা সজীব বাস্তব সত্য তাতে নেই। বিপ্লবাত্মক ঘটনার পাশে পাশে রোমান্টিক প্রেমকাহিনী অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেহারাটা পালটাতে শুরু করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদ-আদান-প্রদান নীতি, ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক এ শতকের গোড়াতেও অব্যাহত ছিল। ১৯০৫-এর বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন, বিদেশীদ্রব্য বয়কট প্রভৃতি জাতীয় জীবনে উন্মাদনা জাগালেও সমবেত জনতা তাতে সম্পূর্ণ উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেনি। এছাড়া কংগ্রেসের ভূমিকা, নরম-চরমপন্থীর মতবিরোধ, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়—সবই দেশের বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। প্রথম মহাযুদ্ধকালে দেশীয় নেতাদের স্বরাজ পাবার আকাঙ্ক্ষায় শাসকশক্তিকে সাহায্য করার চেষ্টায় বেশ কিছুদিন (এসময় একমাত্র সন্ত্রাসবাদীদেরই সক্রিয় ভূমিকা ছিল) সবরকমের রাজনৈতিক আন্দোলন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে প্রত্যাশিত স্বরাজ দেশবাসী করায়ত্ত করতে তো পারলই না বরং বিপন্ন ভারতবর্ষের চেহারাটা তাদের কাছে ক্রমেই প্রকট থেকে প্রকটতর হোলো। রাওলাট আইন, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, গান্ধীজীর রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, চট-পাটকল ধর্মঘট, বোম্বাই-এ শ্রমিক ধর্মঘট ইত্যাদি একের পর এক ঘটনা সাধারণ দেশবাসীর নিস্পৃহ জীবনধারাকে ক্রমেই বিচলিত করে তুলল। এরই মধ্যে গান্ধীজীর ১৯২১-র অসহযোগ আন্দোলনের ডাক, তার আগে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯, ১৩ই এপ্রিল), ১৯২০-র এপ্রিল মাসে সারা দেশব্যাপী হরতাল পালন, খিলাফৎ আন্দোলনের (১৯২০) ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১) ; ১৯২৬-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯২৮, ১৯২৯-এ মীরট ষড়যন্ত্র মামলা, কানপুর মামলা, ১৯৩০-এ অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় ইত্যাদি ঘটনাগুলি যে রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তাতে জনজীবনে কমবেশি সাড়া জেগেছিল। এই পর্বের আরো দুটি বড়ো ঘটনা—১৯১৭তে রুশ বিপ্লব ও তার প্রভাব ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং ১৯২৯-এর বিশ্বব্যাপী 'অর্থনৈতিক মন্দা'র প্রভাবে ভারতের মতো সাম্রাজ্যবাদী শাসিত দেশে যে বিপর্যয় সৃষ্টি

DATA ENTERED 17334

করেছিল তা সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনধারায় বড়ো আঘাত হিসেবে দেখা দেয়। এসময় দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ভূমিকাও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ১৯২০-তে ভারতের বাইরে কম্যুনিস্ট সংগঠন তৈরী, ১৯২৭-২৮ এ দেশে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও সাম্যবাদীচেতনার প্রসার ; সন্ত্রাসবাদী সহিংস বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ও তাদের সক্রিয় ভূমিকা সমস্ত পরিবেশকে এবং জীবনধারাকে করে তুলেছিল রাজনীতি সচেতন। এসময়ের সমাজস্রোত ও রাজনৈতিক স্রোতধারা একটাই প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল। রাজনীতি সাধারণ, অতি সাধারণ মানুষকে, তার সমাজকেও আজন্ম লালিতসংস্কারকে পাল্টাচ্ছিল। সামাজিক মানুষ ক্রমেই রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠছিল জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে। তিরিশ-চল্লিশের দশকে জনগণের মনে গান্ধীজীর প্রভাব ; তাঁর জীবনধারা ও কার্যবিধির ধারা জাতপাত নির্বিশেষে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, অবহেলিত অতিসাধারণ জীবনেও আমূল নাড়া দিয়েছিল।

এই দুই (তিরিশ, চল্লিশ) দশকের সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে, বিশেষত গান্ধীভাবাদর্শ ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ে অনেক বাংলা উপন্যাস রচিত হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ধাত্রীদেবতা"র (১৯৩৯) সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে গান্ধীবাদে উত্তরণের পর্বটিতে শিবনাথ সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার সংস্কারের সঙ্গে 'ভারত চিন্তা'র দ্বন্দ্বে সত্য পথটির সন্ধানী হয়েছে। "গণদেবতা" (১৯৪৩) "পঞ্চগ্রামে" (১৯৪৪) দেবু ঘোষ তার সমাজের অতি সাধারণ মানুষগুলিকে গণ-অভ্যুত্থানের জোয়ারে ভাসাতে চেয়েছে। ঐ উপন্যাসেই প্রাচীন ন্যায়রত্নের নাতি বিশ্বনাথ ও তার সঙ্গীরা স্বপ্ন দেখে সংস্কারহীন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের। তারাশঙ্করের রচনা ছাড়া সরোজকুমার রায়চৌধুরীর "কালোঘোড়া" (১৯৫৩) সুবোধ ঘোষের "তিলাঞ্জলি" (১৯৪৪) তে সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়াও আরো অন্যান্য ঔপন্যাসিকের রচনায় মন্বন্তর, অসহযোগ আন্দোলন, গান্ধীমতাদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য, সমাজতান্ত্রিক চেতনা প্রভৃতি সমকালীন ঘটনা গুরুত্ব পেয়েছে।

কিন্তু এসব ঘটনা ও ঘটনাজাত তথ্যকে ঔপন্যাসিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ চরিত্রের ভাবাদর্শের দ্বন্দ্ব হিসেবে স্থাপন করেছেন। তারাশঙ্কর নিজে ১৯২১-এর অসহযোগ, তার আগে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে উৎসাহী ছিলেন। ১৯২৯-এ জেল এ গিয়ে ক্রমেই গান্ধীবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের দেশকে যথার্থভাবে জানতে চেয়েছেন, দেশের কাজে, সমাজসেবায় মেতে ওঠেন। এই সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর লেখকসত্তাকে সাহায্য করেছে। "গণদেবতা" প্রভৃতিতে তাঁর পরিচিত জীবন প্রতিবেশ, বিশেষত বীরভূম অঞ্চল তাঁর লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'রাজনৈতিক বোধ' যা রাজনৈতিক উপন্যাসের মূলকথা সেটা তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য পায়নি। সামন্ততান্ত্রিক জীবনের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসার সঙ্গে শোষণমুক্ত সমাজবাদ কখনোই মিলে মিশে যেতে পারে না। দেবু ঘোষ নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হলেও বারবার ফিরে গিয়েছে ন্যায়রত্নের আদর্শে, দ্বারিকা চৌধুরীর ভগ্ন জীবন তাকে দুঃখ দিয়েছে। দেশের মানুষগুলো— অনিরুদ্ধকামার, পাতুডোম, গিরীশ ছুতোর এমনভাবে জাতব্যবসা ছাড়ছে, চণ্ডীমণ্ডপ তার

পুরোনো ঐতিহ্য হারাচ্ছে ভেবেই সে ক্ষুব্ধ যন্ত্রণাকাতর হয়েছে। দেবু ঘোষ সমাজের পরিবর্তনকে ধরতে পেরেছে, কিন্তু মেনে নিতে পারেনি। আসলে এই সব মানসিক দ্বন্দ্ব স্বয়ং তারাশঙ্করের। সামন্ততান্ত্রিক জীবনের প্রতি মমতাই এর কারণ।

সতীনাথ এখানেই অনন্য। তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সক্রিয় ভূমিকা, বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক তত্ত্বদর্শনের প্রতি উদার জ্ঞানপিপাসু পাঠক মন নিয়ে ধরতে পেরেছিলেন রাজনীতির প্রকৃত দ্বান্দ্বিক সত্যকে। বিরোধ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত ভারতবর্ষের চেহারাটাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি ছিলেন গভীর রাজনীতি সচেতন। রাজনীতির এই মর্মসত্য উপলব্ধি করেই গড়ে ওঠে যথার্থ রাজনৈতিক বোধ। এই রাজনৈতিক বোধকে ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের ইতিহাসবোধের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। রাজনৈতিক চিন্তাধারা সামাজিক অর্থনৈতিক চেতনার সঙ্গে অবিমিশ্র ভাবে জড়িত। সতীনাথ তাঁর উপন্যাসে, বিশেষত "জাগরী", "ঢোঁড়াইচরিতমানস" ও "চিত্রগুপ্তের ফাইল", এবং "গণনায়ক" "আংটা বাংলা" প্রভৃতি গল্পে রাজনৈতিক জীবনবোধকে গল্প উপন্যাসের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। এসব উপন্যাসে লেখক রাজনীতি প্রসঙ্গ, পরিবেশ, সক্রিয় রাজনৈতিক ঘটনা ও তার চিত্র, বিশেষত ৪০-এর দশকের ভারতবর্ষের প্রকৃত রাজনৈতিক চেহারা—তার ত্রুটিবিচ্যুতি, আদর্শবাদ ও দ্বন্দ্ব ; বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উপদলগুলির কার্যকলাপ, মতামত অসঙ্গতিকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে সামাজিক জীবনে ও ব্যক্তিমানসে তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপটিকে উদঘাটন করেছেন শিল্পী সতীনাথ।

যথার্থ রাজনীতি বোধের অধিকারী সতীনাথ, সে বিষয়ে সকল সমালোচকই নিঃসংশয়। তাঁর উপন্যাসগুলিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশটিও বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে ঠিক কথা। তবু "জাগরী" উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে এটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যথাযথ হবে না বলে মনে হয়। আলোচ্য উপন্যাসে রাজনৈতিক ঘটনা আছে, রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য ও বিরোধ দুই-ই স্পষ্টভাবে চিত্রিত হলেও "জাগরী" রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচক গোপাল হালদার "রাজনৈতিক উপন্যাস" বলে অভিনন্দিত করেছেন—'অনেক আশা নিয়ে আমরা অভিনন্দন করছি "জাগরী"র লেখককে, কারণ আমরা রাজনৈতিক উপন্যাসের ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। এদিকে "জাগরী" এক সমুজ্জ্বল স্বাক্ষর। জেলখানা আর জেলখানার রাজনৈতিক ওয়ার্ডের দেখা রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মানুষদের এমন চমৎকার চিত্র বাঙলাসাহিত্যে কেউ আঁকেননি, .... কংগ্রেস জীবনের একটি সার্থক চিত্র আমরা বাঙলা কথাসাহিত্যে পেলাম, আর পেলাম সার্থক কয়েকটি রাজনৈতিক টাইপ ও মানুষ। কিন্তু এ সার্থকতার কারণ যা তা এ সূত্রে আমাদের স্মরণীয়—"জাগরী"র ছত্রেছত্রে বোঝা যায় তা এই লেখকের অকৃত্রিম প্রেরণা ও তাঁর আন্তরিকতা।'[৭] এছাড়াও অনেক সমালোচকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই মত অনুমোদন করেন। তাঁদের এ মত প্রকাশের পেছনে অকাট্য যুক্তি সম্ভবত এই—আলোচ্য উপন্যাস রচনাকালে সতীনাথ ঘনিষ্ঠভাবে একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিরিশ-চল্লিশের দশক বিশেষভাবে 'রাজনৈতিক সঙ্কটকাল' বলে চিহ্নিত।

সর্বব্যাপী বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের ঢেউ সতীনাথের জনপদ পূর্ণিয়াকেও উত্তাল করে তুলেছিল। সমগ্র বিহার অঞ্চল এই আন্দোলনের ডাকে যেভাবে সক্রিয় সাড়া জাগায়, তাতে শাসকশক্তি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। দমননীতি চালায় ; 'জেলভর' আন্দোলনে বন্দী হয় অসংখ্য সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী। সারা বিহার জুড়ে চলে বিধ্বংসী কার্যকলাপ—রেললাইন তুলে ফেলা, স্টেশন, জেলখানা পোড়াবার চেষ্টা, পথে ব্যারিকেড তৈরী করে মিলিটারী ট্রাক আটকানো, শাসক সৈন্যদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া ইত্যাদি ঘটনা আজ ঐতিহাসিক সত্য বলে গণ্য।

১৯৪২-এর ৭-৮ই আগস্ট মহাত্মা গান্ধীসহ বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গে শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে সাধারণ নিরক্ষর মানুষও গর্জে উঠেছে 'সরকার জুলুমকার। আংরেজ জুলুমকার।' ৯-ই আগস্ট সকাল থেকেই আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে গর্জে উঠল নতুন কালের নতুন শ্লোগান—'মহাত্মাজী গ্রেপ্তার। হো যাও তৈয়ার'। সেদিন সতীনাথের চিরপরিচিত পূর্ণিয়া-বিহার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী সতীনাথ সেদিন সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের রাজনৈতিক আশ্রম টিকাপট্টির ওপর রাজরোষ তীব্র আকার নিয়েছিল। ১০ই আগস্ট, ১৯৪২-এ আশ্রমটি পুলিশ ঘিরে রাখে। এর বিরুদ্ধে ১১-ই আগস্ট পূর্ণিয়ার পালটা বিক্ষোভ, হরতাল, প্রতিবাদ মিছিল বেরোয়। ১২-ই আগস্ট সরকার পূর্ণিয়ায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু পূর্ণিয়ার রাজনৈতিক নেতা, সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে কিষাণগঞ্জের আদালতে পতাকা তোলে, রেললাইন উড়িয়ে দেয় ; কাঠিহার জুটমিলে স্ট্রাইক করে। ১৩-ই আগস্ট কঠিহার-বারসই রেললাইন, পথএর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা। সতীনাথ নিজে ছিলেন এই বিক্ষোভের অংশীদার। সাধারণ মানুষের মনের কথাটি তিনি বুঝেছিলেন বলেই ঢোঁড়াই চরিতমানসে লিখেছিলেন তাদের মনের অমোঘ কথাটি, 'রাবণের চাইতেও অংরেজ সরকারের উপর আক্রোশ আরও জীয়ন্ত হয়ে ওঠে।' দল বেঁধে বেঁধে সকলে ছুটে চলেছে ঃ 'To paralyse the administration which upheld British imperialism, agitators uprooted railwaylines, damaged telegraph wires and telephones, attacked and at some places burnt police stations, seized post-offices and other government buildings. These led to clashes with the machinery of administration, some officers of which were over powered by popular fury'. [R. R. Diwakar, Gen. ed. Bihar through the Ages, Bombey Orient Long mans 1959, P 668]

১৯৪২-এর আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে, অনুমান করা যায় ১৫ই বা ১৬ই আগস্ট সতীনাথ সহ বিশিষ্ট আটজন সক্রিয় রাজনৈতিক প্রথম সারির নেতাকে পুলিশ ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ই আগস্ট ক্ষুব্ধ জনতা টিকাপট্টি ও রূপাওলি ডাকঘরে আগুন দেয়, কসবা সেতু ধ্বংস করে। পুলিশও মিলিটারি একযোগে নির্মমভাবে জনতাকে প্রতিহত করে। ১৭ই আগস্ট চোপরা থানা (কিষণগঞ্জ সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত) জনতা আক্রমণ করে। ১৮ই আগস্ট যোগাবানী রেলপথ অবরোধ করে বিপুল সংখ্যক জনতা। ঐ দিন পূর্ণিয়াজেলা স্কুলে পিকেটিং হয়। সতীনাথসহ রাজনৈতিক বিপ্লবীরা

এই ঘটনায় পূর্ণিয়া জেলে বসে প্রতিবাদ ও কর্মবিরতি পালন করেন পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে — 'Prisoners on the Jail at Purnea refused to do any work"। শুধু তাই নয়, "জাগরী"র প্রতিটি চরিত্রেই লেখকের চেনা-জানা মানুষের ছায়া পড়েছে। উপন্যাসের দুই ভিন্ন মতাদর্শের চরিত্র বিলু-নীলুর রাজনৈতিক ভাবনা, আদর্শগত সমর্থন, সংঘাত-সংশয়-বিরোধিতা স্বয়ং লেখকের মানস সংঘাতের সূত্রে গ্রথিত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ ছাড়া এ উপন্যাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের বিশ্লেষণ—সতীনাথের সংস্কারমুক্ত অন্য নিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে স্পষ্ট করেছে। তাঁর গান্ধী মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা, আশ্রম জীবনযাপন, মার্কসীয় দর্শনের প্রতি আকর্ষণ, সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামনন্দন মিশ্র, যোগেন্দ্র সুকুল, সুরজনারায়ণ সিং, গুলার সোনার এবং হাজারীবাগ জেলা কংগ্রেস সেক্রেটারী বোলীগ্রাম সিং এর গঠিত 'আজাদ দস্তা'র প্রতি আনুগত্য ; সমাজবাদী আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় ছড়িয়ে আছে বিলুর আত্মবিশ্লেষণ অংশে। এতো আসলে সতীনাথের মানস প্রকৃতির পরিচয়।

এ উপন্যাসের শেষ কথক নীলু তাদের পরিবারের পরিচয় দিতে গিয়ে পরিবারটিকে 'রাষ্ট্রীয় পরিবার' বলে চিহ্নিত করেছে। বিলু অংশেও একবার 'রাষ্ট্রীয় পরিবার' কথাটির উল্লেখ আছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন, লেখকের রাজনৈতিক সত্যনিষ্ঠা ও যথার্থ রাজনীতিবোধ থাকা সত্ত্বেও এই 'রাষ্ট্রীয় পরিবারটি' কি সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় চেতনাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে? বা, লেখকের সে ইচ্ছে ছিল? সত্যি কথা বলতে কি, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি পরিবার বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় পরিবার বলে প্রশংসা লাভ করলেও, সারাদেশের মানুষের কাছে রাজনৈতিক আদর্শের ভাবমূর্তি বা স্বরূপটি কি তারা স্থায়ী ভাবে মুদ্রিত করতে সক্ষম হয়েছে কোনদিন? সতীনাথের মতো একনিষ্ঠ আদর্শবাদী রাজনৈতিক কর্মী—যিনি নিঃস্বার্থ ছিলেন নিজের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ও দলের কাছে ; তার অগোচর ছিল না যে, ভারতবর্ষে এমন একটি পরিবারও নেই যারা নিঃশেষ হয়ে গেছে রাজনৈতিক মতাদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে বা অনিবার্য সত্য, চরমসঙ্কটকে শেষ গণ্ডুষ পর্যন্ত পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে উঠেছে। বরং তিনি রাজনীতিতে দেখেছেন স্বার্থবাদী মানুষের আদর্শভ্রষ্টতা, রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রতি হীন দীনতা। আর তাঁর শিল্পীর অন্তর সেখান থেকে মুক্তি সন্ধানী হয়ে আশ্রয় নিয়েছে আত্মবিশ্লেষণের মগ্নচৈতন্যে। এরই ফলে তিনি পেয়েছেন দুর্লভ অথচ প্রগাঢ় সত্যকে—জীবনধর্মিতাকে। "জাগরী"র রাজনৈতিক বাতাবরণে সেই জীবনানুভূতির চরম প্রকাশ ঘটেছে। এইখানেই সতীনাথ অসাধারণ একক ও পরিপূর্ণ সার্থক। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও জীবন সন্ধিৎসার দুর্নিবারতায় "জাগরী"তে রাজনৈতিক প্রতিবেশ একধরণের বিশিষ্টতা লাভ করেছে। পারিবারিক জীবনের স্নেহরসসিক্ততায় ভারতবর্ষের 'রাজনৈতিক জাগৃতি' বিশিষ্ট বাস্তব রূপ পেয়েছে। সতীনাথ নিজেও বলেছেন—'রাজনৈতিক জাগৃতর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের তরঙ্গ বিক্ষোভ কোন কোন স্থানে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিকেও আঘাত করিতেছে। এইরূপ পরিবারের কাহিনী। গল্পটি ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় পড়িতে হইবে।"[৮]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—এ উপন্যাসের তিনটি পুরুষ চরিত্র তিনটি ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী। ফলে একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালীন রাজনীতির মত ও পথকে দেখা হয়নি। বিভিন্ন কৌণিক দূরত্ব থেকে রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপটি বিশ্লেষণ করাই লেখকের উদ্দেশ্য। ফলে এখানে শুধু একটি রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায় নি। আছে বিভিন্ন দলের স্বাধীনতা আন্দোলনে, বিশেযত চল্লিশের দশকে অংশগ্রহণকারী দলগুলির ভূমিকা, পরস্পরের সমালোচনা ও সেই সূত্রে আদর্শগত বিভেদের উৎস সন্ধানের চেষ্টা। প্রত্যেকে নিজের দলের উদ্দেশ্য ও কাজের সাফল্যের সঙ্গে অন্যদলের তফাৎটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না হলেও পর্যালোচনা করবার প্রবণতায় আগ্রহী। অন্যদলের প্রেক্ষিতে নিজেদের সংগঠনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিও ধরবার চেষ্টা করেছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বাবার স্বগত-ভাষণ অংশটি স্মরণীয়। তিনি নিষ্ঠবান গান্ধীবাদী। বিয়াল্লিশের 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র ডাকে তিনি আজ জেল বন্দী। সেখানে আরও অন্যদলের নেতৃস্থানীয় প্রথমশ্রেণীর বন্দীদের সঙ্গে তিনিও দিনযাপন করছেন। এই আপার ডিভিশন ওয়ার্ডটি যেন ''জাগরী''র পাঠকের কাছে কালের দলিল হয়ে আছে। রাজনৈতিক দলগুলির আদর্শ, বিশ্বাস, আত্মসর্বস্বতা, বিচ্ছিন্নতা, উন্নাসিকতার সজীব চিত্র ফুটে উঠেছে বাবার একটি রাত্রির আত্মজিজ্ঞাসার সূত্রে। গান্ধীবাদীরা সন্ধেয় প্রার্থনা বসলে সোস্যালিস্ট সদস্যেরা বেসুরে অন্যগান শুরু করে যে অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেয় তা তাঁর নজর এড়ায়নি। কিন্তু এ সম্পর্কে উদারতা তাঁর দলেরও নেই—'তাহারা বলে আমরা ছোট হইব কেন? উহারা যে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত নাকের সম্মুখে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে, লছমীকান্তের মার্ক্সক্লাসের লেকচারের ঠেলায় যে আমাদের ঘুমাইবার উপায় নাই—আমরা কি কিছু বলি?' (পৃ. ৬৯)। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতের এই সব নবগঠিত দলগুলির অধিকাংশ সদস্যই ছেলেমানুষ। তাদের সহিষ্ণুতা নেই। আত্মশ্লাঘা, ব্যক্তিগত বিরোধ উচ্চাভিমানকে এই প্রবীণ আশ্রম-জীবনে বিশ্বাসী বাবা উদার দৃষ্টিতে দেখেন ও আত্মসমালোচনায় নিজেকে নিয়ত শুদ্ধ করতে চান—'ঐ সব একরত্তি ছেলে। ওদের আবার দোষগুণের বিচার করিতে যাইব আমরা! তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে—এখনও আমরা মনের বৃত্তিগুলি সংযত করিতে পারি নাই। আর উহারা তো ছেলে মানুষ।' (পৃ. ৬৯)। অথচ তিনিই আবার বলেন—'দলে দলে রাজনৈতিক কর্মীরা আমাদের মত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। বোঝো না বোঝো, মানো না মানো সোস্যালিস্ট হওয়া তো একটি ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। .... নিজের দেশের বেদ, পুরাণ, মুনি ঋষি, ইতিহাস সব গেল—সকলের নজর রুশের উপর। আরে, রুশ কি নিজের দেশের চাইতেও উঁচুতে? .... দেশ বিদেশের ইতিহাসের কথা আমরাও পড়িয়াছিলাম। ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডী, ওয়াশিংটন, কোসুথের অমরকাহিনী আমাদেরও রোমাঞ্চ আনিয়া দিত। ..... কিন্তু তাই বলিয়া শিবাজীর গৌরবকথা ভুলিয়া যাই নাই। বিবেকানন্দের বাণী ছাড়িয়া মার্কসের বুলির ফাঁদে পড়ি নাই। মহাত্মাজী অপেক্ষা স্ট্যালিনকে বড় বলিয়া মনে করি নাই।' (পৃ. ৬৬)। গান্ধীজীর সূত্রযজ্ঞে বিশ্বাসী, আত্মশুদ্ধি দ্বারা চিত্ত শোধনে আগ্রহী, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহারবসন সম্পর্কে অনাসক্ত বাবা চরিত্র অর্থাৎ গান্ধীবাদীর দৃষ্টিতে কমরেড বৈদ্যনাথের সাজসজ্জা বিসদৃশ ঠেকে। প্রচ্ছন্ন

ব্যঙ্গোক্তি শোনা যায় তাঁর আত্মকথনে— 'রোগা, শুকনো দড়ি পাকানো শরীর। পায়জামা পরিহিত, গায়ে পাঞ্জাবি, কলারটি উঁচু। সোস্যালিস্টদের সকলেই দেখি 'কাপড়াগুদান-এর কয়েদী দরজীকে বিড়ি দিয়া এরূপ জামা তৈয়ারী করাইয়াছে। এঁরাই আবার পৃথিবীতে সর্বহারার রাজ্য আনিবেন।' (পৃ. ৮১)। অপরপক্ষে সোস্যালিস্টরা বা অন্যদল গান্ধীবাদীদের যে চোখে দেখে তাও বাবার স্মৃতিমন্থন অংশের সত্য স্বগত আলাপে ধরা পড়ে, দেশের রাজনৈতিক দলগুলির মতবিভেদ ও ত্রুটি বিচ্যুতি যে কি পরিমাণ তাও পাঠকের অগোচর থাকে না—' কেয়া সদাশিউ, ভূমিহার-রাজপুত-জাতীয় মহাসভা কী বৈঠক খতম হুই'— লক্ষ্য সূত্রযজ্ঞের উপর। বিহারের গরমপন্থীরা অর্থাৎ সোস্যালিস্ট, কম্যুনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাণসভার সদস্যরা দক্ষিণ পন্থীদিগকে এই বলিয়া ঠাট্টা করে যে, বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কেবল স্থানীয় ভূমিহার ও রাজপুত জাতের পারস্পরিক দলাদলির মুখপাত্র মাত্র। প্রাদেশিক কংগ্রেসে নাকি রাজনৈতিক দলাদলি নাই, দলাদলি আছে জাত লইয়া, আর ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া। কথাটা কতকাংশে সত্য। আমাদের দেশে স্বরাজ কি কখনও হইবে, এক এক সময় ঘৃণা ধরিয়া যায়। নীলুর বিলুর দলগুলি যাহা বলে তার সব ভুল নয়।' (পৃ. ৯১)।

শুধু বাবাই নয় কম্যুনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী নীলুর চোখেও অন্যদলগুলির ত্রুটি বিচ্যুতি স্পষ্ট হয়েছে। সে দেখেছে কংগ্রেস সংগঠনে ধনী কিষাণদের অন্যায় লোভ— 'আসল কথা বড় একান্নভুক্ত পরিবারের সকল লোকের কাজ, জমিজমা দেখিতে দরকার হয় না। বাড়ির অন্ন ধ্বংস করিয়া গ্রামে জটলা করা অপেক্ষা এক আধজনের কংগ্রেসে যোগদান করা ভালো। ইহাই বড় কৃষাণদের মনোবৃত্তি। কংগ্রেস সংগঠন হইতে যতটুকু সুবিধা পাওয়া সম্ভব, তাহা এই 'দানে'র দ্বারা নিশ্চিত হইয়া যায়। চাই কী, ভাই যদি কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মন জুগাইয়া চলে তাহা হইলে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার পর্যন্ত হইয়া যাইতে পারে। আর নেহাৎ যদি কংগ্রেস কোনো বিষয়ে ধনী কৃষাণের উপর চাপ দিতে আরম্ভ করে, তখন তাহা গায়ে না মাখিলেই হইল। শেষ পর্যন্ত নৈতিক প্রভাব ব্যতীত আর কোনো শক্তিই তো কংগ্রেসের নাই।' (পৃ. ১৮৮)। কংগ্রেসের এই ব্যর্থতাই নীলু বিলুর মতো তরুণদের আঘাত করে। তারা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। কিন্তু নীলু ধীরে ধীরে ভিন্ন রাজনীতির স্বাদ পায়। তার চোখে দাদার রাজনীতির ত্রুটি প্রকট হয়ে ওঠে— 'দাদার পক্ষপুটে থাকিয়া যে ভঙ্গীতে রাজনীতিক্ষেত্র দেখিতাম, তাহা রুগ্ন, Jaundiced. ভ্রান্ত ; উহা সুবিধাবাদী নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাব প্রবণতার উচ্ছ্বাসমাত্র। যথার্থ সর্বহারার সাবলীল উদ্দামতার স্থান সেখানে নাই ;— জাতীয়তার বাইরে দেখিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই।' (পৃ. ১৯০)। নীলুর মনোভঙ্গীতে সোস্যালিস্ট দলের নেতৃত্ব সম্পর্কেও সংশয় জাগে, তার মতো একনিষ্ঠ কর্মীর কাছে 'রাজনীতিক কর্মীর জীবন তাহার পার্টির ভিতরে— পার্টির বাহিরের অস্তিত্ব তাহাকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিতে হইবে।' কিন্তু সোস্যালিস্ট ক্রান্তি প্রচেষ্টার নেতা বিনায়ক মিশির সম্পর্কে নীলু বীতশ্রদ্ধ। কারণ যে সর্বঘটে আছে— 'ছট পরবের পৌরোহিত্য করে, হিন্দু মিশনের লেকচার দেয়, খ্রীষ্টান সাঁওতালদের 'শুদ্ধি' করে, কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময় মন্ত্রীর টুরে গা ঘেঁসিয়া বসে। সে হাত গুনিয়া, বিবাহের

দিন দেখিয়া, ঠিকুজি তৈয়ার করিয়া, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদী ও টোটকা ঔষধ দিয়া বেশ পয়সা রোজগার করে। ..... এইরূপ ধরণের নেতৃত্বে, এইরূপ সংগঠনে, এইরূপ সময়ে, হইবে ক্রান্তি।' পৃ. ২০৬।

"জাগরী"তে এই মতাদর্শগত ভেদনীতির অসংখ্য চিত্র আছে। কিন্তু এগুলির মধ্যে বিরোধের অবকাশও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উপন্যাসে এই আদর্শগত বিরোধের প্রভাব রাজনীতি ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তার বিশ্লেষণ নেই। সতীনাথের উদার মতাদর্শ, রাজনৈতিক সততার সূক্ষ্ম পরিচয় থাকলেও চরিত্রগুলির মধ্যে সংঘাত জনিত পরিবর্তনের রূপটি ফুটে ওঠেনি। এখানে রাজনীতি প্রসঙ্গ এসেছে ঠিক কথা। কিন্তু তা দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত চিন্তাধারার পথ উন্মোচন করেনি।

এছাড়াও, যে আন্দোলন এই পরিবারে চরম সঙ্কট সৃষ্টি করল, সেই রাজনৈতিক পরিবেশ ও তার প্রভাব লেখক স্পষ্ট তুলে ধরেন নি। শুধু বিলু অংশে আন্দোলনের বিক্ষুব্ধ চেহারা ও তাতে বিলুর ভূমিকা একবার বিবৃত হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের খণ্ডচিত্র পাই বিলুর স্মৃতিচারণায়—'যাহা দেখিয়াছি—জনশক্তির প্রকৃত স্বরূপ—গত আগষ্ট মাসে যাহা দেখিয়াছি—যুগযুগ সঞ্চিত জগদ্দল পাথরের নীচে যে সুপ্ত শক্তির সন্ধান পাইয়াছি—তাহা সচেতন হইলে কে কি করিতে পারে। 'হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো'।...... বড় বড় গাছের গুঁড়ি গড়াইয়া আনিয়া রাস্তায় স্তূপীকৃত করিতেছে, করিয়া গ্রামের শতাধিক লোক। .... পূর্ণিয়া রোডের উপর গাছের গুঁড়ির একটি ব্যারিকেড গড়িয়া উঠিল। অদম্য উৎসাহ অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। যে গরীব কিষাণের দল জীবনে কখনও প্রাণ খুলিয়া হাসিবার অবকাশ পায় নাই, তাহাদের আজ হইল কী? ..... কাঠের গুঁড়ির স্তূপ অনেক উঁচু উঠিয়াছে—আর মিলিটারি লরি আসিতে পারিবে না। ....কুড়ুল, কোদাল, দা, কাটারি যে যাহা পাইয়াছে হাতে লইয়াছে। .... রহুয়া! রহুয়া গ্রামের লোকেরা আসিয়া জুটিল। দু ঘণ্টায় রহুয়ার পর্ব শেষ। আবার চলো — ও। চলো—ও। কৃত্যানন্দ নগর রেল স্টেশনের দিকে। রাস্তা বন্ধ করায় কোন উদ্দীপনা নাই। থানা জ্বালাইবার পর এসব কাজ নেহাত পানসে লাগিতেছে। এবার কবৈয়া রহুয়ার সমবেত দল ভূতাবিষ্ট ও নেশাগ্রস্তের মতো।....জনতা চলিয়াছে। আগে চলিয়াছে পিছনে ফিরিয়া তাকাইবে কেন? ...... ইহাদের হাতে এখন কত কাজ। মাথায় কত বড়ো দায়িত্ব।.... জনপ্রবাহ চলিয়াছে ; আমাদের আদিম পুরুষেরা পেটের দায়ে, হতাশ হৃদয়ে অনিশ্চিত লক্ষ্য লইয়া যেরূপ বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, এ সেরূপ নয়। ইহা নূতন জগতের আশায়, উদভ্রান্ত জনতার অবধারিত লক্ষ্যের দিকে চলা'। (পৃঃ ৪৭-৫৩)।

সাম্যবাদী নীলুর চোখে বিয়াল্লিশের আন্দোলন শুধু উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছু নয়। কংগ্রেস সোস্যালিস্টপার্টি নাশকতামূলক কাজে নেশাগ্রস্তের মতো ছুটে চলেছে। এই বিধ্বংসী নাশকতামূলক কার্যকলাপকে নীলু ব্যাখ্যা করে—ফ্যাসিস্ট শক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটানো হচ্ছে। তাছাড়া এই দল ধর্মীয় কুসংস্কার সম্পর্কে সজাগ থেকেও তাকে অনুমোদন করে যাচ্ছে শুধু কাজ গোছানোর তাগিদায়। রাজনীতিতে একরোখা, স্বভাবে গোঁয়ার, জেদী নীলুর চোখে এই আন্দোলন ভয়ঙ্কর অন্যায় বলে মনে হয়েছে—'সম্পূর্ণ অরাজকতা—ফ্যাসিস্টদের

রাজত্ব—জাতীয়শক্তির বিরাট অপচয়—অসংহত, বিশৃঙ্খল, অদূরদর্শী—অথচ দুর্লভ নিঃস্বার্থ ত্যাগের মহিমায় মহীয়ান।' (পৃ. ২০৬)। তার কাছে এই বিপ্লব— 'হোলির দিন গ্রামশুদ্ধ লোক নেশা করিয়া যেইরূপ হইয়া যায়, ইহারাও ঠিক সেইরূপ। এস অধীর উত্তেজনাকেই দাদার দল বলে বিপ্লবের ড্রেস রিহার্সাল—ইহাই নাকি ক্রান্তির প্রচেষ্টা।' (পৃঃ ২০৬)। নীলুর কাছে ক্রান্তি দলের ভণ্ডামি, চাঁদা আদায়ের নতুন পথ, স্বরাজীর নামে স্বেচ্ছাচার, দেশসেবার নামে জাতীয় ক্ষতি, কাজের নামে উত্তেজনা পোষণ সবই কৃত্রিমতায় ভরা, উন্মত্ততায় জনতা দিশাহারা। জাতীয় আন্দোলনের ব্যর্থতাই নীলুকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করেছে। 'জেল খুলিয়া কয়েদী পালাইতেছে। জেলখানার উপর কংগ্রেস পতাকা। সরকারী ট্রেজারীর নোটগুলি জ্বালানো হইতেছে। পশ্চিমে গোরাখপুর জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিয়া সর্বত্রই দেশের এই অবস্থা'। (পৃ. ২০৬)

শুধু এইটুকুই আছে। এর-ই ওপর ভিত্তি করে প্রবাহিত হয়েছে চেতনা-প্রবাহের স্রোত-তরঙ্গ। এই আন্দোলনের ফলাফল, জাতীয় জীবনে তার প্রভাব দেখানো হয়নি। ভারতবর্ষের অসংখ্য আত্মোৎসর্গকারী স্বাধীনতাকামীর মতো বিলুও একটা নাম মাত্র হয়ে থাকবে এ ধারণা লেখকের মনে যে জাগেনি তা নয়। কিন্তু সতীনাথ এইখানেই শিল্পীর চিরন্তনতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিলুর মানবীয় দ্বন্দ্ব, নীলুর দ্বিধা, বাবার অসহায়তা, মায়ের করুণ আর্তিকে পৌঁছে দিয়েছেন সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের সঙ্কট ও সঙ্কটমোচনের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা নতুন চেতনার স্তরে, যেখানে সত্তার জাগরণ ঘটেছে। শুধু ব্যক্তির একক দ্বন্দ্ব নয়, "জাগরী"র মূল ভরকেন্দ্র এই মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে আবর্তিত হয়েছে।

এ উপন্যাসের চরিত্রগুলি ভিন্ন রাজনীতি, আদর্শের প্রকাশ হলেও দলের মুখপাত্র নয়। সতীনাথ কোন বিশেষ দলের প্রচারক নন। চরিত্রগুলি কেউই টাইপ বা মতবাদের বাহক নয়। একটি রাত্রির স্মৃতিচারণায় তারা (বিলু নীলু,) প্রত্যেকেই তাদের শৈশব কৈশোর যৌবনের বিবর্তিত রূপ নিয়ে ধরা পড়েছে। বরং বলা যায় এরা যথার্থ 'রাজনৈতিক' অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণে 'ব্যক্তিক'। বিলুর অন্তিম স্মৃতিতে নীলুর উগ্র রাজনৈতিক চেহারার চেয়ে অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে—'হাফপ্যান্ট পরিহিত নয় দশ বছরের ক্যাপ্টেন নীলুর একটা চীনামাটির কাপ সসার লইয়া গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিতেছে, হিপ্ হিপ্ হুররে। গরমে পরিশ্রমে, চীৎকারে মুখলোহিতাভ'। (পৃ. ৪২)। নীলু তুলনায় স্পষ্টভাষী। সে নিজে দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে অবধি নিজের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। দাদার বর্তমান রাজনীতির সঙ্গে তার আদর্শের তফাৎ তার স্বগত কথন অংশে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। সেও একদিন দাদার আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু ক্রমেই স্পেনের কর্মীদের কাহিনী, লাল চীনের মরণজয়ী বীরদের কাহিনী, মাও-সে-তুং-এর শৌর্য ও একনিষ্ঠা, চক্রদেও-এর ক্লাসে লেকচার তাকে নিয়ে এসেছে অন্যপথে। তবু তার চোখে 'দাদার অন্যরূপ আচরণ অপ্রত্যাশিত।'। অন্যত্র নীলুর মুখে শোনা যায়—'ও যে আমার দাদা। কত সুখ দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত এক সূত্রে গাঁথা আমাদের জীবন। কিসে আমার ভালো হইবে, কিসে আমার একটু আনন্দ হইবে, এই চিন্তা সর্বদা তাহার মনে।' (পৃ. ১৮৯)। এমনি

LIBRARY ... VERSITY

কত সুখ-স্মৃতি, দাদার ভালোবাসার তুচ্ছ ঘটনা অন্ধকার রাতে জেলগেটে অপেক্ষমান নীলুকে নিয়ে যায় সকল রাজনৈতিক ভাবনার ওপারে যেখানে রয়েছে প্রীতির বন্ধন, সহোদরের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা, কর্তব্য দায়িত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অচ্ছেদ্য সুখানুভূতি। বিলু নীলুর মাও সেই বিনিদ্ররাতে বারবার নিজের কাছে প্রশ্ন করেছেন 'নীলু দেবে বিলুর বিরুদ্ধে সাক্ষী'? তাঁর চোখে দুই ছেলের রাজনৈতিক জীবন, কর্মব্যস্ত দেশ সেবার মূর্তি কোনো ছায়া বিস্তার করেনি ; বরং সব ছাপিয়ে সেইসব দৃশ্য তাঁর কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে—'ইজের পরা দাদা বিলু, ছোট্টো নীলুকে গলা টিপে আদর করছে নীলু-নিল্লু পিলু-পিল্লু।' (পৃ. ১৪৬)। দুজনের ঘনিষ্ঠতা, নির্ভরতা, ভালোবাসা, একসঙ্গে হাঁটা চলা বসা শোওয়ার ছবি মায়ের মনে যে স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে তাকে তিনি ভুলবেন কেমন করে! জেলের আপার ডিভিশন ওয়ার্ডে বসে বাবা, যিনি রাজনীতিকে জীবনের সঙ্গী করেছেন ; যাঁর প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক প্রশ্রয় আজকের এই পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশে দায়ী, তাঁর কাছেও বিলুর ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ, তাঁর প্রভাব তাঁর মতাদর্শকে প্রভাবিত বা পরিবর্তিত করেনি। তিনিও পারেননি তাঁর গান্ধীভাবাদর্শের মধ্যে বিলুকে ধরে রাখতে। তাঁর কাছে পুত্রদের ভিন্ন রাজনৈতিক মত কোনো সঙ্কট বা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় নি। আর চরম মুহূর্তে তাঁর মতো রাজনীতি সচেতন মানুষটির কাছে বিলুর ব্যক্তি পরিচয়টাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে—'মাথা ভরা কোঁকড়া চুল, ফুটফুটে রং, একটু মেয়েলি ধাঁচের লম্বা ধরনের মুখ, চিবুকটি সরু, কালো চোখের গভীর দৃষ্টি ভাবুকতায় ভরা।' (পৃ. ৭৮)। এ ধরনের অসংখ্য উদ্ধৃতি সংগ্রহ করা যেতে পারে যেগুলি থেকে বিলু ও তার পরিবার স্নেহ-প্রীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ধনে পাঠকের কাছে তাদের জাতীয় সত্তা, সামাজিক ভূমিকার চেয়ে ব্যক্তিসত্তার নিবিড় পরিচয় নিয়ে উঠে আসে। জেলের মধ্যে বা জেলের বাইরে রাজনৈতিক ভূমিতে তাঁদের পরিচয় কেউ গান্ধীবাদী ; কেউ বা গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাস হারিয়ে, ধনীকৃষকের আচরণে ঘৃণা বোধ করে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ; আবার সোস্যালিস্টদের ধর্মীয় কুসংস্কার ও উন্মত্ততায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে অন্যজন কম্যুনিস্ট আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। একমাত্র মা চরিত্রটিই ব্যক্তিগতভাবে কোনো রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে 'রাষ্ট্রীয় জীবন' বেছে নেননি। তিনি একান্তভাবেই বাঙালী পরিবারের স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে গড়া মা-এর সার্থকরূপ। বাঙালীরমণীর স্বামী সন্তানকে ঘিরে যে আশা প্রত্যাশা জাগে, তাকেই মা রক্ষা করতে চান। কিন্তু স্বামীর সহধর্মিণী বলেই তিনি গান্ধীবাদী স্বামীর রাজনৈতিক মতাদর্শ বাধ্য হয়ে স্বীকার করেছেন। কিন্তু উপন্যাসে কোথাও ভিন্ন মতাদর্শের সমস্যা, সংঘাত বড়ো হয়ে জটিলতা সৃষ্টি করেনি। নীলুর সাক্ষী দেবার ঘটনার জের হিসেবেই রাজনৈতিক মতের ভিন্নতা পাঠকের মনে নাড়া দিয়েছে মাত্র। নয়তো রাজনীতির বিরোধ, বিবর্তন চরিত্রগুলির মানস পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। এমনকি বিলুর অত প্রিয় জ্যাঠাইমা, ন'দিদি চরিত্র এই রাজনৈতিক পরিবারের পাশাপাশি থেকেও তাদের দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হননি বরং জ্যাঠাইমার সঙ্গে বিলুর মানবিক সম্পর্কের পরিচয়টাই বিভিন্ন জনের স্মৃতিতে সত্য হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, পরিবারের আপনজনেরাও এই মধ্যবিত্ত জীবনে অস্তিত্বের সঙ্কট, অনিশ্চয়তা, সংশয় ও জিজ্ঞাসা

নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্কের গূঢ় রহস্য সন্ধানেই ব্যস্ত থেকেছে। মৃত্যুর প্রান্তে দাঁড়িয়ে কেউই জীবনকে তুচ্ছ করতে পারেনি। বিপন্ন মানুষের অন্তিম মুহূর্তে নিজেকে ও পরস্পরকে জানবার চেনবার ; পিছু ফিরে পুরোনো বিগত সুখ দুঃখের অতীতটা হাঁতড়ে বাঁচবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসে। চিরন্তন মানবিক বোধ, শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা, জীবনায়নের মধ্যে শেষ হয়েছে উপন্যাস। তাই রাত্রির প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে আর এক নতুন সকালের সূচনায়। আর এক সুন্দর জীবনের সম্ভাবনার অঞ্জলিতে ভরে গেছে ভোরের পৃথিবী।

"জাগরী"র রাজনীতি প্রসঙ্গ ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা মূর্ত হয়েছে যাদের সাহায্যে, সেই চরিত্রগুলি একান্তভাবেই সজীব, প্রাণবন্ত, রক্ত মাংসের গড়া বাস্তব চরিত্র। তারা কেউই 'অমানুষ' নয় বা 'মহামানব' নয়। সতীনাথের কোনো উপন্যাসেই চরিত্রগুলি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর বা অতি আদর্শবান নয়। ঢোঁড়াই চরিত্র এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় ; তাকে রামচন্দ্রের আদলে গড়তে চাইলেও সে রামচন্দ্র হয়ে ওঠেনি ; সে একেবারেই অনাদৃত, অপরিচিত অতিতুচ্ছ ব্যর্থ মানুষ হয়েই শেষ পর্যন্ত থেকে গেছে। "জাগরী"র চারটি চরিত্রের রাজনৈতিক পরিচয় যেমন আছে, তেমনি তারা আবার 'পারিবারিক'ও। প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকে বাবা, মা, ছেলে, দাদা, ভাই—এই চিরন্তন নিবিড় পরিচয়ের সূত্রে বাঁধা আছে এক জায়গায়। অথচ সতীনাথ এদের শুধু রাজনৈতিক বা পারিবারিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য "জাগরী" রচনা করেন নি, একথা স্বীকার করতেই হবে। তাহলে? আসলে সতীনাথ এ উপন্যাসে ধরতে চেয়েছেন একটা পরিবর্তিত সময়কে ; ধরতে চেয়েছেন পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সমপৃক্ত মানুষকে, মানুষের পরিবর্তিসত্তার যথার্থ পরিচয়। রাজনীতির বিচিত্র বিরোধমূলক পরিসরে রাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যে জীবন নিয়ত রূপ পাচ্ছে ; বদল হচ্ছে ; রূপান্তর ঘটাচ্ছে ব্যক্তির — তাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। তাই চারটি চরিত্রই স্বতন্ত্র স্বভাব বৈশিষ্ট্যে একে অন্যের থেকে পৃথকই নয় ; সম্পূর্ণ গোটা মানুষের মনের চেহারা নিয়ে তারা উপন্যাসে মননশীল মানবিক ব্যক্তি চরিত্র হয়ে উঠেছে।

চরিত্রগুলির মধ্যে সকলের আগে আছে বিলুর কথা। বিলু এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। পূর্ণিয়া জেলার কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা বিলু বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগে ধরা পড়ে ও বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়। আগামীকাল তার ফাঁসির দিন ঠিক হয়েছে। বিলু বা তার দল বিয়াল্লিশের আন্দোলনে বিহার অঞ্চলে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। কিন্তু এই সোস্যালিস্ট দল ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার আগে আর কখনো বড়ো একটা ভূমিকা নেয়নি। এ দলটি গান্ধীবাদী অহিংসনীতি, সূত্রযজ্ঞ, ভজনগান, চরকা চালানো ও অন্ধ গান্ধী আনুগত্যকে কোনোদিনই গভীরভাবে স্বীকার করতে পারেনি। এরা মার্কসীয় তত্ত্ব, সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করলেও সে সময়ে বামপন্থী বিপরীত দল যা কম্যুনিস্ট আদর্শ বলে ভারতের মাটিতে ক্রমেই মূল বিস্তার করছিল তাকেও তারা গ্রহণ করতে পারেনি। বিলু ও নীলুর মধ্যে আদর্শের দ্বন্দ্ব এবং বিলুর মধ্যে গান্ধীবাদ ও মার্কসবাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে একটা

আদর্শগত দ্বিধা বরাবরই থেকে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায় ভারতবর্ষে বিয়াল্লিশের আন্দোলনে নীলুর দলের ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দেশের শাসকশক্তিকে সমর্থন করার কারণ কোনো স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী কর্মীই বুঝতে পারেনি। নীলু এই দলের সমর্থক। আর তারই সক্রিয় চেষ্টায় দাদা বিলু ধরা পড়ে। তারই সত্যসাক্ষে বিলুর ফাঁসির আদেশ হয়। একদিকে রাজনীতির আদর্শ, অন্যদিকে পারিবারিক আত্মিক সম্পর্ক—এই দুয়ের দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে সতীনাথ পাঠককে পৌঁছে দিয়েছেন বিলুর আত্মচারণ ও আত্মজিজ্ঞাসার সাহায্যে উদঘাটিত মনোলোকে। লেখক বিলু ও তার পরিবারকে পেতে চেয়েছেন নির্জনতায়, একাকীত্বের মধ্যে। তাই সতীনাথ নিজে উপন্যাসটি লেখবার সময় আশ্রয় নিয়েছিলেন ট্রায়াল সেলে। আর বিলুর অনিবার্য মৃত্যুর আগের সন্ধ্যেয় প্রথমেই পাঠককে পৌঁছে দিয়েছেন ফাঁসির সেলে (একনম্বর) বিলুর মুখোমুখি। বিলু সেখানে সম্পূর্ণ একা। তার প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস, চিন্তার তরঙ্গ সেলের চারটে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে বারবার তারই কাছে ফিরে এসেছে। এই নিঃসঙ্গ নির্জনতা আরো তীব্রতর হয় যখন দূর থেকে ভেসে আসে বদলি ওয়ার্ডারের 'গিনতি'র সুর 'বোলোরে নয়া গো—ল' ইত্যাদি। জেলের প্রহর যাপনের ঘণ্টা পড়ে রাতটাকে এগিয়ে নিয়ে যায় সেই অন্তিমক্ষণের দিকে। আর ততই বিলুর হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয় ; তার দেহের ছায়া দ্রুত কম্পিত ও প্রলম্বিত হয়ে তাকে আরো একাকীত্বের অসহায়তায় আচ্ছন্ন করে ফেলে।

বিলুর আত্মচারণা অংশে শুধু সে নিজে নয়, সেই সঙ্গে অন্য তিনজন এবং আরো অসংখ্য চরিত্র, অজস্র ঘটনা উঠে এসেছে পাঠকের সামনে। অসাধারণ এক শিল্পরীতির সাহায্যে লেখক একের স্মৃতিচারণায় অন্যকে স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ করে উপস্থাপিত করেছেন। নিরাসক্ত লেখভঙ্গীতে লেখক উত্তমপুরুষের ভাষ্যে চরিত্রগুলিকে গ্রথিত করেছেন। তাদের অনুভূতি ও উপলব্ধিজাত অনুষঙ্গ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে কাহিনী-চরিত্র ও সময়ের পারস্পরিক সম্পর্ক। চারটি চরিত্রই সম্পূর্ণ একলা একটি বিশেষ মুহূর্তকে সামনে রেখে অতীত ও বর্তমানের সেতু রচনা করেছে, পরস্পরের আত্মিক সম্পর্কও নির্ণীত হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে আত্মসমালোচনা, পরস্পরের তুলনা, প্রতিতুলনা ও অনুভবের প্রগাঢ় অভিব্যক্তি।

বিলু রাজনৈতিক নেতা। ব্যক্তি জীবনে সে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা সাধারণ মানুষ। তার শিক্ষা-চিন্তাধারা যত অভিজ্ঞতায় প্রখর হয়ে উঠেছে তত সে রাজনীতির প্রকৃত চেহারাটাকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছে। তার শৈশব কৈশোর কেটেছে আদর্শ গান্ধীবাদী বাবার আশ্রম জীবনের পরিবেশে। বাবার সংযত শাসনের মধ্যে। গান্ধীবাদী অভিভাবকত্বকে সে সময়ে তারা (নীলুও) মেনে নিয়েছে। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলুর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করেছে বিভিন্ন রাজনীতির সংকীর্ণতা গোঁড়ামী, খণ্ডিত আদর্শকে। নীরবে সরে এসেছে কংগ্রেসের আদর্শ থেকে ; কিন্তু রাজনীতি ত্যাগ করেনি। হয়ে উঠেছে সোস্যালিস্ট। এ চরিত্রে অনেকেই সতীনাথের ব্যক্তিগত প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। বিলুর গান্ধীবাদে ও কংগ্রেসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠার একটা কারণ "জাগরী"তে উল্লেখ করা আছে, সেটা সতীনাথের ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রেও সত্য। ধনী কৃষকের সুবিধাবাদী আচরণ, স্বার্থান্ধতা, দলের লোকের বিচিত্র মনোভাব, অন্ধ গোঁড়ামি— কোনোটাকেই

লেখকের রাজনীতি সচেতন মন দিয়ে তিনি অনুমোদন করেন নি। কিন্তু ''জাগরী''তে বিলুর ভিন্ন রাজনীতির প্রতি আগ্রহের চিত্র বা যুক্তিও তেমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। উপন্যাসে বিলুর রাজনৈতিক জীবন পাঠকের কাছে তেমন স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েনি। কিন্তু বিলু চরিত্রের মনের বিচিত্র গতি, মানবিক অভিব্যক্তি, মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনেক বেশি বিশ্লেষিত হয়েছে। রাজনীতির মাঝখানে থেকে বিলু তার ব্যক্তিসত্তা ও মূল্যবোধের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বকে সন্ধান করেছে। রাজনীতিতে সত্যনিষ্ঠ হয়েও সতীনাথ মানবিক মূল্যবোধের প্রতি যে কি ভীষণ আস্থাশীল তা তাঁর প্রতিটি উপন্যাস, গল্পে প্রমাণিত হয়েছে।

বিলু আর নীলু, দু'ভাই, একে অন্যের অত্যন্ত 'কাছের মানুষ', 'ঘনিষ্ঠ' হলেও, তারা এক নয়। বাবা-মা, জ্যাঠাইমা, পাড়ার সকলের কাছে, দলের অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মী, পূর্ণিয়ার সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের কাছে বিলু 'আদর্শ চরিত্র', 'ভালো ছেলে'। 'ওর মতো ছেলে আর হয়না' এইভাবে পরিচিত হয়ে এসেছে। এই বোধটা ছোটবেলা থেকেই বিলুকে কি পরিমাণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা বিলুর স্মৃতিচারণা থেকেই অনুমান করা যায়। লেখকের পক্ষপাত বিলুর প্রতি। বিলুকে তিনি আত্মচারণার প্রতিটি ক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—সে আদর্শ চরিত্র। নিজের জীবনের শেষ মুহূর্তের কথা ভেবে খুব স্বাভাবিক কারণে সে শঙ্কিত হয়েছে কিন্তু এই আদর্শের মোহে আবিষ্ট ছিল বলেই শঙ্কাভাব ব্যক্ত করতে ইতঃস্তত করেছে।

উপন্যাসে নীলু সম্পর্কে বিলু সবচেয়ে বেশি নীরব। তার কারণ, তার আদর্শ চরিত্রটি যাতে কলঙ্কিত না হয়। কিন্তু এত সত্ত্বেও বিলু পুরোপুরি আদর্শ চরিত্র হয়নি। বরং 'মানবিক' হয়ে উঠেছে। আত্মবিশ্লেষণে আত্মপক্ষ সমর্থনের আশায় নিজের মনের মধ্যে অজস্র যুক্তি খাড়া করে, অনিবার্য মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করবার বাসনা নিয়ে বিলু পাঠকের কাছে বাস্তব হয়ে উঠেছে। বিলুর শেষ সময় যত এগিয়ে এসেছে ততই তার মধ্যে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়েছে—তার অসংলগ্ন উপহাসকটু বিশ্লেষণী মানসিকতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে জীবনাকাঙ্ক্ষী হৃদয়টি। শেষ সময়ের সংকেতসূচক পায়ের ভারি বুটের শব্দ যত এগিয়ে এসেছে বিলুর বুকের ভেতর 'রসমোহন ঢাকীর নবমীর রাতে' বাজানো ঢাকের আওয়াজের চেয়েও প্রবল শব্দ পাঠকের মনকেও শিউরে দিয়েছে। কিম্বা, নীলু, যার কথা বিলু কিছুতেই মনে করতে চায় না ; আর মনে এলেও, সে যে সচেতন ভাবেই তার ও নীলুর ছেলেবেলার সুখ-স্মৃতির মধ্যে হাত বাড়িয়ে তিক্ত বর্তমান থেকে মুক্তি পেতে চায়, তা পাঠকের অগোচের থাকে না। শত চেষ্টা করেও শেষ মুহূর্তে নীলুর মুখ ভুলতে পারে না। আর নীলুর মুখ মনে করতে গেলেই বিলুর অবচেতন মনের যত মানসিক দুশ্চিন্তা, দ্বন্দ্ব একটা বিচিত্র আকার নিয়ে বেরিয়ে আসে—'নীলুর মুখটি মনে করিবার চেষ্টা করিতেচি, কিছুতেই মনে আসিতেছে না। যখন-তখন নীলুর মুখটি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, কিন্তু এখন মনে করিতে চাহিতেছি, শেষ মুহূর্তের একটু তৃপ্তির জন্য। কিন্তু এখন কি মনে আসিবে, মনে করিতে চাহিতেছি নীলুর মুখ—আর মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছে, গণৌরীমাহাতোর মুখ—ন্যাড়ামাথা, খাঁদানাক, বুলডগের মতো মুখ, এককানের উপরিভাগে ছিদ্র করিয়া সোনার আংটা পরানো।' (পৃ. ৬৩)। নীলুর মুখ মনে করতে

গিয়ে 'বুলডগ', গনৌরী মহাতোর বিচিত্র মুখ-এর ছায়া ভেসে ওঠা—বিলুর মানসিক বিপর্যয় বুঝতে সাহায্য করে। এরপরেও কি নীলুর মতো "জাগরী"র পাঠক নিজেকে বোঝাতে চাইবে—'কিন্তু ....কিন্তু দাদার কি আমার ওপর কিছুই দাবি নাই? থাকিতে পারে। রাজনীতিক্ষেত্রে আমি নীলু, আর সে দাদা নয়। পৃথিবী আমার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা ভাবুক, দাদা আমার মনোভাব ঠিক বুঝিবে।' (পৃ. ১৯০)।

বিলু ভাবুক স্বভাবের। বাবার স্মৃতিতে তার ভাবে ভরা চোখদুটিই উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু সেই চোখের তারায় বাবা 'অগ্নিশিখার' তেজও দেখতে পেয়েছেন। বিলুর দলের রাজনৈতিক নিষ্ঠা, পড়বার জানবার আগ্রহের চিত্র বাবাকে মনে করিয়ে দিয়েছে বিলুর জ্ঞানপিপাসা, নিষ্ঠার কথা। তিনিও মনে মনে বিলুর স্বভাবের এই গুণটার সশ্রদ্ধ প্রশংসা না করে পারেন নি। বিলু সম্পর্কে তাঁর গভীর বিশ্বাস বিলুর মানস স্বভাবটিকে ব্যক্ত করেছে। বিলু মিতবাক, সংযত শান্ত রুচিশীল। সে রক্ত সহ্য করতে পারে না। মনে পড়বে সতীনাথ নিজেও ব্লাডস্ট্যান্ড করতে পারতেন না। ভয় বা প্রলোভনের সাহায্যে বিলুকে দিয়ে কেউ কিছু করিয়ে নিতে পারবে না ; কিন্তু ভালো কথায় তাকে দিয়ে অনেক কিছুই করানো যায় একথা বাবা জানেন ও পাঠককে জানিয়ে দেন।

বিলু আত্মবিশ্বাসী ও আত্মসচেতন। বাবার মতে, জেলের পণ্ডিতজীর দৃষ্টিতে সে নাস্তিক। ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন না স্বয়ং লেখকও। বাবার পাঠানো গীতা বিলু ফেরৎ দিয়েছে। পণ্ডিতজীকে প্রণাম জানিয়ে সে বলেছে ধর্মোপদেশে তার প্রয়োজন নেই। অন্য ভালো বই হলে সে পড়তে পারে। জেলসুপার প্রয়োজনের কথা জানতে চাইলে সে বিনীত ভাবে সব কিছুতেই অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। এ সব ঘটনা থেকে বিলুর আত্মসচেতন মনের পরিচয় পাবার অসুবিধে হয় না। পাঠক এইসব তুচ্ছ ঘটনা থেকে তার গর্বিত অহংদৃপ্ত স্বভাবটি খুঁজে পায়।

বিলুর সহানুভূতিশীল স্বতন্ত্র স্বভাবের হৃদয়টিও চারজনের আত্ম-আলাপচারিতায় স্পষ্ট হয়েছে। জ্যাঠাইমাকে মা বলে ডাকায় জ্যাঠাইমার মুখে যে ছবি ভেসে ওঠে, বা মায়ের এ ঘটনা শুনে রাগ করার দৃশ্যটি তার মনে যে অভিব্যক্তি জাগায় তাতে তার চরিত্রের মমতাময় রূপটি ফুটে ওঠে। নীলু ও বিলুর মাকে নিয়ে হাস্যালাপ, মায়ের জন্য দুধটুকু রেখে দেওয়া—এসব অসংখ্য ঘটনায় বিলুর কোমল অন্তরটি লেখক নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার আর একটি স্বপ্নের কথা না বললে চরিত্রটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়—অতি সংক্ষিপ্ত সংযত ভাবনায় বিলুর মনের গভীর স্তর থেকে উদ্বেলিত হয়ে তার রোমান্টিক হৃদয়টি সত্য হয়ে উঠেছে। কি দারুণ সংযত ভঙ্গিতে লেখক বিলুকে তুলে ধরেছেন এখানে। মৃত্যু যত কাছে এসেছে, বাঁচবার তীব্রতা যতই সংবিতস্তরে প্রবল হয়েছে ততই বিলুর জীবনায়ন ঘটেছে। সে বাঁচতে চেয়েছে—রাজনৈতিক নেতা হয়ে নয়, শুধু বাবা-মায়ের ছেলে হয়ে নয়, নীলুর দাদা হয়েও নয়—একান্তভাবে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ হয়ে—যে স্বপ্ন দেখে ঘরের, ভবিষ্যতের সুখের— সে গৃহী মানুষ হতে চেয়েছে। হরিপদ কেরাণীর মতো সেও দেখেছে একটা স্বপ্ন—'পরণে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর'-এর। অথচ আদর্শবাদী বিলুই একদিন বলেছিল 'রাজনৈতিক কর্মীর বিবাহের শখ রাখা উচিত নয়'। সেই বিলু

গভীর অন্ধকার রাতে লোহার গরাদ ধরে সেই জীবনের মাঝে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখেছে—'সরস্বতীর সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখা দোড়গোড়ায় দাঁড়াইয়া হাসি হাসি মুখ—সলজ্জ উৎকণ্ঠার সহিত বলে বসো, একটু জিরিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নাও।' ইত্যাদি আরো কত টুকরো টুকরো স্বপ্ন।

এমন ভাবে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে জীবন সম্পর্কে ভাবনা খুবই স্বাভাবিক ; মানুষের বেঁচে থাকার চিরন্তন প্রত্যাশাই নয়, জীবনের প্রতি মমত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি মর্মস্পর্শী—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আদর্শনিষ্ঠ বিলু সেই রাতে আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে বেঁচে থাকার আকুলতায় এমন বহু যুক্তি খাড়া করেছে—'আমি অতি মানব নই, অতি সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ—মানুষের সকলদোষ ভ্রান্তি দুর্বলতা আমার মধ্যে।' (পৃ. ৪৭)। বা সে নিজেই বলে 'বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছে?' এই আকাঙ্ক্ষার সে একের পর এক কল্পনা ও যুক্তির টানা পোড়েনে এক একটা সম্ভাবনা নিজে হাতে গড়ে নিজেই ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছে—'১৯৩৪ এর ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের মতো ভূমিকম্প এখন যদি হয়, জেলের দেওয়াল যদি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়, তাহা হইলেও আমার বাঁচিবার উপায় নাই। যে ফাঁসি দিবে তাহার যদি হঠাৎ অসুখ করে? তাহা হইলে অন্য লোক পাইতে দেরী হইবে না। যদি হাইকোর্ট হইতে অথবা প্রভিন্সিয়াল এডভাইসরের নিকট হইতে চিঠি আসিয়া থাকে, আমার ফাঁসি বন্ধ করিয়া দিতে, আর দৈবাৎ ভ্রমক্রমে তাহা যদি খোলা না হইয়া থাকে'—এমন অসংখ্য চিন্তার তরঙ্গ রাতের গভীর স্তব্ধতা ভেদ করে বিলুর অন্তরঙ্গ মানবিক জীবনাকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রকাশ করেছে। বিলু শেষ পর্যন্ত নিজেকে পুরোপুরি জেনেছে। মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে কিভাবে সময় ও রাজনীতির ব্যর্থ চোরাবালিতে পথ হারাতে হয়েছে তারই স্বরূপ ফুটে উঠেছে তার আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে। আপাত পারিবারিক স্নেহবন্ধনের নিবিড় সত্যগ্রন্থিটি ভিন্ন রাজনৈতিক তরঙ্গাঘাতে কখন শিথিল ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে তাদের, তা তারা কেউই জানতে পারে নি। সেই জানার জন্যই তাদের প্রত্যেককে একটা সঙ্কটের, সংশয়ের রাতে সম্পূর্ণ নিজের মধ্যে নিজেকে সন্ধান করতে হয়েছে। তারপর তারা যা জেনেছে তাতে কি তারা প্রত্যেকে আবার একটা কেন্দ্র বিন্দুতে মিলিত হতে পেরেছে? ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জাগৃতি মধ্যবিত্ত মানুষকে যে ভাবে বিচ্ছিন্ন একক করে ফেলেছে আর কি সেখান থেকে ফেরা সম্ভব হবে—তারই উত্তর খুঁজেছে বিলু ও তার মতো অজস্র সমাজ-রাজনীতি-পরিবার-ব্যক্তিসচেতন মানুষ।

উপন্যাসে বিলু অংশের পরই বাবার আত্মচারণা শুরু হয়েছে। সময়ের দিক থেকে একই সময় অর্থাৎ সেই নিঃসঙ্গ শ্বাসরোধকারী রাতে প্রত্যেকে নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গায় বসে অস্থির উৎকণ্ঠিত চিত্তকে নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু বিলুর জীবনসমস্যা বলে সেই প্রথম কথক। এর পরেই বাবা—বিলুরই মতো বা তার চেয়েও অনেক সংযত, আত্মদীপ্ত চারিত্র গুণের অধিকারী তিনি। তাঁর ভূমিকা উপন্যাসে শুধু দর্শকের নয়, আত্মদর্শন লাভে তিনিও নিজেকে নতুন করে জেনেছেন। এ চরিত্রটিকে লেখক সাহিত্যে একটা স্থায়ী

আসন করে দিয়েছেন তাঁর মরমী লেখনগুণে। বাংলা সাহিত্যে অভিজ্ঞতার নিবিড় ঘনিষ্ঠ অনুভবে পিতার চরিত্র খুব কমই রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" উপন্যাসে ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত পিতৃপ্রতিম পরেশবাবু—আদর্শ, সহানুভূতি, সংযম ও মিতবাক স্বভাবগুণের যে পরিচয় রেখেছেন, সে কথা মনে রেখেও বলতে হয়, "জাগরী" উপন্যাসে বাবার চরিত্রটি বিশশতকের প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের মাঝে একটি আদর্শ চরিত্রের প্রতীক হয়ে আছে। পরেশবাবুর সময়টা উনবিংশ শতাব্দীর সমুন্নত ভাবধারার প্রতিষ্ঠার কাল। তিনি তাঁর সমকালের মুক্ত উদার মানসিকতার প্রতিভূ! কিন্তু এই শতকের মহাযুদ্ধোত্তর ও আগামী আসন্ন যুদ্ধের সঙ্কটের মধ্যবর্তী কালে মধ্যবিত্ত মানসিকতার অবক্ষয় ও তার থেকে উত্তরণের চেষ্টায়, সংগ্রামে সংঘর্ষে নতুন করে বাঁচবার, আদর্শকে টিকিয়ে রাখার আগ্রহে আকুল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে উঠে এসেছেন "জাগরী"র বাবা চরিত্রটি। এ চরিত্র বাস্তব চরিত্র। লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রভাবে বাবাকে এঁকেছেন। লেখকের নিজের পিতার জীবনের আদর্শ, রাশভারী স্বভাব হাজারিবাগ জেলে পূর্ব পরিচিত পুরুলিয়ার গান্ধীবাদী প্রধান শিক্ষকের জীবনধারা ও পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতার আত্মত্যাগ—এসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লেখককে অনুপ্রাণিত করেছে বাইরের দিক থেকে। কিন্তু লেখকের অনুসন্ধিৎসু জীবন জিজ্ঞাসার সূত্রে বাবা জীবন্ত হয়ে উঠেছেন।

বাবা আদর্শ গান্ধীবাদী, পরিচিত মাস্টার সাহেব। তিনি ১৯২১-এর অসহযোগের ডাকে সাড়া দিয়ে চাকরী ছেড়ে নিজের বাড়িকে করেছিলেন আশ্রম। তিনিও বিয়াল্লিশে গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' ডাকে সাড়া দিয়ে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ব্রত নিয়ে অহিংস আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বড়োছেলের বিলুর মতো আজ জেলে বন্দী, তবে তিনি অন্যান্য দলের রাজনৈতিক প্রথম সারির নেতার সঙ্গে স্থান পেয়েছেন 'আপারডিভিশন ওয়ার্ডে'। তিনিও এই রাতটি জেগে কাটাচ্ছেন বিলুর কথা ভেবে। এ দিনটি তাঁর উপবাস ও মৌনব্রত পালনের দিন। গান্ধীজীর আদর্শ—তাঁর মত ও পথ ; চরখা তাঁর সঙ্গী। গান্ধীজীর মতো তিনিও সোমবারটিকে 'আত্মশুদ্ধি'তে ব্যস্ত রাখেন। গান্ধীবাদ ও সেই আদর্শে গঠিত বাবা চরিত্রটি উপন্যাসে কোনো বিরোধী ভূমিকা হয়ে ওঠেন নি। বাবার রাজনীতির সঙ্গে বিলু-নীলুর রাজনৈতিক মতের বিরোধ উপন্যাসে কোথাও নেই। বরং তাঁর ব্যক্তি হৃদয়টি উপন্যাসের বিশেষ অংশে অনেক বেশি পরিমাণে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর মতো সংযত সংহত স্বভাবের মানুষটিও নিজেকে শেষ পর্যন্ত বিশেষ আবর্তে ধরে রাখতে পারেন নি—তা বাবা অংশ পড়লেই বোঝা যায়। নিস্তব্ধ রাতে ওয়ার্ডে ব্রত-আসনে উপবিষ্ট বাবা আত্মচিন্তায় রত। বিলুর ফাঁসির কথা ভেবে তিনি ক্রমেই বিচলিত হয়ে পড়ছেন। সেই সঙ্গে করে চলেছেন আত্মসমীক্ষা, আত্মবিশ্লেষণ, অন্যান্য সহযোগীদের চিন্তাধারা কাজকর্মের সমালোচনা ও অন্যদলের ভালোমন্দ দেখবার চেষ্টা।

এই ওয়ার্ডে তাঁর দলের বন্দীকর্মীরা ও অন্যান্য রাজনৈতিক মতাদর্শের বন্দীরাও আছেন। তিনিই রাজনীতি ও বয়সের দিক থেকে সবচেয়ে প্রবীণ। বিলুর দলের অল্পবয়সীরাও এখানে আছে। তাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল আজকের রাতে। কিন্তু বাবা নিজে একা সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আবিষ্কার করেন নি, অন্যান্যদের স্বগত ভাষণে, বিশেষত

মায়ের কথায় বাবার চরিত্রের দোষগুণটা আরও স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। আবার লক্ষণীয়, বাবা তাঁর ছেলেদের কথা যত ভেবেছেন, ব্যথিত হয়েছেন—বিলু নীলু কিন্তু সেইরকম বাবাকে নিয়ে তত ভাবে নি। তাদের ভাবনায় বারবার মূর্ত হয়ে উঠেছেন মা। কারণ মা তাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, প্রিয়। বাবা তাঁর আদর্শ, শাসনভঙ্গি নিয়ে অল্প বয়স থেকেই মধ্যবিত্ত অভিভাবকের দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। পরে গান্ধী আদর্শ ক্রমেই ছেলেদের সঙ্গে তাঁর ব্যবধানকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। স্বভাব নিস্পৃহতা, গান্ধীবাদের নিরাসক্ত অহিংস মনোভাব তাঁকে এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে তিনি পারিবারিক সম্পর্কে ছেলেদের কাছে টানতে পারেন নি। এ নিয়ে মা অসংখ্য অনুযোগ করলেও তিনি উদাসীন থেকেছেন। রাজনৈতিক নিষ্ঠা ও আদর্শবাদী সৌজন্য নিয়ে ছেলেদের ভিন্ন মতের আকর্ষণ সম্পর্কে তিনি কোনো মতপ্রকাশ, কৌতূহল বা প্রশ্ন করতে বরাবর কুণ্ঠিত থেকেছেন। নিজে আশ্রম জীবন যাপন করে স্বেচ্ছায় দুঃখকে বেছে নিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী ছেলেরাও তাঁরই অভিভাবকত্ব মেনে আশ্রমজীবন যাপন করেছে। এই হলো বাবা ও তার পরিবারের রাজনৈতিক পরিচয়। কিন্তু এ উপন্যাসে কারুরই রাজনৈতিক পরিচয় তাদের ব্যক্তিসত্তার অনুভবকে আড়াল করে রাখে নি ; লেখকেরও সে চেষ্টা একেবারে ছিল না। সতীনাথ নিজে রাজনৈতিক কর্মী হলেও রাজনীতিকে উপন্যাসের দলিল করতে চান নি ; উপন্যাসই করতে চেয়েছেন। বিয়াল্লিশের ইতিহাস নয়, বিয়াল্লিশের মন্থন থেকে জীবন যে উপলব্ধি নিয়ে জেগে উঠেছে তাকেই রূপ দিতে চেয়েছেন তিনি। আত্মবিচার, আত্মচারণায় সংবিত স্তরে প্রবাহ সৃষ্টি করে মানবসত্তার গভীর চেতনার স্তরটিকে সন্ধান করাই তাঁর লক্ষ্য। গান্ধীবাদী বাবার চিত্র তাই ''জাগরী''তে পূর্ণতা পায় নি, তিনি সার্থক হয়ে উঠেছেন 'ব্যক্তিমানুষ' রূপেই।

আসন্ন অনিবার্য মৃত্যুর চিন্তা তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছে, অথচ কোনো অবস্থাতেই বিচলিত বোধ করা তাঁর স্বভাব ও আদর্শের বিরোধী। গান্ধী ভাবাদর্শের পরিপন্থী কোনো কাজই তিনি সচেতন মনে মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু এই মুহূর্তে এ মনোভাব কাটিয়ে ওঠার কোনো চেষ্টাই তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। বরং মেহেরচন্দজী তাঁকে কিছু খাওয়াতে ব্যস্ত হলে তিনি তাড়াতাড়ি নিস্তার পেয়ে নিজের মুখোমুখি হতে চেয়েছেন মেহেরচন্দজীর কথায় রাজি হয়ে। তাঁর কেবলই মনে হয়েছে এই রাতটা বিলুর কাছে থাকলে তাঁর পিতৃহৃদয় শান্তি পেত। তিনি বিলুকে আসন্ন ঘটনা প্রশান্ত মনে মেনে নেবার জন্য কোনো উপদেশ দেননি, তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভবও নয়, শুধু জেল কর্তৃপক্ষের হাত দিয়ে 'গীতা' পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিলুর এ বই-এর কোনো প্রয়োজন আছে কিনা তিনি ভাবেন নি। কিন্তু তিনি নিজে চরম হতাশার মধ্যে আস্তিক্য দর্শনে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন, কর্মফলবাদকে পাথেয় করে আত্মসান্ত্বনা পেতে চেয়েছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সারারাত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এমন যুক্তি তিনি খাড়া করতে পারেন নি যা থেকে কোনো সান্ত্বনা বা স্বস্তি পেতে পারেন। তার বদলে তাঁর বারবার মনে হয়েছে, বিলুর এই পরিণতির জন্য তিনিই দায়ী। মায়ের কথনে এই অভিযোগই রয়েছে। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'এখন যদি বিলুর বাবাকে কাছে পাই তাহলে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিই, যে দ্যাখো বাপ হয়ে ছেলেদের

কি পথে এনেছ।' (পৃ. ১৬০)। ছেলেদের সঙ্গে বরাবরই তাঁর সম্পর্ক কিছুটা দূরত্বের। ছেলেদেরও আদর আবদার মায়ের কাছেই বেশি। মাও অনেক সময় বাবার কাছে ছেলেদের অনেক কথাই গোপন করার চেষ্টা করেছেন। ফলে ছেলেরাও তাঁর সাহচর্যে সঙ্কুচিত হয়। তিনি লক্ষ্য করেছেন তাঁর কাছে এলে কেমন জড়সড় ভাব ফুটে ওঠে বিলুর মধ্যে। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র উপায়ী চরিত্রের পরিবারে অভিভাবকত্বের যে আধিপত্য তা তিনিও স্ত্রী পুত্রদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। ছেলেদের ভবিষ্যৎ সুখ শান্তির কথা না ভেবে বাড়িকে করেছেন আশ্রম, পরিবারকে তিনি করে তুলেছেন আশ্রম জীবনে অভ্যস্ত। নীলুকে ততটা না পারলেও বিলু তাঁর চাপানো ইচ্ছে অনিচ্ছে মেনে নিয়েছে। কাশী বিদ্যাপীঠ থেকে শাস্ত্রী হয়ে সে ফিরেছে শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছেকে তৃপ্ত করতে। কিন্তু আজ আত্মসমীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর চোখে ধরা পড়েছে বিলু কিন্তু রিলিফের কাজের পারিশ্রমিক দিয়ে নীলুকে ইংরেজী কলেজে পড়িয়েছে। বিলুর এই নীরব প্রতিবাদের অর্থ সেদিন না বুঝলেও আজ বাবার বিচারের তীক্ষ্ণতায় ধরা পড়েছে। নিজের মধ্যে নিজে আত্মযন্ত্রণায় গুমরে উঠেছেন—'আমার ও উহাদের মধ্যে যে ব্যবধান তাহার জন্য দায়ী আমি। কোনদিন উহাদের সহিত প্রাণখোলা ভাবে মিশি নাই। কোলে পিঠে করিয়া আদর করি নাই। আমার ধারণা ছিল ছেলেদের সহিত বন্ধুভাব স্থাপন করিলে উহাদের শাসন করা শক্ত। উহাদের সহিত কম কথা বলো উহারা ভয় ও সমীহ করিয়া চলিবে, উহাদের নাই দাও মাথায় চড়িয়া বসিবে।' (পৃ. - ৭০)। আজ তাঁর ক্ষোভ 'কমরেড কোনদিন হইতে পারিলাম না।'

ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কম হলেও তাদের রাজনৈতিক মতবিভেদ নিয়ে তিনি কাউকে কোনো প্রশ্ন করেন নি। এটাও তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। একে একে বিলু নীলু আশ্রমের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে আর উপস্থিত হয় নি। মা এ ঘটনায় বিচলিত বোধ করেছেন বাবার কথা ভেবে। কিন্তু বাবাকে একবারও এ বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করতে দেখা যায় নি। নিজের দলের কর্মীদের গান্ধীজীর প্রতি অন্ধ আনুগত্য তাঁকে সমালোচনায় মুখর করেছে আবার বিলুর দলের ছেলেদের দলের কাজে নিষ্ঠা, পড়াশুনার ইচ্ছে, পার্টির প্রতি নিষ্ঠা তাকে প্রশংসায় উদার করেছে। তাঁর মতো একনিষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে দলের সংগঠনের ত্রুটি ও ভাঙ্গন সম্পর্কে আরও সুতীক্ষ্ণ বিচার বিশ্লেষণসুলভ মনোভাব ব্যক্ত হলে চরিত্রটির গতিপ্রকৃতির ঔদার্য্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু তার সুযোগ ''জাগরী''তে কম। বিলু কেন গান্ধীবাদ থেকে সমাজবাদে, নীলু কেন মার্কস্‌বাদে আকৃষ্ট হলো তার কোনো বিশ্লেষণ নেই। শুধু ধারণার কথা আছে। বাবার ধারণা তাঁদের আদর্শ অর্থাৎ গান্ধীজীর ভাবধারা এত সমুন্নত যে সেখান থেকে কেউ অন্যত্র যেতে পারে না। গান্ধীবাদী কার্যক্রমের ভিত্তি লোভহীন আদর্শ মানব মনের ওপর—'এই তো ১৯৩০-৩২ এ কত চরখা কাটা, কতরকমের কথা। এমনভাবে উহারা গড়িয়া উঠিয়াছিল যে আমি কোনোদিনই ভাবি নাই যে ঐ উচ্চ আদর্শ উহারা কোনদিন ছাড়িতে পারিবে।' (পৃ. ৭৫) তাঁর মতে রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের ঝোঁকে দেশের মধ্যে একটা মোহ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এটাই কি বিলুর রাজনৈতিক মত পরিবর্তনের কারণ? নিশ্চয় নয়। সতীনাথ গান্ধীবাদী। কিন্তু

স্বাধীনতা আন্দোলনে এই আদর্শের অন্ধ কর্মপদ্ধতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বিতাড়িত করবার উপযুক্ত পথ নয়, তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বিয়াল্লিশের আন্দোলনে কংগ্রেস কর্মী ছিলেন, কিন্তু সমর্থন ছিল সহিংস আন্দোলনে। ফণীশ্বর নাথ রেণুর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় তিনি ছিলেন গান্ধীবাদী ডেটিন্যু, কিন্তু এক্স চিহ্নিত অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। আবার অনেকে তাঁকে মনে করেছেন 'রায়-ইস্ট' অর্থাৎ এম. এন. রায় পন্থী।[৫] কিন্তু লেখক কোনো অর্থেই প্রচলিত রাজনীতিতে তৃপ্ত ছিলেন না। জেলে বসেই বিপ্লবী সোস্যালিস্টদের চিন্তাধারার সঙ্গতি ও অসঙ্গতি, ব্যবধান উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। সেই সব চিন্তা ও অভিজ্ঞতা থেকেই তৈরী হয়েছে "জাগরী"র প্রতিটি চরিত্র। বাবার মতো স্থিতধী ব্যক্তিকেও বলতে শোনা যায় 'বিলু যখন প্রথম কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান করে, তখনও যদি উহাকে বোঝাইবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে আজ এইরূপ ঘটিত না। আর বিলুকে শাসন করিতে পারিলে নীলুও হাত হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারিত না।' 'শাসন', 'এইরূপ ঘটিত না', 'হাত হইতে বাহির হইয়া যাইত না'—কথাগুলি বিচার সাপেক্ষ। বাবার মতো প্রবীণ সংসারী ও রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসীর পক্ষে অজ্ঞাত নেই যে বিলু নীলুর স্বাধীন রাজনৈতিক মত গড়ে ওঠার উৎস ও প্রশ্রয় কোথায়। এই উন্মাদনা, আবেগ যে ঠেকানো অসম্ভব তাও তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানেন। শাসন দিয়ে যতদিন ধরে রাখা যায় ততদিন বিলু-নীলু আশ্রমে সন্ধ্যায় ভজন করেছে, গার্হস্থ্যাশ্রমের নিয়ম মেনেছে, 'শাস্ত্রী' উপাধি পেয়েছে। কিন্তু শাসন দিয়ে যে দেশপ্রেমের তীব্র আবেগ প্রতিহত করা যায় না, এ পথ থেকে জোর করে সরিয়ে আনা অসম্ভব—বাবার মতো উদার রাজনীতিসচেতন মানুষ, যিনি প্রতিক্ষণেই নিজেকে সংশোধন করতে প্রস্তুত তাঁর পক্ষে তা অজ্ঞাত থাকার কথা নয়, অথচ তিনি কি করে এ কথা বললেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আসলে বিলুর মৃত্যু সম্ভাবনায় তিনি যে কত চঞ্চল, অস্থির হয়েছেন তার প্রকাশ ঐ 'শাসন' শব্দের অসংলগ্ন ব্যবহারে ব্যক্ত হয়েছে। ঐ শব্দটাকে আশ্রয় করে তিনি শক্তভূমিতে পা রাখতে চাইছেন। কিন্তু ঐ শব্দই তাঁর মনের অসহায় দীন অবস্থাকে কিছুতে ঢেকে রাখতে পারে নি।

পারিবারিক জীবনে ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কম হলেও তাঁর কাছে অজ্ঞাত নেই বিলু দুবেলা ভাত খেতে ভালোবাসে ; নীলু কি বলতে কি বলে বা তার 'দাদা যা করবে তাই করা চাই।' বিলুর মাথা ভরা কোঁকড়া চুল, চোখের গভীর দৃষ্টি, সেই চোখে বজ্রের বহ্নিশিখা, বাড়ির বেড়ার ওপর থেকে বিলু নীলুর মেমেদের উৎসব দেখা ও তার জন্য বকুনি খেয়ে অভিমানে সারা রাত ঠাণ্ডায় বিলুর বাইরে বসে থাকা ; বিলুর রাত জেগে বই পড়ার অভ্যাস—ইত্যাদি স্নেহরসসিক্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটি ঘটনার স্মৃতি বাবার স্নেহে আকুল হৃদয়টির পরিচয় দেয়। তিনি বারবার অনুশোচনায় পীড়িত হয়েছেন এই ভেবে—'যাহার উপর পিতার কর্তব্য করি নাই, সেই পুত্রের কৃতকর্মের গৌরবের অংশ' কি করে নেবেন, তিনি নিজে এ পথে না এলে বিলুর এ পরিণতি ঘটতো না। পরক্ষণেই বাবা নিজেকে প্রবোধ দেন—'বিলু মূর্খ নয়, তাহার ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা আছে। বড় হইয়া সে নিজের পথ নিজেই বাছিয়া লইয়াছে। এ ছাড়া অন্য কী-ই বা করিত,।' (পৃ. ৭৬)। কিন্তু

একথায় সান্ত্বনা কি পেলেন? সন্তানের প্রতি যথোপযুক্ত কর্তব্যপালন করতে পারেন নি এ ক্ষোভ বাবাকে একটা জায়গায় টেনে নিয়ে এসেছে। তাঁকে বলতে শোনা যায়—'আমার কথা কি উহার মনে পড়িবে' বা 'আমার সম্বন্ধে বিলু শেষ মুহূর্তে কি ভাবিয়া গেল, তাহা যদি জানিতে পারিতাম?' (১১ পৃ.)। আসলে তিনি কর্তব্যচ্যুতির সংশয়ে পীড়িত এবং রাজনৈতিক পথকে জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে পরিবারের সকলকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন—এই অনুতাপের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। তাঁর বিশ্বাস বিলু মারা যাবার আগে নীলুকে ক্ষমা করে যাবে। কিন্তু তাঁর সংশয় বিলু তার বাবাকে ভুল বুঝে চলে যাবে। বিলু জানতে পারল না এবার জেলে তার বাবা তারই জন্য রাজসুখ—দুধ, ফল-মিষ্টি, মশারি ত্যাগ করেছেন, তারই কথা ভেবে রাতটা উৎকণ্ঠায় কাটাচ্ছেন আর প্রার্থনা করছেন— 'ভগবান বিলুকে শেষ মুহূর্তে অন্য কথা মনে করিয়ে দিও, অন্য কথা ভাবিবার ক্ষমতা দিও।' বা নীলুর পাশে বসে রাত কাটাতে চাইছেন, কারণ সে কি করতে কি করে বসে। বাবার আত্মচারণার শেষাংশে দেখা যায় তাঁর মতো স্থির সহিষ্ণু মানুষও কেঁদে উঠেছেন, বিচলিত হয়ে বলেছেন—'অনেক জানোয়ার নিজের সন্তান খাইয়া ফেলে। আমি কি তাহাদের দলে?' (১১৩ পৃ. )। বা ' নেপালে শুনিয়াছি একজনের বদলে আর একজন রাজদণ্ড ভোগ করিতে পারে। ..... এখানে যদি এমন একটি নিয়ম থাকিত, যাহাতে বিলুর বদলে আমি গেলেও তো.....।' এমন অসম্পূর্ণ কত চিন্তা তাঁকে বিক্ষিপ্ত করেছে। বিলু শেষ সময় কি করছে—'হয়তো পাগলের মতো হইয়া গিয়াছে। উস্কো খুস্কো চুলগুলি হয়তো দুই হাতে ছিঁড়িতেছে, হয়তো গরাদের উপর মাথা ঠুকিতেছে'—এসব ভাবনা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করেছে। আসলে তিনি নিজেই মনে মনে কি প্রচণ্ড অস্থিরতা অনুভব করে নিজের মনের কাছে মাথা ঠুকছেন, এই দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য পথ হাঁতড়ে ফিরছেন। পাশে বসে সুরজবল্লীবাবু গীতার পরিচিত লাইনগুলি পড়ছেন, কিন্তু বাবার মনে সেই তত্ত্বকথা স্পর্শ করছে না। দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রার্থনা-সঙ্গীত, ভজনগান মোটরের হর্ণের শব্দ, ভারি বুটের আওয়াজ আড়াল করতে পারছে না। বাবা দেখছেন তাঁর বড়ো ছেলে 'ফাঁসির মঞ্চের সিঁড়ির ওপর উঠছে।' তিনি তাঁর শেষ আশ্রয় মহাত্মাজীকে আরো নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন ছেলের জীবনের শেষ মুহূর্তটিকে ভোলবার জন্য। প্রার্থনা করছেন—বিলুর আত্মা শান্তি পাক। বিলুর মা সহ্য করবার শক্তি যেন পায় ; মহাত্মাজী নীলুকে যেন বল দেন। আর তাঁর নিজের জন্য? আত্মবিচার, আত্মসমর্থন ও আত্মজিজ্ঞাসার তীব্রতায় তিনি নিজের কাছে নিজে হয়ে উঠেছেন অসহায় ব্যর্থ। বাবা তাঁর ব্যক্তিজীবনকে ও রাজনৈতিক জীবনকে কিছুতেই মেলাতে পারেন নি ; মধ্যবিত্তের সঙ্কট ও সঙ্কটমুক্তির অক্ষমতার দ্বন্দ্ব তাঁর রাজনীতিক, পারিবারিক অপেক্ষা অনেক বেশি মননশীল 'ব্যক্তিক' রূপকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

''জাগরী'' উপন্যাসে একমাত্র মা নিজে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো রাজনীতির পথ বেছে নেন নি। তবু তিনি 'রাষ্ট্রীয় পরিবারের' একজন। বাবার গান্ধীবাদী আদর্শের অনুগামিনী হয়ে বিয়াল্লিশের আন্দোলনে তাঁরও স্থান হয়েছে জেলের সেলে 'আওরৎ

কিতায়'। তিনিও রাজনৈতিক বন্দী। এইটুকুই মায়ের রাজনৈতিক পরিচয়। উপন্যাসে কিন্তু তাঁর বড়ো পরিচয় রয়েছে বিলু-নীলুর মা—এই নামে। অনেক সমালোচকের মতে মা চরিত্রটিই উপন্যাসের 'শ্রেষ্ঠ চরিত্র', 'বাস্তব চরিত্র', 'সজীব চরিত্র,'।[১০]

বিলুর মৃত্যুর আগের রাতে মাও বাবার মতোই আওরৎকিতায় অস্থির আকুলতায় জেগে আছেন। তিনিও ক্ষুব্ধ, বিচলিত, চঞ্চল। আর এই মানসিকতাই তাঁকে আত্মজিজ্ঞসায় আকুল করে ফিরেছে। মায়ের চিরন্তন মর্মস্পর্শী ভাব, বিশেযত বাঙালী মায়ের স্নেহ ব্যাকুলতা জড়িয়ে থাকে 'মা' শব্দটির মধ্যে। এই মা সকল দেশ-কাল, সামাজিক রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে। তাঁর কোনো বিশেষ রাজনীতি, দর্শন, আন্দোলন, বিক্ষোভ, মতবাদ বা মতবাদ প্রচারের আকাঙক্ষা নেই। তাঁর শুধু একটিই অভিব্যক্তি—তিনি সন্তানের জননী। তাঁকে ঘিরে একটি কথাই বারবার ঘুরে ফিরে আসে— সে হলো স্নেহবুভুক্ষা। এই আকুলতার মর্মবিদারি আর্তি পূর্ণিয়া জেলের 'আওরৎকিতায়' সেই জেগে থাকা রাতে কি ভাবে জেলের বাতাসকে ভারি করেচে, তা "জাগরীর" মা অংশটি পড়লেই বোঝা যায়। অমন গুমরে গুমরে ফেরা, নিজের নিদারুণ অসহায়তার বাস্তব করুণ রূপ আর কোথাও এমন ভাবে চিত্রিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

বাংলা সাহিত্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের হাতে মায়ের বিচিত্র রূপের প্রকাশ দেখেছি একাধিকবার। "চোখের বালি"র মায়ের ঈর্ষাকাতর রূপের চেয়ে " গোরা" উপন্যাসে আনন্দময়ীর জ্যোতির্ময়ী ধরিত্রীতুল্য হৃদয় আমাদের অনুভূতিকে প্রগাঢ় করে রেখেছে। তারাশঙ্করের "ধাত্রীদেবতা"য় শিবনাথকে মা চিনিয়েছিলেন দেশের যথার্থ স্বরূপ। গোরা বা শিবনাথ মায়ের মহৎ আদর্শের কাছে নিজেদের নিবেদন করে ধন্য হয়েছে। কিন্তু "জাগরী" উপন্যাসে 'মা' চরিত্রটি একান্তভাবেই মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মা। তিনি সন্তানের জীবনের পথ প্রদর্শক হতে না পারলেও জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতির তন্ত্রীতে যে মূর্ছনা তোলেন তাতে অভিভূত হতে হয়। বিলু-নীলুর মা সাধারণ স্নেহবৎসল ভুলভ্রান্তিতে ঘেরা সরল হৃদয়া মধ্যবিত্ত মানসিকতার মায়ের ছবি। সতীনাথ নিজে ছিলেন মাতৃভক্ত সন্তান। পিতা ইন্দুভূষণ রাশভারী স্বভাবের বলেই একটু দূরের মানুষ কিন্তু মা রাজবালা দেবী পরম মমতাময়ী। সতীনাথ তাঁর নায়ক বিলুর মতোই বাবার চেয়ে মায়ের কাছেই বেশি জোর খাটাতেন। তাঁর লেখায় পারিবারিক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু মায়ের চরিত্র। মাকে ঘিরে সন্তানসন্ততির স্নেহ নিবিড় টান ভালোবাসার যে অটুট বন্ধনের ছবি পাওয়া যায় তা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন নিজের জীবন থেকে। তিনি প্রতিটি উপন্যাস-গল্পে যে স্নেহময়ী মমতাময়ী সহিষ্ণু মাতৃমূর্তি এঁকেছেন তার অনেকটাই পেয়েছিলেন নিজের মা রাজবালা দেবীর মধ্যে, যিনি পূর্ণিয়া, প্রবাসিনী হয়েও মনেপ্রাণে বাঙালী মা। 'জাগরী'-র মা, অচিনরাগিনীর নতুন দিদিমা, দিগ্‌ভ্রান্তের অতসীবালা এমন কি সত্যি ভ্রমণকাহিনীর বিদেশিনী প্রেমিকা অ্যানির মধ্যেও সতীনাথ শেষপর্যন্ত এক কোমলহৃদয়া, অশ্রুব্যাকুল উৎকণ্ঠিতা সন্তানবতী মা-এর মহীয়সী রূপ এঁকেছেন। 'জাগরী'র মা-চরিত্র-এই কারণেই এত আন্তরিক, এত মর্মস্পশী, অনন্য মাতৃচরিত্র বলে মনে হয়।

লেখক এক অসামান্য শিল্পসুষমায় তাঁকে জীবন্ত করে রেখেছেন। সন্তানের জন্য হৃদয়

নিঙড়ানো ভালোবাসা ও সেই ভালোবাসা দিয়েও কিছু করতে না পারার অসহায়তায়, রাগে দুঃখের অভিব্যক্তিতে মা বাস্তব চরিত্র হয়ে উঠেছেন। জেলে বসেই তিনি শুনেছেন তাঁর বড়ো ছেলের ফাঁসির কথা। আলাদা করে কেউ তাঁকে একথা বলে নি, কিন্তু সকলের মতো তিনিও জেনেছেন কাল সকালে বিলু তাদের ছেড়ে চলে যাবে। তাই আজকের দিনটা তাঁর কাছে বড়ো ভয়ঙ্কর—অনিশ্চয়তা আর সংশয়ে ভরা। অন্যান্যদের মতো দিনের শেষ থেকে শুরু হয়েছে তাঁর আত্মচারণার অংশ। হয়তো অনেক আগে থেকেই মা নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজেছেন। কিন্তু দিনের শেষ যেমন আর একদিনের সূচনা জানিয়ে দেয় তেমনি এই সন্ধ্যে তাঁকে অনিবার্য সঙ্কটের মাঝখানে টেনে নামিয়েছে। অশান্ত হৃদয়, উপবাসে তাঁর শরীর দুর্বল। বাবার মতো মাও অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য চরখা হাতে নিতে চাইছেন ; কিন্তু তাতে তাঁর ক্ষোভ আরো বাড়ছে। কারণ, তিনি স্বেচ্ছায় এই চরখা, সূত্রযজ্ঞ, অহিংস পথ কিছুই গ্রহণ করেন নি। কে চায় স্থির নিশ্চিন্ত সংসার, সন্তানের সুখ বিসর্জন দিয়ে দারিদ্র্য আর দুঃখকে সঙ্গী করতে! গান্ধীবাদী স্বামীর জন্যই তাঁর আজ এই দুঃখ। এ সবই তিনি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে বাবা-ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর আজ সম্পর্ক নেই। ধনী সরকারি উচ্চপদস্থ দাদা, যার কাছ থেকে কত ছেলেরা পড়ে মানুষ হয়ে যাচ্ছে, সেই দাদা ক্ষতির ভয়ে সম্পর্ক রাখে না। তিনিও ছেলেদের পাঠাতে পারেন না—এ ক্ষোভ তাঁর কম নয়। এত কষ্ট স্বীকার করে নিয়ে কর্তব্যনিষ্ঠায়, সেবায়, ছেলেদের প্রতি ভালোবাসায় তিনি একই সঙ্গে নিজের সন্তানদের মা ও আশ্রমের সকলের মা হয়ে দিন কাটিয়েছেন। এ সব শুধু বিলু নীলুর মুখ চেয়ে। প্রতিবেশিনীদের উপেক্ষা, উপদেশ মেনে নিয়েও কখনো স্বামীকে তাঁর আদর্শ, রাজনীতি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করেন নি ; সেও বিলু নীলুর কথা ভেবেই।

সেই মা আজ সন্তানের মৃত্যু সম্ভাবনায় রুদ্ধবাক। কিন্তু মনে মনে প্রবল বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। এই বিদ্রোহ মধ্যবিত্ত রমণীর। তারা সংসারের সব কিছুর সঙ্গে আপোস করে নিতে চায় ; আর তাই নিয়েই তাদের দিন কাটে। কিন্তু চরম সঙ্কটের সময় তারা বুঝতে পারে যে তারা যা করে এসেছে আর যা করতে চেয়েছে—এই দুটোতেই কোনো মিল নেই ; কোনো দিনই মিল হয় না। মাও বুঝেছেন— যে জীবন তিনি মেনে নিয়েছেন, স্বামীর যে আদর্শকে তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর প্রত্যাশিত ছিল না। আর এই পথই তাঁকে নিয়ে গেছে চরম ব্যর্থতা, শূন্যতার মধ্যে। আর সব ব্যর্থতার মূল কারণ একজন—তাঁর স্বামী ; হয়তো তাও নয়, তার চেয়েও অন্য কোনো শক্তি— সে তাঁর ভাগ্য। সকল ক্ষোভ সকল বিদ্রোহ সেই দুর্ভাগ্যের প্রতি। অজস্র সংস্কারে আচ্ছন্ন দুর্বল নারীস্বভাব মায়ের। পতিব্রত্যের সংস্কার, গার্হস্থ্য ধর্মীয় সংস্কার সব কিছুই তাঁকে ঘিরে রেখেছে। আত্মচারণার সূত্র ধরে সেই সংস্কারগুলি মায়ের অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়েছে। স্বভাব ভীরু সংস্কারবতী মায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই অংশে অন্য চরিত্রগুলি রাজনীতির মোড়ক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। মায়ের দৃষ্টিতে অন্য চরিত্রগুলির মানবিক দোষত্রুটি স্পষ্ট হয়েছে। সব চেয়ে বেশী পূর্ণতা পেয়েছেন মা। মা যদি অমন করে না বলতেন—'তুমি দেশের স্বাধীনতার জন্য সব ছেড়েছ সত্য, কিন্তু আমাকে তো একটুও স্বাধীনতা দাও

নি, কত দিন ভেবেছি যে ছেলেরা বড়ো হলে একথা একদিন ছেলেদের বলব'—তাহলে বাবা চরিত্রকে কি পুরোপুরি দেখা হোত? মায়ের এই মানসিক সঙ্কট ; অভিমান পাঠককে তার চেনা জানা জগতটাকে আর সেই জগতের বাসিন্দাদের আর একবার ঘনিষ্ঠভাবে চিনিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয় সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে বাবার সম্ভ্রমসূচকদূরত্বের আসনটিকে, আর ছেলেদের বড়ো হবার প্রতীক্ষায় মায়ের বসে থাকার চিরন্তন দৃশ্যটি। মায়ের ছেলেকে ঘিরে দুঃখমুক্তির কল্পনাটিও সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। স্বামী যে মুক্তি দিতে পারেন নি, ছেলেরা বড়ো হয়ে সেই দুঃখের মুক্তি ঘটিয়ে মাকে দেবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। এই আশাতেই মা মনে মনে স্বপ্নের জাল বুনেছিলেন। বিলুর ফাঁসির আদেশ, নীলুর সাক্ষ্যদান সব ছিঁড়ে তছনছ করে দিল। আর একটা কথা, মা এ উপন্যাসে অন্য তিনটি চরিত্রের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনেও সাহায্য করেছেন। পরস্পর বিচ্ছিন্ন তিনটি রাজনৈতিক চরিত্র মায়ের সাহায্যেই একটা আত্মিক সূত্র খুঁজে পেয়েছে। তাঁরই মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতন্ত্রীগুলি থেকে বেরিয়ে এসেছে পরস্পরের প্রতি অভিমান-অনুরাগ নির্ভরতা।

মাও এই রাতটাতে বাবার মতোই অসহায়। তিনিও কিছুতেই ছেলেকে কাছে পাচ্ছেন না। জেলের গরাদ, ওয়ার্ডের দূরত্ব যে ব্যবধান রচনা করেছে সে তো শুধু বাইরের। মনের মধ্যেকার ব্যবধানকে যে মা আজ এই সঙ্কটে চিনতে পেরেছেন ; তাকে সরিয়ে পরস্পর পরস্পরের কাছে এক জায়গায় আসবেন কি করে? এই অসহায়তাই ফুটে উঠেছে প্রত্যেকের আচরণে, স্মৃতিচারণায় ও আত্মআবিষ্কারে। যে সময় এই সব আপনজনের স্পর্শ সুখ সৃষ্টি করতে পারতো তা যে কখন সকলের অগোচরে নষ্ট হয়ে গেছে তা কেউই জানতে পারে নি। আজ যখন জেনেছে তখন তা দূর করে এগিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। এই নিদারুণ অসহায়তায় প্রত্যেকের মতো মাও জর্জরিত হয়েছেন। হয়তো সকলের চেয়ে বেশিই। কারণ তিনিই চেয়েছেন সকলকে এক পক্ষপুটে আঁকড়ে রাখতে। তিনি হারিয়েছেন তাঁর বিশ্বাসকে—স্বামীর প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব, গান্ধীজীর প্রতি ভক্তি, যা তাঁর চরম বিশ্বাসস্থল ছিল তাকেই তিনি নষ্ট করে ফেলেছেন। মায়ের অসংখ্য আত্মসমীক্ষায় পাঠকের বুঝতে কষ্ট হয় না—মূল্যবোধের বিনষ্টির যন্ত্রণা কি দারুণ দুর্বিষহ— 'গান্ধীজী তুমি আমার এ কি করলে, তুমি আমাকে একেবারে পথের ভিখিরি করে ছেড়েছ ; সত্যিকারের ভিখিরি। নিজের ঠাকুর দেবতা ছেড়ে তোমার পূজো করেছি ; তোমার জন্যে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সব ছেড়েছি। তার প্রতিদান তুমি খুব দিলে।' (পৃ. ১৬২)। গান্ধী আদর্শে ক্ষোভ প্রকাশ করে মা বলেছেন—' তোমার দেখানো রাস্তায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হয় না, বাপ ছেলেতে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে না, ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, গৃহবিচ্ছেদে সংসার ছারখার হয়ে যায়।' (পৃ. ১৬২)। বাবা, বিলু, নীলু গান্ধীবাদের ভালোমন্দকে দেখেছে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। বাবা দেখেছেন গান্ধীবাদী হয়েও রামশরণজী হরিহরজীরা জাতের ওপর গুরুত্ব দিয়ে নেতৃত্বের লোভে আকুল হয়। বিলু নীলু এই আদর্শের মধ্যে দেখেছে ধনী-কৃষকের সুবিধাবাদী স্বার্থান্ধ মনোভাব। এ সব রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিক সংকীর্ণতার ফল ; দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে অধিকাংশ দলগুলিই এভাবে খণ্ড সীমাবদ্ধ। কিন্তু মা এই রাজনৈতিক আদর্শকে, গান্ধীবাদকে

দেখেছেন একেবারে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতে। এই মতবাদের সীমাবদ্ধতা ভারতবর্ষের পরিবারগুলিকে কি ভয়ংকর সর্বনাশের পথে নিয়ে যেতে পারে তারই সত্য চেহারা মায়ের চোখে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। কি অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি মায়ের! মা শঙ্কিত হচ্ছেন লাডলির মা ছেলেকে তার কাছে দেবে না কারণ তিনি নিজের ছেলেকে যে খোয়াতে বসেছেন। শঙ্কিত মায়ের অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর তাঁর মনের যথার্থ পরিচায়ক— 'আবার মা বলে ডাকতে আসে! কেউ মা বলে ডাকলে তখন এমন মনটা গলে যায়, যে দুটো হক্ কথা শুনিয়ে যে গায়ের ঝাল মেটাবো তার পর্যন্ত উপায় থাকে না। আমি রাজ্যসুদ্ধ লোকের মা ; জেলার সব কংগ্রেস কর্মীর মা ; আমার তো বিশ্বজোড়া ছেলে। কিন্তু মন যে বিলু নীলুর উপর পড়ে থাকে। এদের ছাড়া অন্য কোনো ছেলের মা হতে আমি চাইনি।' (পৃ. ১৬৮)। পরক্ষণেই জেলের কয়েদি বখ্তরিয়াজীর ছোটোছেলে লাডলীর কান্না থামাবার জন্য এমন সঙ্কট সময়েও মা হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

এমন অজস্র স্ব-বিরোধী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা, এলোমেলো চিন্তার স্রোত, অসংলগ্ন স্বগত কথনের ঢেউ উছলে উঠেছে মায়ের আত্মচারণ অংশে। মেয়েলি স্বভাব নিয়েই মা ভেবেছেন সরস্বতীর সঙ্গে বিলুর বিয়ে দিলে এমন হয়তো হোত না। এমন অসম্ভব কল্পনা করতে গিয়ে মা কিন্তু নিজের সংস্কারে আচ্ছন্ন থেকেছেন, আবার সরস্বতীর জন্যও অনুকম্পা বোধ করেছেন। আবার নারীর বঞ্চিত হৃদয় নিয়ে অন্য নারীর সুখ স্বপ্নের কথা ভেবে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা প্রকাশও করেছেন — বিলুর সঙ্গে সরস্বতীর বিয়ে দিতে তিনিই অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর যুক্তি — 'সারা জীবন রসুন আর গোলমরিচ খেয়ে কি আর বাঙ্গালী ছেলে বাঁচতে পারে? সরস্বতীর হাতে খেয়ে কিন্তু বিলুর একদিনও পেট ভরতো না,'—এমন কত বিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোত প্রবাসী বাঙালী মায়ের দেশীয় সমাজের সঙ্গে দূরত্বের মানসিকতাকে ব্যক্ত করেছে। আবার পরমুহূর্তেই অনুকম্পায় ভরে উঠেছে মায়ের বুক এই ভেবে যে সরস্বতীর সঙ্গে বিলুর বিয়ে হয় নি ভালোই হয়েছে—সরস্বতীর কপাল এমনিও পুড়েছে, আর বিয়ে হলেও হয়তো পুড়তো।' 'সরস্বতীও বিলুকে নীরবে ভালবেসে আজ অসহযোগের আন্দোলনে অংশ নিয়ে মায়ের সঙ্গে একই জেলে বাস করছে। মা সরস্বতীকে বিলু নীলুর মতোই ভালবাসেন তাই তার দুঃখ সম্ভাবনায় মা আকুল।

চমাইন জমাদারনীর মুখে মা চরম সত্য ভাষণটি শুনে ক্ষেপে উঠেছেন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না 'নীলু দেবে বিলুর বিরুদ্ধে সাক্ষী।' মা, বাবা সকলের চোখেই নীলু গোঁয়ার জেদী, কিন্তু মা আরো বোঝেন নীলু অবুঝ, খামখেয়ালী হলেও সে 'দাদা অন্তপ্রাণ'। সে এ কাজ করতেই পারে না। স্বামীর সঙ্গে দেখা হলেও এর সত্যতা মা যাচাই করতে পারেন নি। তাঁর নিজের বিশ্বাসের ভূমি থেকে তাঁকে আছড়ে পড়তে হবে এই ভেবে তিনি নীরব থেকেছেন। বিলুর মতো মাও বিলু নীলুর শৈশবের অসংখ্য সুখস্মৃতি স্মরণ করে নিজের মনের সংশয় ও জিজ্ঞাসাকে আড়াল রেখে মানসিক মুক্তি পেতে চেয়েছেন। আন্তরিকভাবে চেয়েছেন বলেই নিজের মনে মনেই আগামীদিনের প্রস্তুতির ছকটা তৈরী করে শেষ খড়কুটো অবলম্বন করে বাঁচার কল্পনা করেছেন—'এবার জেল থেকে বেরোতে দাও—আর আমি নীলুকে এই রাস্তায় থাকতে দি। ছোটোভাইয়ের কাছে লাথি

ঝাঁটা খেতে হয় সেও স্বীকার তবু নীলুকে সেইখানে পাঠিয়ে দেবো।'

এত কিছু সম্ভব-অসম্ভব ভেবেও মা কোনো মীমাংসা করতে পারেন নি ; সম্ভবও নয়। বাবার মতো মাও শেষাংশে কি ভয়ঙ্কর দুর্বল হয়ে পড়েছেন তা তাঁর মনের বিচিত্রগতি ও বিচিত্র বিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোত খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়। মায়ের মধ্যবিত্ত সংস্কার শেষে বাবার মতো মাকেও আচ্ছন্ন করেছে। তিনি দোষ দিয়েছেন নিজেকে। তাঁরই ভুলের জন্যই বিলুর আজ এই সর্বনাশ—'মা পূর্ণেশ্বরী, আমার সব দোষত্রুটি ক্ষমা করো। তোমারই দয়াতে তো বিলুকে কোলে পেয়েছিলাম। ..... বাড়িশুদ্ধ সবাই তোমার মন্দিরের মহা প্রসাদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বলেই কি তুমি আমার উপর বিরূপ। বিলুর অসুখের সময় যে মানত করেছিলাম, সে পূজো পূর্ণেশ্বরীর ওখানে দিয়েছিলাম তো? ..... বরহমথানে বিলু হওয়ার সময় যে ইঁটটা বেঁধেছিলাম, তা খোলা হয়েছিল তো? কিম্বা হয়তো সরস্বতীর সঙ্গে বিলুর বিয়ে দিইনি বলে তিনি (ডিহ্ওয়ারঠাকুর) আমার এই দশা করেছেন।' (পৃ. ১৬৪)। মা মেয়েলি সংস্কার নিয়ে ভগবানের কাছে ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ছেলের জীবন ফিরে পেতে চেয়েছেন। এমনিভাবে সাধারণ নারীর বিশ্বাস অবিশ্বাস সংস্কারের অকপট স্বীকারোক্তিতে গড়ে উঠেছে মায়ের চরিত্র।

অনেক সমালোচক মনে করেছেন মায়ের ক্ষোভ ও আত্মঅভিমানের যে প্রকাশ ঘটেছে তা স্বাভাবিক নয়, বরং আতিশয্যমূলক। ছেলের আসন্ন অনিবার্য ফাঁসির সময় মায়ের এ ধরনের আচরণ স্বাভাবিক নয় বলে তাঁদের অভিযোগ। কিন্তু আমরা নানাভাবে দেখতে পেয়েছি মাও সঙ্কট মুহূর্তে অন্য সবার মতো নিজেকে জানতে চেয়েছেন। প্রত্যেকেই যেমন নিজের ভেতরের গোপন আমি কে জেনেছে — মাও তা জেনেছেন। বাইরের আচরণের সঙ্গে চেতনস্তরের গভীর লোকের অসঙ্গতি থেকেই আপনস্বরূপে বেরিয়ে এসেছে "জাগরী"র প্রতিটি চরিত্র। সকল অহংসর্বস্বতা, বাইরের শিষ্টাচার ও সৌজন্যের আচ্ছাদন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে প্রত্যেকের ভেতরের সত্যকারের মানুষ। সতীনাথ এই 'সত্যি মানুষ'কে খুঁজেছেন তাঁর মননশীল রচনাভঙ্গির সাহায্যে। মা এই সত্যলোকেই সহজ স্বাভাবিক রূপ নিয়ে পাঠককে আকৃষ্ট করে।

চার অধ্যায়ে কথিত "জাগরী" উপন্যাসের শেষ কথক চরিত্র নীলু। রাষ্ট্রীয় পরিবারের ছোট ছেলে নীলুও এসেছে রাজনীতিতে। রাজনীতি তাকে বদলে দিয়েছে। রাজনীতির পরিমণ্ডলে এসে সে তার পরিবারে অচ্ছেদ্য আত্মিক বন্ধন ছিন্ন করে কত দূরে সরে এসেছে তাকেই উপলব্ধি করেছে "জাগরীর" পাঠক। এই পরিবারের আর তিনজনের মতো সে জেলের মধ্যে নেই, কিন্তু জেলের বাইরে রাত কাটাচ্ছে একলা। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে সে গান্ধীবাদী বাবার মতো 'ভারত ছাড়ো' ডাকে সাড়া দিয়ে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ব্রতপালনে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি বা সোস্যালিস্ট দাদা বিলুর মতো নাশকতার কাজেও মেতে ওঠে নি। সেই সময় সম্পূর্ণ ভিন্নপথ ছিল নীলুদের, অর্থাৎ নীলুর ও তার দলের। সতীনাথ নীলুকে সরাসরি 'কম্যুনিস্ট' না বললেও নীলু যে সে সময় বামপন্থী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল তা নীলুর স্বীকারোক্তিতেই ধরা পড়ে। আর বিয়াল্লিশে সারা ভারতব্যাপী

উত্তাল আন্দোলনে একমাত্র এই দলটিই সক্রিয় হয়ে ওঠে নি একটা বিশেষ কারণে। তাদের বিচারে এই ধ্বংসাত্মক আন্দোলন—ফ্যাসিস্ট আন্দোলন ছাড়া কিছুই নয় বলে মনে হয়েছিল। স্তালিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এ দেশের একমাত্র বামপন্থী বিশেষ দলটিই সেদিন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে সমর্থন করেছিল। তা ভারতের স্বাধীনতাকামী অন্যান্য দলের কাছে বিসদৃশ ঠেকেছিল, কারণ তারা কিছুতেই শাসক শক্তিতে মিত্রশক্তি বলে মেনে নিতে পারেনি। নীলু এই বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে গভীর নিষ্ঠা ও কর্তব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে দাদার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়েছে, দিদিকে ধরিয়ে দিয়েছে। কাহিনীর জটিলতা সৃষ্টির দিক থেকেও নীলু অংশটি পাঠককে বেশী আকর্ষণ করে। বলাবাহুল্য এই অংশটি রচনা করাও সবচেয়ে কঠিন। ''জাগরী'' গ্রন্থাকারে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে নীলু অংশের একদেশদর্শিতার জন্য লেখককে সমালোচনাও করা হয়েছিল।[১১] লেখকের 'মার্কসবাদ'-এর ধারণার সীমাবদ্ধতাও সমালোচককে আহত করেছিল। এইসব নানা কারণে ''জাগরী''র নীলু অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ চরিত্রটি সৃষ্ঠি করতে গিয়ে লেখককেও একটু সজাগ থাকতে হয়েছে এবং অসাধারণ সৃজন সার্থকতায় লেখক এই রাজনৈতিক গোঁড়া মতাবলম্বী চরিত্রটিকে মানবিক দ্বন্দ্বের জটিলতায় পরিপূর্ণ মননশীল চরিত্র করে তুলেছেন। পাঠক আগের তিনজনের আত্মকথনে নীলুর সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছে। বাবা, মা ও স্বয়ং বিলুর স্মৃতিচারণায় নীলু সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ ও সংশয় থেকে মুক্তি পাবার প্রবল প্রচেষ্টা পাঠকের অজ্ঞাত থাকে নি। পাঠক প্রথম থেকেই বিলুর প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল। কারণ তার মতো শান্ত সংযত মিতবাক যুক্তিবাদী দেশপ্রেমিকের মৃত্যু পাঠককে অভিভূত করে রেখেছে। এমন চরিত্রের মৃত্যুর কারণ যে চরিত্রটি, স্বভাবতই পাঠকের তার প্রতি ক্ষোভের শেষ নেই। চাপা অভিমান ও ক্ষুব্ধতা নিয়ে পাঠক যখন নীলু অংশে এসে পৌঁছোয় তখন লেখককে নীলু চরিত্র তৈরী করতে গিয়ে যে কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(তবে নীলু যে এ উপন্যাসে খল প্রতিনায়ক বা 'ভিলেন' নয় একথা পাঠক আগের তিনজনের স্বীকারোক্তি থেকেই বুঝতে পেরেছে। নীলুর দাদাকে ধরিয়ে দেওয়ার প্রকৃত কারণ তার কাছ থেকেই পাঠক শুনতে চায়। লেখক নিজেও বোধহয় অস্বস্তিতে ভুগছিলেন নীলুর মতো। নীলু অংশে তাই বারবার একাজের একটা সদর্থক যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। আর তা থেকেই প্রমাণিত হয় নীলু যত না 'রাজনীতিক' তার চেয়ে অনেক বেশী মানবিক। কাজ ও তার অনুশোচনায় সে ক্রম বিবর্তিত হয়েছে।)

(ব্যক্তিজীবনে নীলু বিলু প্রায় একসঙ্গে উচ্চারিত নাম, আলাদা করে তাদের ভাবাই যায় না। বাবার তো বড়োছেলে বিলুর আগে ছোটছেলে নীলুর নামই মনে পড়ে 'কার্তিক গণেশের মতো।' মায়ের কাছে নীলু 'দাদা অন্তপ্রাণ', দাদা যা করবে তাই তার করা চাই। সুতরাং নীলুকে বিলুর থেকে আলাদা করে ভাবা যায় না ; কেউই ভাবেন না। সেই নীলু বিশেষ আদর্শ কর্তব্যের বশে, জেদে ও রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করতে গিয়ে দাদাকে ধরিয়ে দিয়েছে। কঠোর নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মীর কাছে হৃদয়াবেগ,

ব্যক্তিগত সম্পর্ক একেবারে তুচ্ছ হয়ে যায়। নীলুরও তাই হয়েছে, অন্তত এই যুক্তিতেই সে নিস্তব্ধ রাতে জেলগেটে নিজের কাজের সমালোচনা করে অন্তর্থ্যক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে—'আমি কিছুতেই অন্যায় করি নাই। আমার কর্তব্য করিয়াছি মাত্র। আর আমি সাক্ষ্য না দিলেও, অন্য লোক দিত।) গভর্ণমেন্টের লোকের অভাব নাই। তফাতের মধ্যে আমি দিয়াছি নিজের রাজনীতিক সিদ্ধান্তের জন্য ও কর্তব্যের খাতিরে ; আর অন্য লোক দিত, লোভে পড়িয়া।' (পৃ. ২০৬)।(নীলু বিশ্বাস করে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, দাদার প্রতি জোর, দাবি ভালোবাসা এসবের স্থান রাজনীতিতে নেই—'তাহার স্থান রাজনীতির ক্ষেত্রের বাইরে। রাজনীতিক্ষেত্রে আমি নিলু, আর সে দাদা নয়।) এখানে যে ব্যক্তিগত প্রশ্ন ছাড়িয়া যুক্তির কষ্ঠিপাথরে প্রত্যেক কার্যপদ্ধতি যাচাই করিতে হইবে ; আমার পার্টির দৃষ্টিকোণ দিয়া সকল ধর্ম বিচার করিতে হইবে, .....'(কিন্তু শুধু পার্টির প্রতি আনুগত্যই কি একমাত্র কারণ? নীলুর অন্য একটি উক্তি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় তার পার্টির উদ্দেশ্য এরকম ছিল না এবং নিজেও শুধু নীতির দ্বারা চালিত হয়েছিল মনে করা যায় না—'তখন যেন আমি সাধারণ মানুষ ছিলাম না। তখন যে জনমতের বিরুদ্ধে পরিচিত অপরিচিত সকলের বিরুদ্ধে আমার একাকী মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার কথা, নিন্দুক ও বিরোধীদের আমার principle-এর দৃঢ়তা দেখানোর কথা। রাজনীতিক মতবাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বোধহয় সেখানে আমার ব্যক্তিগত জিদের প্রশ্ন আসিয়া পড়িয়াছিল। আমার উপর চাপ দিয়া আমার মত বদলাইয়া লইবে, এত নমনীয় রাজনীতিক মত আমি রাখিনা।' এই স্বীকারোক্তি থেকে একথাই মনে হয় পার্টির আদর্শের চেয়ে অন্য একটা বোধ নীলুকে তাড়িত করেছে। সাক্ষ্য দেবার পেছনে জেদ ও আত্মসর্বস্বতা বড়ো হয়ে উঠেছে।) লোকের কাছে নিজের বলিষ্ঠতা প্রমাণের একটা অহেতুক প্রচেষ্টা যেন নীলুকে সে সময় তাড়া করে ফিরেছে। দলের কাছে নিজের একটা 'ইমেজ' তৈরীর বাসনাও লক্ষ্য করা যায়। রাজনীতি ক্ষেত্রে দাদার কাছ থেকে দূরে সরে আসার চেষ্টা 'নাবালকত্ব' থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছেই কি তাকে এ পথে আনেনি? সে জেনেছে দল তার এ কাজ অনুমোদন করে নি, কারণ তাদের দল অন্য দলের ভুল ভ্রান্তিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারে কিন্তু অন্য দলকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া কোনো রাজনৈতিক দলের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তাহলে নীলু একাজ করল কেন? তাকে বলতে শুনি 'মার্কসবাদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হয়তো আমি ঠিক বুঝি না।' কিন্তু এত ভয়ঙ্কর কাজকে কি এ ভাবে এড়ানো যায়, না মানুষ সে যত অন্ধ-রাজনীতি বিশ্বাসী হোক সে এত নিষ্ঠুর হতে পারে? এর উত্তর লেখক দিয়েছেন। কিন্তু তাকে খুঁজতে হবে মানুষের স্বভাবের মধ্যে ; মনোলোকে আলো ফেলে সেই সূক্ষ্ম কারণ সন্ধান করতে হবে।(নীলু অংশে সেই অর্ন্তদ্বন্দ্ব, আত্মসমীক্ষাতেই লেখব ব্যক্তি নীলুর মনোভাব কার্যকারণের সূত্রে গেঁথে তুলেছেন। কিন্তু তাতেও লেখক সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পান নি (নীলু অংশে লেখক নিরপেক্ষতা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন ; রাজনৈতিক মত প্রকাশেও একদলকে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে গিয়ে অন্যকে হেয় করেছেন-বা সোস্যালিস্ট পার্টির প্রচারক বলে লেখককে মনে হয়েছে— এ সমস্ত অসংখ্য অভিযোগ মনে রেখে নীলুর মনের রহস্যময় সত্তার পরিচয় খুঁজে নিতে হয় পাঠককে।)

নীলুকে যতই বিলুর ছায়া বলা হোক, মা, বাবার চোখে দুই সন্তান একরকমের হলেও বিলু নীলু স্বভাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, দৈহিক কাঠামো, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মনোভঙ্গিতে আলাদা। নীলু অনেক বেশী স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। তার কথায় আচরণে দ্বিধা ও জড়তা নেই। বিলুর নরম, সহিষ্ণু স্বভাবের সঙ্গে নীলুর স্বভাবের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। 'নীলুর বলিষ্ঠ ঋজু দেহ, ভাবুকতাহীন মুখ। .... সে যাহা মনে করিবে তাহা করিবেই। তাহার অদম্য সাহসের সম্মুখে সকল বাধা বিপত্তিই তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।' (পৃ. ১০১)। বাবার চোখে নীলু এইরকম। মা-বাবার কথা থেকে আরো জানা যায় নীলু 'একগুঁয়ে', 'গোঁয়ার', 'মুখে কিছু আটকায় না', 'লঘুগুরুর জ্ঞান ছোটবেলা' থেকেই কম। জ্যাঠাইমাও নীলুকে দেখেছেন আলাদা চোখে। তার অবাধ্যতা, ভাঙা ঘরে শোওয়ার মত দুঃসাহস তাঁকে চঞ্চল করেছে। আর বিলু! সে নীলুকে ভালবাসে কিন্তু নীলুর সঙ্গে তর্কে কে পারে এ সম্পর্কে সে সজাগ। 'সারা পৃথিবী নীলুর বিরুদ্ধে যাক নীলু কখনও নিজের পথ হইতে বিচ্যুত হইবে না'—এ অভিজ্ঞতা বিলুর অনেকবার হয়েছে। নীলু নিজেও নিজের সম্পর্কে এইরকম ধারণা পোষণ করে '—পৃথিবীসুদ্ধ লোকের ভুল হইতে পারে আমার ভুল হয় নাই।' এই হলো নীলুর মনের গতি।

এমন আরো অনেক ঘটনা ও উক্তি আছে যা নীলুর মনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। বিচিত্র ঘটনার স্মৃতিতে বাবা-মা-বিলু অংশে তা উল্লিখিত হয়েছে। সেগুলি বিশ্লেষণ করলেই নীলুর মনস্তত্ত্ব ও বর্তমান দ্বন্দ্ব বিরোধের তলে মানসপ্রকৃতির 'সংগুপ্ত ইচ্ছের' সূত্রগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে। জ্যাঠাইমার ইচ্ছেয় বিলু সকলের আড়ালে জ্যাঠাইমাকে 'মা' বলে সে কথা জানতে পেরে মা অকারণে বিলুর ওপর রেগে যান। বিলু পরে নীলুর মুখে শুনেছে—'আজকেই মাকে বলেছি কিনা যে, তুমি জ্যাঠাইমাকে 'মা' বলো, তাই মা চটেছে।' এ ঘটনা আপাততুচ্ছ হলেও নীলুর মনের নৃশংস কৌতুকের স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায়।

বাবা অংশে এমন আর একটি ঘটনার উল্লেখ আছে যাতে নীলুর স্বভাবের ভীরু ভাবটি ফুটে উঠেছে—'নীলু বিলু গিয়াছিল বেহেবুদ মোক্তারের বাগানে কুল খাইতে। সেখানে বেহেবুদ মোক্তারের জামাই উহাদের ধরে। দুইজনকে এক একখানি কুলের পাতার উপর থুতু ফেলিতে বলে, আর হুকুম দেয় যে উহা চাটিয়া ফেলিয়া বলিতে হইবে যে আর কখনও কুল পাড়িতে আসিবে না। ইহা না করিলে মারিবার ও মাস্টার সাহেবকে বলিয়া দেবার ভয় দেখায়। নীলু ভয়ে থুতু খাইয়াছে। বিলু রাজী হয় নাই।' (পৃ. ৮০)।

বাবা আরো দেখেছেন, বিলুর হাত থেকে দোয়াতের কালি পড়ে নীলুর "ক্ষীরের পুতুল" বইটা নষ্ট হলে রাগে কাণ্ডজ্ঞানহীন নীলু বিলুর ম্যাকেন্টেসের ইতিহাসটা টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। কিম্বা বিলু দেখেছে উঠোনে সাপটাকে মারতে না পেরে নীলু আক্রোশে কুয়োর বালতির ওপর লাঠির আঘাত করে প্রতিহিংসা মিটিয়েছে। আশ্রমের প্রান্তে মাংস রেঁধে খাওয়ার দুর্মর আনন্দে সে মেতে উঠেছে ; বাবা বা অন্য আশ্রমবাসীদের নিষ্ঠাকে ব্যঙ্গ করেছে এভাবে। নীলু অঙ্কে পাশ করতে না পেরে সরস্বতীঠাকুরের ছবি নামিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে বাড়ীর সকলের জুতো। 'যুক্তি হলো যদি পড়েই পাশ করবো, তবে মা সরস্বতীর খোশামোদ করতে যাব কেন', এ সমস্ত ঘটনা হয়তো 'ছেলেমানুষী'

বলে মনে হবে); কিন্তু তার মনের অবচেতনে যে ঈর্ষা ও আক্রোশের একটা প্রবল তাড়না বরাবরই ছিল তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় এসব ঘটনাগুলির মনস্তত্ত্ব বিচার করলে।)

(নীলু বড়ো হয়ে অবধি শুনে আসছে 'বিলু ভালো ছেলে'। দাদা আদর্শবান ; তার মতো ছেলে হয় না। মা, যিনি বলেছিলেন বিলু নীলু এক ; কিন্তু অন্যত্র তিনিই বলেন, 'বিলুর মতো ছেলে হয় না।' বিলুর মন নরম, স্বভাব চাপা ; বিলুর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানা চাই। জ্যাঠাইমার বাড়িতে নীলু দেখে বিলুর আলাদা খাতির যত্ন। রাজনৈতিক দলের সকলে 'বিলুবাবু' বলতে পঞ্চমুখ। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে নীলু দূর থেকে শুনতে পেয়েছে জনতার দেওয়া জয়ধ্বনি— 'বিলুবাবুকাজয়।') ব্যক্তিজীবনে সে নিজেও অনুভব করেছে দাদার চরিত্রের দৃঢ়তা। 'প্রীতি, সৌজন্য ও নমনীয়তার মধ্যে তাহার দৃঢ়তা অসীম'—একথা নীলুকে স্বীকার করতে হয়েছে। একসঙ্গে যখন একই পার্টিতে কাজ করেছে তখনও পেয়েছে দাদার ভালোবাসা ও যে কেবল সহকর্মী নয়, কেবল কমরেড নয়—ও যে আমার দাদা। কিসে আমার একটু আনন্দ হইবে এই চিন্তা সর্বদা তাহার মনে। ....নিজে কলেজে পড়ে নাই। তাহার জন্য দাদার দুঃখ কম ছিল না। 'আর্থকোয়েকে রিলিফের' কাজে 'এলাওএন্স'-এর টাকা দাদা আমার কলেজের পড়ার খরচ করিয়াছে।' এ সকল ঘটনাই অবচেতনে নীলুকে হীনমন্যতার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত করেছে। নীলু যে বিলু সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা অনুভব করেছে তা নীলুর মানসপ্রকৃতি ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণে অগোচর থাকে না। আর এইখানেই লেখক পক্ষপাত দুষ্ট বলে সমালোচিত হয়েছেন। কিন্তু জীবনসন্ধিৎসু বিশেষ মানসিকতার লেখকের এই নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রকাশকে সহানুভূতিশীল পাঠক নিশ্চয়ই প্রশংসা করবেন। বিজ্ঞানমনস্ক লেখকের বিচারদৃষ্টির অনুবীক্ষণে সম্পূর্ণভাবে সত্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে যা ধরা পড়ে তা ব্যক্ত না করে উপায় নেই।

বিলুর মতো নীলুও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্র নয়। রাজনৈতিক বাতাবরণে তারা প্রত্যেকেই ব্যক্তি চরিত্র। তারা অতি সাধারণ মানুষের মতোই দুঃখ সুখ, স্মৃতির যন্ত্রণায়, অভিজ্ঞতায় ও আঘাতে নিজেদের মধ্যে নিজেরা সম্পূর্ণ গোটা মানুষের স্বরূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। একটা বিশেষ সময়, একটা রাজনৈতিক আবর্ত তাদের সকলকেই পরিবর্তিত করেছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মাঝখান থেকে উঠে এসেছে তারা। মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক মানসিক সঙ্কট তাদের এতদিনের জানা চেনা মনটার গভীরে থাকা অজ্ঞাত অপরিচিত মনের স্বভাবটাকে জানিয়ে দিয়েছে। তাদের এতদিনের গড়া স্বপ্ন-বিশ্বাসের জগতটা প্রত্যয়ভঙ্গের বেদনায় গভীর অজ্ঞাতসত্তার আমূল প্রকাশ ঘটিয়েছে। নীলুও এমনি ভাবে তার 'মনের চেহারা'টাকে চিনতে পেরেছে। নিঃসঙ্গ আত্মমগ্নতায় নিজেকে জানা শেষ হয়েছে। তার অনুশোচনা, আত্মপীড়ন, দাদার কাছে শেষ মুহূর্তে গিয়ে একবার নিজের মনের কথাটা বুঝিয়ে বলার ব্যাকুলতা ব্যক্ত হয়েছে। নিজের মনের কাছে নিজের কাজের সমর্থনে যুক্তি খাড়া করেছে ; শক্ত করতে চেয়েছে দুর্বল মনকে কিন্তু তাতে তার মানসিক দুর্বলতা বারবার স্পষ্ট হয়েছে। বাবার মতো তার ও মনে হয়েছে দাদা 'আমার কথাও কি একবার ভাবিবে?' বা 'দাদা শেষমুহূর্তে কাহার কথা ভাবিবে—মা'র, জ্যাঠাইমার, না আমার', সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছে—'আমার কথা ভাবিবে কেন'? আর যদি ভাবে—

'নিশ্চয় ভাবিবে। চিন্তা ভরা থাকিবে গ্লানিতে বিষাদে, আমার উপর অভিমানে' জেল গেটে বসে বারবার ইচ্ছে হয়েছে দাদাকে দেখতে। কারণ তাহলে দাদাকে মনের কথাটা বুঝিয়ে বলতে পেরে মনটা হালকা হবে। দাদা তাকে ভুল বুঝে চলে যাবে এই হলো নীলুর আশঙ্কা, ও দ্বন্দ্ব—'দাদার কাছে আমার আচরণ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার দরকার হইবে না, কিন্তু বোধহয় ইহাতে মনের ভার কিছু লাঘব হইত।' কারণ নীলু জানে এখানে যুক্তি, নীতি যতোই আত্মপক্ষ সমর্থনে সাহায্য করুক কিন্তু 'সকল যুক্তিকে পরাস্ত করিয়া অন্তরের ভিতর কোথায় যেন খচখচ করিয়া কি একটা বিঁধিতেছে। বোধহয় যুক্তিহীন ভাবপ্রবণতার অনুতাপ।' নীলু বিবেক দংশনকে 'ভাব-প্রবণতার অনুতাপ' বলে আত্মতৃপ্ত হতে চেয়েছে কিন্তু সফল হয় নি। বিলুর স্বগতকথনের শেষে বিলুর বিচলিত খেদোক্তি 'নীলু তুই একি করলি'—এ প্রশ্ন আসলে নীলুর নিজের কাছে নিজের প্রশ্ন। নীলু নিজেই এ প্রশ্নের জ্বালায় জর্জরিত হয়েছে, নিজের কাজকে বিচার করেছে, উত্তর খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থতায় আকুল হয়েছে। দাদার মোকদ্দমায় রাজসাক্ষী হয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে হরিশ্চন্দ্রের 'ছি! ছি!' চীৎকার শুনে তাকিয়ে দেখেছে কি বিপুল ঘৃণা নিয়ে হরিশ্চন্দ্র তাকে দেখছে। সেই ঘৃণাদৃষ্টি নীলুকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে। কিম্বা সেই সময় লালচে মলাটের বই-এ চোখ রাখা দাদার নির্লিপ্ত মুখ, বা হরিশ্চন্দ্রের উদ্দেশ্যে দাদার 'মিনতি ভরা চোখের চাউনি' বা জেলের কনডেম্‌নড্ সেলে দাদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দাদার সংক্ষিপ্ত সংযত বাক্যালাপ 'মার সঙ্গে দেখা করিস' এসব টুকরো টুকরো অনুষঙ্গ নীলুকে অপরাধবোধে লাঞ্ছিত করেছে। যতই সে বলতে চেষ্টা করুক— 'না, আমি কোনো অপরাধই করি নাই'— আসলে এই যন্ত্রণাই তাকে অনুক্ষণ দ্বন্দ্ববিহ্বল করেছে। সেই ভয়ঙ্কর রাতের শেষ প্রহরের ঘণ্টা যখন পড়েছে নীলু তখন প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বে আন্দোলিত, ক্ষিপ্ত, উত্তেজিত— 'ইহার পর আমার পূর্ণিয়ায় থাকা অসম্ভব। জ্যাঠাইমাকে মুখ দেখাইব কি করিয়া, মার সম্মুখে যাওয়া— সে তো অসম্ভব। .....'পাকুড় মার্ডার কেস'-এর খবর প্রত্যহ কাগজে পড়িয়া আমি আর দাদা মাকে বুঝাইয়া দিয়াছি। মা বলেন, 'মাগো ভায়ে ভায়ে এমন হয় নাকি', আর আজ।......জনমতকে তাচ্ছিল্য করা চলে, কিন্তু মার অব্যক্ত বেদনাভরা দৃষ্টিকে, জ্যাঠাইমার নীরব ভর্ৎসনাকে উপেক্ষা করা চলেনা।' (পৃ. ২১২)।

নীলুর এই সত্য চেহারাটা ধরা পড়েছে সতীনাথের সত্যনিষ্ঠায়। তাই শেষপর্যন্ত নীলুর রাজনৈতিক আদর্শ, গোঁড়ামি কোনো কিছুই শেষ কথা হয় নি ; মানুষ নীলুকে সতীনাথ জেনেছেন সময়ের ধারায়। মানুষের মনের চেহারার গতি পরিবর্তন হচ্ছে কত দ্রুত, এবং কি বিচিত্র জটিল মানুষের মন এইটাই তুলে ধরেছেন ''জাগরী''র লেখক। রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা, দলমতের গোঁড়ামির পরিচয়, দলের রক্ষণশীলতার সমালোচনা তাঁর আদৌ উদ্দেশ্য নয়। ব্যক্তিজীবনে বিভিন্ন তত্ত্বদর্শনকে জ্ঞানপিপাসু মন নিয়ে জেনেছেন, স্বেচ্ছায় রাজনীতিতে এসেছেন—তাঁর ভালোমন্দ সূক্ষ্ম বোধ দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ ও কাজ থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত রাজনৈতিক আদর্শ ও কাজ থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা পাঁচজনকে জানানোর জন্য ''জাগরী'' লেখেন নি ; মানুষের মধ্যে থেকে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে পরীক্ষা করে জানাই তাঁর উদ্দেশ্য। মানবিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ চেনা

যায়—তাকেই সন্ধান করেছেন। তাই বাবা-মা বিলুর মতো শেষ পর্যন্ত নীলুও অকৃত্রিমভাবে লেখকের কলমে চিত্রিত হয়েছে।

গ্রন্থ প্রকাশের পরই "জাগরী" অভিনন্দিত হয়েছিল শুধু বিষয়বস্তুর জন্য নয়। বিয়াল্লিশের রাজনৈতিক আবর্তের মাঝখান থেকে চরিত্রগুলির মানবিক গতিপ্রকৃতির বিচিত্র অভিব্যক্তির অভিনব বিশ্লেষণে উপন্যাসের পক্ষে যেমন আকর্ষণীয় অবলম্বন তেমনি তার প্রকাশরীতির ক্ষেত্রেও এক আশ্চর্য বিশিষ্টতা পাঠককে আকৃষ্ট করেছিল। বিষয় গুণে ও শিল্পবৈশিষ্ট্যে "জাগরী" অসাধারণ স্বকীয় সৃষ্টির পরিচয় বহন করে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত "জাগরী"র পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—'একেবারে ওস্তাদ লিখিয়ের লেখা। নবীনত্বে ঝলমল করছে।'[১২] শুধু "জাগরী" নয় পরের উপন্যাসগুলি সম্পর্কেও এস একই কথা বলা চলে। প্রত্যেকটি উপন্যাস বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য ও গঠনশৈলীর ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় অভিনব ও অনন্য।

"জাগরী" উপন্যাসের গঠনরীতি নির্মাণে লেখক ঐতিহ্যবাহী ভঙ্গি থেকে সরে এসে স্বতন্ত্র পথে চারটি চরিত্রের আত্মসমীক্ষা-আত্মকথকতার সাহায্যে অবচেতন মনের বিচিত্র গতি প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। অবশ্য এই পদ্ধতির সূচনার কৃতিত্ব তাঁর নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৭-তে "সীতারাম" উপন্যাসে ঔপন্যাসিকদের 'অন্তর্বিষয় উদঘাটনে যত্নবান' হতে বলেছিলেন। কিন্তু তার আগেই ১৮৭৭-এ "রজনী" উপন্যাসে তিনি আত্মকথনরীতির ব্যবহার করে চরিত্র গুলির অনুভূতিপ্রখর হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ "চোখের বালি" (১৯০৩) উপন্যাসে 'মনের কারখানা ঘরে' ঢুকে আঁতের কথা টেনে বার করতে উদ্যোগী হয়ে বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার প্রকৃত পথের সূচনা করেন। "গোরা" (১৯০৯) পর্যন্ত চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু লেখভঙ্গিতে উল্লেখযোগ্য নবায়ন ঘটে নি। কিন্তু "চতুরঙ্গ" (১৯১৪) "ঘরে বাইরে" (১৯১৬) "চার অধ্যায়" (১৯৩৪) "মালঞ্চ" (১৯৩৪) প্রভৃতি উপন্যাসে বিষয়ের সঙ্গে ভঙ্গি সচেতনতার সার্থক সমন্বয় সাধন করলেন।

বিশশতকে ফ্রয়েড ইয়ুং এর 'সাইকো থেরাপি' পৃথিবীময় যে আলোড়ন তুলেছিল তারই প্রভাবে সাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে। এরই সূত্র ধরে শুধু সচেতন স্তরের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়, আরো গভীরে অবচেতন স্তরের জটিল দ্বন্দ্ব জর্জরিত মানসপ্রকৃতির বিচিত্র চিন্তাস্রোতকে অন্বেষণের সাহায্যে উদঘাটিত করার তাগিদেই লেখকেরা চেতনাপ্রবাহরীতি পদ্ধতির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন। মানুষের মানসপ্রকৃতির নিরন্তর বদল হতে থাকে। সমাজ-পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকের জটিল পরিবর্তনের টানে মানুষের মনোলোকের গভীর স্তর পর্যন্ত যে পরিবর্তন হচ্ছে তার গতি প্রকৃতি ভয়ঙ্কর বন্ধুর, জটিল ও সংকটময়। সেই মানসিক অভিব্যক্তির প্রকাশ তাই ঋজু, সরল হতে পারে না। স্বভাবতই এই চিন্তাধারা আপাত বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন, এলোমেলো অভিব্যক্তির প্রবাহ—এই রীতিতে মানবজীবনকে তুলে ধরার বিশেষ ভঙ্গি 'চেতনা প্রবাহ রীতি' নামে স্বীকৃতি পায়। চেতনা প্রবাহ বা stream of consciousness কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন দার্শনিক উইলিয়ম জেমস্। মানুষের সচেতন মনের যুক্তি ও চিন্তা পরস্পর

অঙ্গীভূত ও প্রকাশক্ষম। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। বাইরের বাস্তব আঘাতে মনের অবচেতন স্তরে অজান্তে অজস্র এলোমেলো চিন্তা ও চিন্তার টুকরো জমতে জমতে অনুষঙ্গ সূত্রে অভিজ্ঞতার ঐক্যে ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হয় ও অখণ্ড চেতনার স্রোত সৃষ্টি করে। এমনি ভাবে মনের গভীরে নিয়ত প্রবাহিত চিন্তার স্রোতরাজি মানুষের মনোভঙ্গির স্বরূপ ব্যক্ত করে।

বস্তুত উপন্যাসে এর সূচনা ইয়োরোপে। মার্শাল প্রুস্ত, ভার্জিনিয়া উল্ফ, জেমস জয়েস, ডরোথি রিচার্ডসন এই নতুন রীতি পদ্ধতি, বাকধারার সূচনা করলেন উপন্যাসে। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথেরই এর পরিপূর্ণ প্রকাশ হলো। "চতুরঙ্গ", "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গির সচেতনতা গ্রহণ করে অন্তর্লোকের রহস্যময় অবচেতন সত্তাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য জীবনচর্যার সঙ্গে এক করে দেখবার প্রচেষ্টায় এই নতুনরীতির প্রকাশ ঘটলো। এটিই বাংলায় 'চেতনা প্রবাহ রীতি' (stream of consiousness) নামে পরিচিত। কিন্তু বহু ব্যবহারেও এ রীতিটি আজও পুরোনো হয়নি। কারণ সাধারণ কাহিনী পাঠকের কাছে এ রীতির আবেদন কম এবং কাহিনীধর্মী লেখকের রচনা শৈলী এই রীতি গ্রহণে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া মননশীল লেখকদের কয়েকজন মাত্র আজ পর্যন্ত এই রীতি গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গে"র শেষ অধ্যায়ে শচীশের চেতনাপ্রবাহ সবচেয়ে সার্থক প্রয়োগ বলে অনেকে মনে করেন। আবার অনেকে মনে করেন বুদ্ধদেব বসুর "লালমেঘ" (১৯৩৪) উপন্যাসে এর সবচেয়ে সার্থক প্রয়োগ হয়েছে। ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় যথার্থ মননশীল লেখক। তাঁর 'ত্রয়ী'র অন্তর্গত "অন্তঃশীলা", (১৯৩৫) "আবর্ত" (১৯৩৭) " মোহানা"য় (১৯৪৩) এই বিশেষ রীতির যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে। "অন্তঃশীলায়" লেখক এই রীতির কিছুটা আভাসও দিয়েছেন—"সত্যকারের নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়। চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে, হয়তো সিদ্ধান্তই থাকবে না। তবে স্রোত যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে, একটা ঘটনা ঘটুক, অমনি খড়কুটো যেমন স্রোতে ভেঙ্গে যায়, ঘটনাটি তেমন বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। .... জীবনে নাটকীয় ঘটনা ঘটে না, অতি সাধারণ তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে নিয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়। কখনও আসে জোয়ার ভাঁটা, কখনও বা বান ডাকে বন্যা আসে। চোখ খুলে দেখলে সেই স্রোতে কত ঘূর্ণি, কোথাও ঢেউ, কোথাও বা আবর্ত, এই ত জীবন।"[৩] বস্তুত এই চিন্তার স্রোতই চেতনার স্রোত (stream of consciousness)। তাকে রূপায়িত করতেই লেখকের এই রীতি প্রয়োগ সার্থক হয়। এছাড়া গোপাল হালদারের "একদা" (১৯৩৯) উপন্যাসের এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। কালানুক্রমিক পথে এর পরেই সতীনাথের "জাগরী" (১৯৪৫) উপন্যাসে লেখকের চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতির ব্যবহার অসাধারণ শিল্প মানসিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর হয়ে আছে।

এই শিল্প নির্মিতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল—চরিত্র বা চরিত্রগুলির মনোবিশ্লেষণ ও মনস্তাত্ত্বিক নিরীক্ষা, অন্তর্মুখীনতার সাহায্যে বাস্তবতার প্রকাশ, আত্মকথন, স্বগত কথন রীতিতে স্মৃতিচারণা ও বাস্তব অনুষঙ্গের সূত্র ধরে অতীত বর্তমানের মেল বন্ধন ঘটিয়ে নিজের মনোজগতে স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ। উপমা এপ্রিগ্রাম নির্ভর ভাষার ব্যবহার, সময় কালের পরিধি অতিক্রম করে কালোত্তীর্ণ চেতনার প্রকাশ, আত্মবিশ্লেষণের সাহায্যে অন্তর্লোকের

স্বরূপ জেনে নিজের সত্যকার পরিচয় আবিষ্কারে বিস্ময় এবং অভিজ্ঞতার অখণ্ডত্বে সামগ্রিক চেতনার প্রকাশ ঘটানোতেই এই রীতির সার্থকতা নির্ভর করে। অর্থাৎ আপাত বিচ্ছিন্ন এলোমেলো খাপছাড়া স্মৃতিকথন, অনুষঙ্গ থেকে অনুষঙ্গান্তরে যাওয়া আসার ছিন্নচেতনা একত্র করলেই ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় জটিল দ্বন্দ্বময় সত্তার স্বরূপ ব্যক্ত হয়। প্রত্যক্ষ বর্তমানের সূত্র অনুসরণ করেই চরিত্র অতীত সন্ধান করে পেয়ে যায় বঞ্চিত ব্যর্থ আবেগদীপ্ত ঘটনা আবার অতীতের উজান বেয়ে চলে আসে বর্তমানের ঘটমান বাস্তবে—এই প্রবাহের অবিরাম চলমানতায় পাঠক সঠিক সন্ধান পায় আপন ব্যক্তিত্বের ; অস্তিত্বের দ্বান্দ্বিক সঙ্কট থেকে গঠিত সত্তার স্বরূপ প্রত্যক্ষগোচর হয়।[১৮]

"জাগরী" উপন্যাসে এই বিশেষ পদ্ধতির ব্যবহার সূচনা থেকেই। সম্পূর্ণ উপন্যাসটিতে এই একটি রীতিই ব্যবহৃত হয়েছে। অসাধারণ স্বাভাবিকতা রক্ষা করেছেন লেখক আন্তরিক লেখনভঙ্গিতে। এই ধরনের রচনা নির্মিতিতে যে ধরনের আড়ষ্টতা, কৃত্রিম দূরত্ব অনেক সময় উপন্যাসের গতি মন্থর করে ফেলে, তা সতীনাথের ক্ষেত্রে হয় নি ; কারণ জীবন সম্পর্কে আন্তরিক সহানুভূতি ছিল তাঁর গভীর। জীবনরস সৃষ্টির তাগিদেই চরিত্রগুলি স্বচ্ছন্দ প্রবাহ পেয়েছে। তাছাড়া একটা অখণ্ড সময় থেকেও লেখক সরে আসেন নি। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে উত্তমপুরুষের বচনে, চরিত্রের আত্ম-কথকতায় অতীত বর্তমান মিলে মিশে একটি অখণ্ডকালের ইঙ্গিত দিয়েছে। প্রসঙ্গত, "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে বিমলার আত্মকথায় এস সময় ঐক্য সর্বত্র সমানভাবে রক্ষা করা হয় নি। বিমলার আত্মকথার সূচনা পড়লে মনে হয় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর যেন বক্তা তার জীবনকে বিচার করে দেখছে, ফলে বাস্তবের প্রত্যক্ষতার সঙ্গে স্মৃতির মিশেলে তা সময়ের সত্য থেকে দূরে সরে গেছে একথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু "জাগরীতে" এইখানেই সতীনাথ আশ্চর্যভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। চারটি চরিত্র প্রায় একই পরিবেশে, একই সময়েও একই ঘটনার আবর্তে নিজেরা আত্মদর্শনে রত হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেকের আত্মমগ্নতা বাস্তবের সংস্পর্শে এসে থেমেছে—আর সেই মুহূর্তে প্রত্যেকেই নিজেদের স্বতন্ত্র মানসিক অস্তিত্বের প্রকৃত যথার্থ রূপটিকে জানতে পেরেছে। প্রতিটি চরিত্রের কথা অংশে একই ঘটনা ও তাকে কেন্দ্র করে নিজেদের অবাধ জীবনাচরণের স্বরূপ ও সেই সূত্রে সমকাল তার সামাজিক বিশেষত রাজনৈতিক ও পারিবারিক চেহারাটা প্রত্যেকের কাছে নিজের মতো হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় তারা নিজেকে ও একে অন্যকে দেখেছে অসংখ্য অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সাহায্যে। ঘটনার পুনরুক্তি আছে কিন্তু স্মৃতির অনুষঙ্গে প্রত্যেকের দেখা আলাদা। তাই পুনরাবৃত্তি নেই। পাঠকের কৌতূহল শেষ পর্যন্ত তাকে অনিবার্য সত্যের উপলব্ধির জন্য সজাগ করে রাখে। এই মুন্সিয়ানা সতীনাথকে দিয়েছে সাফল্য ও স্বীকৃতি। "জাগরী" তাই রচনারীতির বৈশিষ্ট্যেও অনবদ্য।

একই পরিবারের চারজনের তিনজনে জেলের নির্জনতায় আসন্ন অনিবার্য মৃত্যুকে সামনে রেখে জীবনের প্রতি প্রবল আকুতি বুকে নিয়ে রাত কাটাচ্ছে। জেলের গেটে এই পরিবারের অন্যজনও মৃতদেহ নেবার জন্য সারারাত অপেক্ষা করছে অনুশোচনা, অনুতাপ আর আত্মসমর্থনের পক্ষে যুক্তি খাড়া করে। প্রত্যেকেই বারবার স্মৃতিচারণায় অতীতমুখী হয়ে অন্তর্লীন অবচেতনে চিন্তার স্রোতে অবগাহন করেছে আবার চকিতে জেলের খুঁটি নাটির

সংস্পর্শে এসে জেলওয়ার্ড বয়, বন্দীদের বিচ্ছিন্ন কথাবার্তা শব্দের সূত্রে বাস্তব প্রত্যক্ষতায় ফিরে এসেছে। জেলের বাইরে নীলুও এই একই উপলব্ধির সূত্রে বাস্তব থেকে অতীতে, অবচেতন থেকে চেতনের স্তরে আসা যাওয়ার গতিতে চলমান। প্রত্যেকেই একটা অসহায় আত্মযন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত, বিপন্ন। আর সেই সঙ্কট অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিলু কখনও চলে যায় তার শৈশব কৈশোরের দিনগুলিতে—নীলু-মা-জ্যাঠাইমা-সরস্বতীর জগতে। বাবা দেখেন বিলু নীলুর অতীত জীবনকে। মা তার জীবনের ক্রমবন্ধুর পথে বিশ্বাস, সংস্কারে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেন। নীলু রাজনীতি, তার সত্যতার দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে চলে যায় বর্তমানে বিচ্ছিন্ন পরিবারটির হারানো মিলনের সূতোর সূত্র সন্ধানে। দিনের শেষ আলোটুকু জেলের গাছপালার আড়াল হবার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগুলির আত্মচারণা শুরু হয়েছে আর নীলু ছাড়া প্রত্যেকের আত্মকথন শেষ হয়েছে একটা মোটরগাড়ীর হর্ণের শব্দ, জেলের গেট খুলে যাওয়ার কর্কশধ্বনি ও ভারিবুটের আওয়াজে। একমাত্র নীলুই আরো অপেক্ষা করেছে, পেয়েছে ভোরের আলো, পাখির কাকলি। প্রকৃতির অন্নপূর্ণা মূর্তির আশ্বস্তরূপ ; সঙ্কটময় রাতের দুর্বিষহ যন্ত্রণার অবসান থেকে সেই পেয়েছে প্রথম আশ্বাস ; জাগ্রত চৈতন্যের নবরূপকে, সঙ্কট আর অস্তিত্বের দ্বান্দ্বিক যন্ত্রণা থেকে উঠে আসা জীবনের পরিপূর্ণ চেহারাকে প্রথম ভোরের আলোয় সেই পাঠ করেছে সকলের আগে।

এ উপন্যাসের ভাষা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। অতীত-বর্তমানের যোগসূত্রে অসম্পূর্ণ বাক্যাংশে সৃষ্টি হয়েছে গভীর ব্যঞ্জনা। চরিত্রগুলির গভীর অনুভূতির বাস্তবায়ন সৃষ্টি হয়েছে। বিলু ও বাবার ব্যবহৃত ভাষায় উপমার ব্যবহার গভীর তাৎপর্য সৃষ্টি করেছে। ইংরেজী-বাংলা মিশ্রিত শব্দের ব্যবহার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর ঔপনিবেশিক প্রভাবসুলভ মানসিকতাকে ব্যক্ত করেছে। যেমন, 'এছাড়া দেখা যায় একফালি নীল আকাশ—লোহার গরাদের মধ্য দিয়া লোহার তারের টোস্টারের মধ্যে এক স্লাইস পাঁউরুটির মতো....' বা নিকটস্থ ওয়ার্ডার পাগলী (alarm) হুইস্‌ল্‌ বাজাইতেছে।' বিলু বাস্তবকে সন্ধান করে ; তাতেই তার আস্থা। তাই জেলের গরাদ দিয়ে দেখা ফালি আকাশ তার কাছে বাস্তব ; কিন্তু এরোপ্লেনের শব্দে সে মাটির স্পর্শ পায় না বলে তা তাকে আকর্ষণ করে না। তার কথায় উপমার ব্যবহার এনেছে সেই বাস্তব স্পর্শ—'জেলও যেন একটি ছোটখাট শহর। এই শহরের নাম লৌহগরাদ হইলে হয়, ধ্বনির ঝঙ্কারে ঠিক লেনিনগ্রাদের মতো শুনিতে লাগে।' কিম্বা 'দুই নম্বর ওয়ার্ড হইতে ছয় নম্বর ওয়ার্ডের দিকে তাকালেই যেন মনে হয় একটি বড় জংশন কোনো—স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া আছি।'

বিলুর কানে শুধু বাস্তব নেই আছে আবেগ ; জীবন তার শেষ হয়ে যাচ্ছে—তাই তার কথায় পৃথিবী তার বর্ণ, গন্ধ শব্দ নিয়ে মন্ময়তা সৃষ্টি করেছে। বিলু তার বুকের মধ্যে শুনেছে রসমহন ঢাকীর নবমী পূজোর রাতে বাজানো ঢাকের আওয়াজের চেয়েও গভীর শব্দের স্পন্দন। বা তার হাতে লাগানো গোলাপজামের গাছটায় 'পাউডারের পাফের' মতো ফুল দেখে স্পর্শ সুখ অনুভব করেছে। আবার গাছের সবুজ, আকাশের নীল তার অন্তরে যে আবেগ সৃষ্টি করে, পরমুহূর্তে জেলের সেলের পাঁশুটে রঙ এসে আচ্ছন্ন করে তার বোধকে, বিষণ্ণ করে তার মনকে। তার চোখে তখন—'ঐ সবুজ, আর নীল ছাড়া,

আর যে কোনো রঙই দেখি সবই রুক্ষ ও কঠোর মনে হয়—চক্ষুকে পীড়া দেয়। সেলের চুনকাম করা সাদা দেওয়াল তাহাও বড় প্রাণহীন, বড়ই পান্ডুর।'

বাবার উক্তিতেও বুদ্ধিজীবী মানুষের শিষ্টাচার সম্পন্ন ভাষার ব্যবহার তাঁর স্বভাব সুলভ মানসিকতা প্রকাশের সহায়ক হয়েছে। বাবা, বিলু, নীলু, এদের তিনজনের ব্যবহৃত ভাষা সাধু ভাষা। মা-ই একমাত্র 'চলিত ভাষায় মনের কথাকে ব্যক্ত করেছেন। বাবাকে অবশ্য একবার বলতে শোনা যায় চলতি ভাষায় কি কথাবার্তা বলা যায় না?' আবার তিনি শিক্ষকের সমালোচনাসুলভ মন নিয়ে অন্যের ভাষা ব্যবহারের সমালোচনা করেন— 'বিহারে যে অল্প ইংরাজী শিখিয়াছে,সেও মা বাবা বোন এই শব্দগুলি নিজের ভাষায় বলিবে না।' কিন্তু তিনিও তো এমন মিশ্রিত শব্দ প্রয়োগে সচেতন হননি। তাঁকেও বলতে শোনা যায় 'সোস্যালিস্ট হওয়া একটা ফ্যাশন হইয়াছে' বা 'হইতে পারে যে বিলুকে ইংরাজী পড়াই নাই বলিয়া উহাদের মধ্যে inferiority complex আছে।' নীলু এ তুলনায় অনেক স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। তার চিন্তার স্রোতে উপমা ইত্যাদির অনুষঙ্গকম। কিন্তু স্মৃতির সাযুজ্যে অসমাপ্ত বাকবিধির সাহায্যে সেও মনের স্বরূপের ব্যঞ্জনা দিয়েছে। নীলু জীবন ও রাজনীতিকে দেখেছে কাজের ভিত্তিতে। তাই তার কাছে রাজনৈতিক ভূমি কর্ষণ করে ফসল ফলানোর স্থান। সেখানে আবেগ নেই, ব্যক্তিগত সম্পর্ক নয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা নীলু বা দাদা নয়। তাদের কাজের বিচার হবে কাজের ভিত্তিতে, পার্টির দৃষ্টিকোণ থেকে। তার মনের গঠনভঙ্গির সঙ্গে মিলে মিশে গেছে তার বাক্‌ভঙ্গী—'আমার সম্মুখে বেদনাজর্জর সমাজের অগণিত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। সমাজের যুগযুগ সঞ্চিত অশ্রু মুছানোর ভার যাহার উপর ন্যস্ত তাহার কি সঙ্কীর্ণ গৃহকোণের দু-চার বিন্দু তপ্ত অশ্রুর কথা মনে করিলে চলে!'

শুধু পরিবার নয়, পরিবারের বৃত্তে এসে মিশে এক হয়ে গেছে গোটা দেশটা, রাজনীতি পরিবারকে নিয়ে এসেছে বৃহৎ জগতে তেমনি বৃহৎ জগতের বিচিত্র গতি পরিবারের আধারে পেয়েছে নতুন বোধ। চারটি চরিত্রের স্মৃতিতে মূর্ত হয়েছে গোটা পূর্ণিয়া দেশটা। ভারতবর্ষের অগণিত জনতার একটা দুর্মর মুক্তির প্রত্যাশার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। আন্দোলনের চিত্র, দেশীয় মানুষের ভাষা ব্যবহার, মৈথিলমিশ্রিত ভাষার মধুর অনুরণন "জাগরী"র ভাষা রীতিকে করেছে উৎকর্ষমণ্ডিত। সমস্ত অঞ্চলটা তার ভৌগোলিক-সামাজিক-রাজনৈতিক মানবিক চেহারা নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে বিশাল ভারতবর্ষের জাগ্রত গণঅভ্যুত্থানের আভাসে মুখর।

## টীকা

১. "জাগরী" উপন্যাসে মা চরিত্র চিত্রণে লেখকের নিজের মায়ের চরিত্রে প্রভাব আছে। বিলু-নীলুর মতো সতীনাথও ছিলেন মাতৃভক্ত। বাবা রাশভারী স্বভাবের। তাই মায়ের কাছেই ছিল তাঁর যত আবদার। তাছাড়া জ্যাঠাইমা চরিত্রে শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী ও দাক্ষায়ণীদেবীর প্রভাব আছে। এঁরা পূর্ণিয়ার ডঃ অমর ভট্টাচার্য ও ডঃ গোপাল ভট্টাচার্যের মা। কুসুমকুমারী দেবীকে সতীনাথ মা বলে ডাকতেন। নিজের মাতৃবিয়োগের

পর এঁর অকৃত্রিম স্নেহ সতীনাথের জীবনকে ভরিয়ে রেখেছিল। "অচিনরাগিনী" উপন্যাসেও এই নারী চরিত্র নতুন দিদিমা চরিত্র চিত্রণে সাহায্য করেছে।

২. " দেশ ", ১৩৫২, ৩০ শে চৈত্র সংখ্যায় অতুলচন্দ্রগুপ্তের প্রবন্ধটি পুস্তক পর্যালোচনা অংশে মুদ্রিত হয়।

৩. নীরেন্দ্রনাথ রায় "পরিচয়" পত্রিকায় ১৩৫৩, ভাদ্র সংখ্যায় "জাগরী" সম্পর্কে আলোচনা করেন। গোপাল হালদার ও "পরিচয়"-এ ১৩৫২ তেই এ গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেন। পরে এই প্রবন্ধটি "বাঙলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি" গ্রন্থে 'বাঙলা রাজনৈতিক উপন্যাস' প্রবন্ধ পৃ. ১৫৭ তে মুদ্রিত হয়। পরে 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী" ১ম খণ্ড, অরুণা প্রকাশনী, 'সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা' অংশে ছাপা হয়।

৪. "জাগরী" সম্পর্কে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—'একেবারে নূতন কথা, নূতন সুর, নূতন সব মানুষের ভীড়, একেবারে সম্পূর্ণ নূতন মনোভাব লেখকের অপরিচিত নাম, কিন্তুরচনার অভাবিত উৎকর্ষ। চমক জাগল। সম্পূর্ণ অভ্রান্তভাবে কালাতীত সাহিত্য কর্মের ছাপ'। —"সতীনাথ স্মরণে", সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ; পৃ. ৮০।

৫. আলোচনা অংশে "জাগরী" থেকে উদ্ধৃত অংশগুলি উদ্ধার করা হয়েছে "জাগরী" প্রকাশ ভবন প্রকাশিত একাদশ মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৩৭৩, গ্রন্থ থেকে। উদ্ধৃতির সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করা হলো।

৬. "জাগরী" উপন্যাসেই সতীনাথ বিলু-নীলুর পরিবারটিকে 'রাষ্ট্রীয় পরিবার' বলে উল্লেখ করেছেন। লেখক এই পরিবারের আদর্শ প্রেরণা পেয়েছেন পুরুলিয়ার লোকসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা অতুলচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর সহধর্মিনী লাবণ্য প্রভা ঘোষ-এর জীবন থেকে। দ্রষ্টব্য "সতীনাথ-স্মরণে" সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ১৬৬।

৭. 'বাঙলা রাজনৈতিক উপন্যাস' ঃ "বাঙলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি" পৃ. ১৫৪-৫৫।

৮. "জাগরী" প্রথম সংস্করণ, সমবায় পাবলিশার্স. ১৯৪৫, ভূমিকা অংশ।

৯. 'ভাদুড়ীজী', ফণীশ্বরনাথরেণু ; "সতীনাথ-স্মরণে", সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত (পৃ. ৩২)।

১০. 'একদিনজাগরীর [ আওরাৎকিতা ] মা-অধ্যায় সম্বন্ধে আমি একটু পাকামি করে মন্তব্য করেছিলাম—"ওই চ্যাপটারটা সর্বশ্রেষ্ঠ.....।" ভাদুড়ীজী বলেছিলেন—"অন্য পাঠকের কোনো অন্য অধ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ লাগতে পারে।'—'ভাদুড়ীজী' ফণীশ্বর নাথরেণু ; "সতীনাথ-স্মরণে", পৃ. ৩৪।

অন্য সমালোচক গোপাল হালদারও মা-অংশটি সম্পর্কে মনোজ্ঞ মন্তব্য করেছেন—'নিঃসন্দেহে মায়ের অধ্যায়ই সর্বাপেক্ষা হৃদয়স্পর্শী, চিরন্তন মানব সত্যে তা প্রতিষ্ঠিত।' "সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ সাহিত্য ও সাধনা", পৃ. ৫৪।

১১. 'গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে প্রচার করা বইখানির উদ্দেশ্য নয়। এ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। গান্ধীবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইলেও তাহার দুর্বলতা ও বিহার কংগ্রেস মিনিষ্ট্রির ত্রুটি

বিচ্যুতি তিনি বিলু ও নীলুর মুখ দিয়া বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন। কিন্তু বিলুর সহিত নীলুর বিরোধে তাঁহার পক্ষপাত চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেকে গোপন রাখিতে পারেন নাই। ব্যক্তি হিসাবে বিলুর সহিত নীলুর কোনো তুলনাই হয় না।....দুটি বিরোধী মতবাদকে সমদৃষ্টিতে দেখাইবার উদারতা গ্রন্থকারের না থাকায় উপন্যাসটির উৎকর্ষ শেষ পর্যন্ত বহুল পরিমাণে ম্লান হইয়াছে।—' নীরেন্দ্রনাথ রায়, 'পরিচয়', ১৩৫৩ ভাদ্র, পুনর্মুদ্রিত সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ১খণ্ড,অরুণা প্রকাশনী,' পৃষ্ঠা. ছ।

এছাড়া গোপাল হালদারও নীলু চরিত্র সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন—মাইয়োপীয়া-পীড়িত অলডাস হাক্সলি যেমন আক্রোশের বশে তাঁর প্রায় উপন্যাসেই কোনো ব্যর্থ ও বিকলাঙ্গকে কমিউনিস্ট করেন, মনে হবে এক্ষেত্রে 'জাগরী'র লেখকও তেমনি একটা মনোভাবের চোরাবালিতে আটকে গেছেন—অবশ্য দেশের অনেক লোকই আজ তেমনি অবস্থায়। নানা অজুহাত দেখিয়েও লোক সেখান থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পারছেন না।'—"বাঙলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি : গোপাল হালদার পৃষ্ঠা ১৪৯-৫০।

১২. "জাগরী"র আলোচনা, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, "দেশ" ১৩৫২, ৩০ শে চৈত্র।

১৩. "অন্তঃশীলা", ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮২ প্রথম পৃষ্ঠা।

১৪. Robert Humphrey-Stream of consciousness in Mordern Novel (1958)—দ্রষ্টব্য।

## ঢোঁড়াই চরিতমানস

"জাগরী"র পর 'ঢোঁড়াই চরিতমানস" প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ। কিন্তু ঠিক পরেই নয়। এর আগে লিখেছেন "চিত্রগুপ্তের ফাইল"। "ঢোঁড়াই চরিতমানস" প্রথম চরণ " দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ সালের ১৫-ই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে ২৬-এ ভাদ্র সংখ্যায়। নাম ছিল—'সটীক ঢোঁড়াইচরিত মানস' প্রথম চরণ। পরে ১৯৪৯ সালে, বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রথম চরণটি প্রকাশিত হয়। "চিত্রগুপ্তের ফাইল" উপন্যাসটির সূচনা ধারাবাহিক ভাবে "ঢোঁড়াই চরিত" রচনার অল্পকাল আগে। এ গ্রন্থটি "মাসিক বসুমতী" পত্রিকায় ১৩৫৫ সালের মাঘ সংখ্যা থেকে ১৩৫৬ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "মীনাকুমারী" নামে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। তার আগে এই উপন্যাসটি "মাতৃভূমি" পত্রিকায় "চিত্রগুপ্তের ফাইল" নামে ১৩৫৫ ভাদ্র থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে কিন্তু পত্রিকাটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। "চিত্রগুপ্তের ফাইল" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৯-এ। "ঢোঁড়াই চরিতমানস" দ্বিতীয় চরণ "দেশ" পত্রিকায় ১৩৫৭, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে ৩০-এ ভাদ্র সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ সালে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই উপন্যাস দুটিতে "জাগরী"মতো সতীনাথের রাজনীতি সচেতন অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে। "চিত্রগুপ্তের ফাইল" উপন্যাসের চরিত্রগুলি গণআন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে এমন রাজনৈতিক দলের অংশীদার। অভিমন্যু, শিউচন্দ্রিকা এরা রাজনৈতিক কর্মী ও ট্রেডইউনিয়ন শ্রমিক সংগঠনের নেতা। এ উপন্যাসে শ্রমিকজীবন, সাধারণ মানুষ গুরুত্ব

পেয়েছে। ''জাগরী''র মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্কট থেকে লেখক ক্রমেই দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থসঙ্কট-সমস্যা, রাজনৈতিক সচেতনতার প্রতি বিশেষ মনঃসংযোগ স্থাপন করতে আগ্রহী তা এ উপন্যাস পড়লেই বোঝা যায়। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ ধীরে ধীরে উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাচ্ছে তা ''চিত্রগুপ্তের ফাইল'' পড়লে স্পষ্ট হয়। অবশ্য এর আগে '' মোহানা'' উপন্যাসে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক-সংঘাতকে চিত্রিত করেছে। ''চিত্রগুপ্তের ফাইল''-এ সতীনাথের রাজনীতি সচেতন মন বুঝেছিল শ্রমিকের সঙ্গে কৃষকের ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক তৈরী করতে হবে। কৃষক-শ্রমিক ঐক্যশক্তির কল্পনা জনমুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাৎপর্য সূচক ঘটনা এবং সে বিষয়ে সতীনাথের চিন্তা অত্যন্ত আধুনিক ভাবনার প্রকাশ বলে মনে করা যেতে পারে। শ্রমিক নেতা অভিমন্যু বলীরামপুর জুটমিলের অসৎ সহকারী ম্যানেজারের মিথ্যা চক্রান্তে অপমানিত হয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে শাস্তি পেয়ে গ্রামে চলে আসে। অভিমন্যু পারত অপমানের উত্তর দিতে কারণ তার সঙ্গে ছিল মীনাকুমারীর চিঠি, কিন্তু তা না করে সে চলে এলো ভিন্ন জীবনে—কৃষিজীবনের সংস্পর্শে ; এখানে নিজেকে অন্য ভাবে গড়ে তুলল। কিন্তু অভিমন্যুর জীবন ব্যর্থতার গ্লানিতে ভরা। কৃষক-পুলিশ বিরোধে জমিদারের লাঠিতে সে জখম হয় ও মারা যায়, তার চিতার আগুনে শিউচন্দ্রিকা পাঠ করল সেই গোপন চিঠি। নিরাপরাধ অভিমন্যুর কথা সকলে জানল। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসে শ্রমিক জীবনের সঙ্গে সতীনাথের সক্রিয় সাহচর্য ও অভিজ্ঞতা প্রাধান্য পেয়েছে। যে সময় উপন্যাসটি লিখছেন, সেইসময় কংগ্রেস ত্যাগ করে এসেছেন কারণ সদ্য স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই কংগ্রেসকে ঘিরে কপট দেশসেবক ও স্বার্থান্বেষিদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষ, যারা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ নিয়ে স্বাধীনতার কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, স্বাধীনতার পরে তারা উপেক্ষিত হয়েছে। এক অর্থে বিপুল জনশক্তি প্রবঞ্চিত হয়েছে। সতীনাথ সাধারণ মানুষের বিপ্লবী ভূমিকাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন 'জাগরী' উপন্যাসে ঐ বইটি উৎসর্গ করেছেন 'যে সকল অখ্যাতনামা রাজনৈতিক কর্মীর কর্ম নিধবা ও স্বার্থত্যাগের বিবরণ, জাতীয় ইতিহাসে কোনদিনই লিখিত হইবে না, তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশে—'

এই মানবিক সহানুভূতিই দ্রষ্টা সতীনাথকে লেখক বা স্রষ্টা রূপে গড়ে তুলেছে। রাজনৈতিক দল ছেড়ে এসেছেন। সঠিক পথের সন্ধানে ফিরছেন ১৯৪৮-এ। চারমাস কোনোদলেই যোগ দেননি। শেষে অল্পদিনের জন্য কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন অল্পদিনের জন্য। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল'-এ যে ট্রেড ইউনিয়েনের ছবি এঁকেছেন তা ১৯৪৮ সময়কালে বিহারের কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সে সময় সতীনাথের মনে মনে প্রবল আস্থা সাধারণ মানুষের প্রতি। ভেবেছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যেই রয়েছে সমাজের উন্নতির হাতিয়ার। বুঝতে অসুবিধে হয় না গণ অভ্যুত্থানের আদর্শ, রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্ন সতীনাথকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল। আরো বোঝা যায় কেন তিনি রাশিয়া যাবার জন্য মনে মনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বা রূপ ভাষা লিখছেন। প্রায় দশ বছর আগে কাটহার জুটমিলে শ্রমিক-মালিকের বিরোধে অংশগ্রহণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই উপন্যাসে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। রাজনীতি-সংচেতন সতীনাথ বুঝেছিলেন আধিয়ার-

শ্রমিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাই গণজাগরণ ঘটাবে। কারখানার মালিকের মিথ্যাচক্রান্তে অপমানিত হয়ে বলীরামপুর জুটমিলের শ্রমিক নেতা অভিমন্যু গ্রামে চলে আসে।

উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে গড়ে তোলার অনেক সম্ভাবনা ছিল। শ্রমিক-মালিকের দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক উপাদান। বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত বর্ণনায় কারখানার মালিকের অন্যায় লোভ, ব্যাভিচার, হীনচক্রান্ত, অভিমন্যুকে বদনাম দিয়ে সরাবার চেষ্টা-প্রভৃত্তির বর্ণনা বাস্তবানুগ। মালিক পক্ষের অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদে শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, উপযুক্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন প্রভৃতি সতীনাথ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। বলীরামপুর জুটমিলের মালিক ও মজদুর ইউনিয়নের দ্বন্দ্ব, বিহার অঞ্চলের জমিদার-আধিয়ার, জোতদার বাটাহারদের সংঘর্ষ, মিল ম্যানেজার ম্যাকলান, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ ; মালিকপক্ষের সঙ্গে পুলিশ, এস.ডি.ও. এবং সরকারী আমলাদের গোপন আঁতাত ; মালিক-গা মিক সম্পর্কে ভাঙন ধরাবার জন্য তৃতীয় শক্তিকে সাহায্য ; শ্রমিক কল্যাণের খাতে বরাদ্দ টাকা নিজেদের স্বার্থে ব্যয় — এসব বাস্তব ছবি আঁকতে আঁকতেই সতীনাথ নিজেও স্থির করে ফেলেছেন আর কোনো রাজনৈতিক দলে তাঁর পক্ষে আপোস করে থাকা সম্ভব নয়। এই উপন্যাসে শিউচন্দ্রিকাকে তিনি যুক্তিবাদী একরোখা নিষ্ঠাবান শ্রমিক নেতা রূপে এঁকেছেন। অভিমন্যু তুলনায় ভাবপ্রবণ, আদর্শবান প্রেমিক জাগরীর বিলুর অনুরূপ চরিত্র। অভিমন্যু তার ভাবাবেগ, স্বপ্নসন্ধানী মন নিয়ে রাজনীতিতে এসেছিল। বুঝতে পারেনি সুবিধাবাদী শয়তান মিল মালিকের ব্যূহে প্রবেশ করলেও বেরিয়ে আসা কঠিন। তুলনায় শিউচন্দ্রিকা 'জাগরী'-র নীলুর মতোই আদ্যন্ত কঠোর যুক্তিবাদী সত্যনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী। অভিমন্যুর কোমলতা, আত্মত্যাগ, প্রেমের মাধুর্য, গান্ধীজী সম্পর্কে গভীর আনুগত্য পাঠককে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে।

সতীনাথ এই উপন্যাসে অভিমন্যু-মিনাকুমারীর অসম্পূর্ণ প্রেমকাহিনী এঁকেছেন। সেখানে লেখকের জীবনরস সন্ধিৎসা স্পষ্ট হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে অভিমন্যু শিউচন্দ্রিকা পরস্পরের সহযোগী হলেও অভিমন্যু একটু আলাদা স্বভাবের। তার জীবনে মিনাকুমারীকে কেন্দ্র করে গোপন অধ্যায় গড়ে উঠেছিল যার অনেকটাই শিউচন্দ্রিকার কাছে অজানা ছিল। অনাথালয়ে পালিতা মিনাকুমারী বলীরামপুর জুটমিলের ক্যান্টিনে কেশরপার্ক মিষ্টির হিসাব রাখার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। সেখানেই অভিমন্যুর সঙ্গে তার দেখা হয়। সরল সহজ অভিমন্যুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। সে তাকে ভালোবাসে। অনাথা মিনাকুমারী আজন্ম দুঃখের সঙ্গে লড়াই করেছে বলে অভিমন্যুর মতো রাজনৈতিক কর্মীর অনিশ্চয়তায় ভরা জীবনে জীবনযোগ করতে ভয় পায়। ঘর বাঁধতে দ্বিধা করে। কিন্তু আবেগচঞ্চল অভিমন্যু মিনাকুমারীকে নিজের করে পাবার জন্যে মিনাকুমারীর চিঠির উত্তরে চিঠি দেয় এবং তাকে গোপনে দেখা করতে বলে। কিন্তু সে চিঠি জুটমিলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদের হাতে যায় এবং শ্রমিক নেতার চরিত্রহনন করবার জন্য চিঠিটি ম্যাকলীনসাহেবকে দেয়। জয়নারায়ণপ্রসাদ শুধুমাত্র মালিকের কাছে অভিমন্যুকে অপদস্থ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাকে শ্রমিকদের কাছেও হেনস্থা করতে চেয়েছে। অভিমন্যুর জনপ্রিয়তা নষ্ট করাই কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য।

অভিমন্যু এ অপমান ফিরিয়ে দিতে পারত কারণ তার ঝোলায় মিনাকুমারীর তাকে লেখা চিঠিগুলি ছিল। কিন্তু সহিষ্ণু রুচিবান, আদর্শবান অভিমন্যু নীরবে শ্রমিক জীবন থেকে সরে এসেছে। গ্রামে আধিয়ারদের সঙ্গে একত্রে ফসলের লড়াইয়ে অংশ নিয়ে কর্মক্ষেত্র বদল করে। সে আহত হয়। আহত অবস্থায় জানতে পারে গান্ধীজীর মৃত্যু হয়েছে। উত্তেজিত অভিমন্যু এ সংবাদে বিপর্যস্ত হয় এবং মারা যায়। রাজনৈতিক বন্ধু শিউচন্দ্রিকা তাকে দাহ করবার সময় ঝোলা থেকে মিনাকুমারীর লেখা চিঠিগুলি পায়। এবং সেখান থেকে সব সত্য জানতে পারে। শিউচন্দ্রিকা মিনাকুমারীকে চিঠিগুলি পাঠিয়ে দেয়। শুরু হয় মিনাকুমারীর অনুশোচনা ও পরিণামে আত্মহত্যা। এভাবেই শেষ হলো অভিমন্যু–মিনাকুমারীর অসম্পূর্ণ প্রেমের ট্র্যাজেডি। আর শ্রমিক নেতা শিউচন্দ্রিকার ট্র্যাজেডিও এঁকেছেন সতীনাথ। একজন সৎ নিষ্ঠাবান শ্রমিক নেতা শিউচন্দ্রিকা শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হতাশ চরিত্রে পরিণত হয়েছে। তার ব্যক্তিজীবন ও রানৈতিকজীবনে কোনো বিরোধ ছিলনা। প্রচণ্ড নিষ্ঠার সঙ্গে তিলতিল করে সে জুটমিলের শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুলেছে। মালিকের অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে শ্রমিক সংগঠনকে। আর ব্যক্তিগতভাবে অভিমন্যুকে সে ভালোবাসত। অভিমন্যুর শ্রমিকপ্রীতি, কর্মপ্রচেষ্টা, জনপ্রিয়তা, আত্মত্যাগের আবেগ-প্রভৃতি গুণের জন্যই শিউচন্দ্রিকা শ্রমিকদরদী অভিমন্যুকে ভালোবাসত। একদিকে অতি প্রিয় অভিমন্যুকে হারানোর বেদনা অন্যদিকে শ্রমিক-স্বার্থবিরোধী মালিকের চক্রান্তে রাজনীতির ভয়ঙ্কর বিনষ্টি শিউচন্দ্রিকার মতো আদর্শনিষ্ঠা নেতাকে হতাশ করেছে। সতীনাথ দেখেছেন আদর্শবান অভিমন্যু ও শিউচন্দ্রিকারা স্বাধীনতার অব্যবহিতকালের মধ্যেই রাজনৈতিকজীবনে কিভাবে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তিনি আরো দেখেছেন স্বাধীন ভারতবর্ষে মালিক - জমিদার - থানার দারোগা প্রভৃতির চক্রান্তে কৃষক শ্রমিকের গণআন্দোলন কিভাবে পরাভূত ও ব্যর্থ হয়। স্বাধীন-ভারতের সাধারণ দেশবাসীর এই পর্যুদস্ত অবস্থা তাঁর লেখকসত্তাকে জাগিয়েছে। শাণিতবঙ্গ, ক্ষুরধার শ্লেষে তিনি 'জাগরী'র বিলু-নীলু, 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসে অভিমন্যু-শিউচন্দ্রিকা এবং 'ঢোড়াই' চরিমানসের দুটি চরণে ঢোঁড়াইদের মতো সৎ আদর্শবান প্রকৃত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মীদের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন: 'সরকার মাথায় এখন রাজ্যের ঝঞ্ঝাটের বোঝা, পড়ে পাওয়া আজাদীর নানারকম ফ্যাকড়া। কিন্তু এই কমাসে রাজ্যের ঝঞ্ঝাটের বাধা না মেনে এক হাঁটু কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে পোঁতা শ্যামলধানের চারাগুলি সোনার বোঝারভারে এলিয়ে পড়েছে আলের উপর। ধানের ধর্ম ধান মেনেছে। আর জমিদারও তার ধর্ম ভোলেনি। এ পাঁচমাস অযোধিয়া চৌধুরী নিজে সে মঘৈলী থানায় দারোগা সাহেবকে ভেটপাঠাতে ভোলেনি একদিনও। পুলিশ নিমকহারাম নয়, যার নুন খায় তার গুণ গায়। সেই ভরসাতেই অযোধিয়া চৌধুরী জমি থেকে বেদখল করতে সাহস করেছে অগণিত রায়তদের যারা বংশ পরম্পরায় এই জমিতে অশ্রু আর ঘামের রস যুগিয়ে এসেছে।'

পুলিশ আর অযোধিয়া চৌধুরীর লেঠেলরা রায়তসহ অভিমন্যুর ওপর আঘাত হেনেছে। আহত অভিমন্যু অজ্ঞান হয়ে ক্ষেত্রে আলের উপর পক্ষে গিয়েছিল। এসব ঘটনাথেকে শিউচন্দ্রিকার মতো সতীনাথও বুঝেছিলেন

সতীনাথ নিজে এপর প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। খুঁজে নিয়েছেন সত্যান্বেষণের অন্য এক পথ। নিবিড় অভিজ্ঞতা তাকে জীবন দ্রষ্টা রূপে সমৃদ্ধ করেছিল। প্রতিটি লেখায় নিজেকে খুঁজেছেন ; খুঁজেছেন প্রকাশভঙ্গির নতুন নতুনবানী।

"চিত্রগুপ্তের ফাইল" উপন্যাসে রাজনীতি ঘটনা হিসেবে স্থান পেলেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমনের অন্তর্মুখী অভিব্যক্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ওপরই লেখক গুরুত্ব দিয়েছেন। সে তুলনায় পরবর্তী উপন্যাস "ঢোঁড়াই চরিতমানস" প্রথম ও দ্বিতীয়চরণে রাজনীতি অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এই উপন্যাসে রাজনীতি মানুষকে ও তার চির পরিচিত সমাজকে বদলেছে। এই দ্বান্দ্বিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাজনীতি ও সমাজনীতির গুরুত্ব অঙ্গাঙ্গি জড়িত ; কারণ বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের পর থেকেই ভারতবর্ষের সমাজ ও মানুষ ক্রমে রাজনীতির উত্তাল আবহাওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। তিরিশ চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক আলোড়ন সমাজের ভিত্তি ভূমিকে আঘাত করেছিল। তাই এ সময়ের সমাজ বলতে রাজনীতি জড়িত বা রাজনীতি নির্ভর সমাজকে বুঝতে হবে। সতীনাথ এই চল্লিশের দশকের সমাজজীবনের সঙ্গে অভিজ্ঞতা সূত্রে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাঁর মতো দেশ-কাল ব্যক্তি সম্পর্কে সচেতন লেখকের পক্ষে সমকালকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সত্যনিষ্ঠা ও জীবনসন্ধিৎসায় সতীনাথ বাস্তব সচেতন লেখক। তাই স্বাধীনতার পরে রাজনীতির জটিলতায় হতাশ হয়ে রাজনীতি ত্যাগ করে সাহিত্যে সমর্পিত প্রাণ হয়েও বাস্তব জীবন, জনজীবন ও সমকালীন সময় নির্ভর সমাজকে কোনোমতেই অস্বীকার করতে পারেন নি। রাজনীতি জনপ্রিয় বিষয় এবং প্রথম উপন্যাসের সাফল্যের পিছনে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ একটা বড়ো কারণ বলেই তাঁর পরের উপন্যাসগুলিতে রাজনীতি প্রসঙ্গ অনেক বেশী প্রাধান্য পেয়েছে মনে করা এই কারণেই ঠিক হবে না। আরও ঠিক হবে না এই কারণে, যে সতীনাথ কোনোদিনই সস্তা প্রশংসায় আগ্রহী ছিলেন না ; বরং তাঁর কাছে তা যে কত অনাদরের ছিল তা বুঝতে পারা যায় "চিত্রগুপ্তবাণী" প্রতিষ্ঠানের সাহিত্যচর্চায় আকর্ষণ সৃষ্টি সম্পর্কে যে ব্যঙ্গ নির্ভর নির্দেশটি ব্যক্ত হয়েছে তা পড়লে—

'(ক) একটি গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক ঘটনা গল্পের ভিতর ঢুকাইয়া দিবেন।

(খ) খানিকটা রাজনীতি (ফিকা গোছের) গল্পের ভিতর যেন স্থান পায়।

(গ) সাধারণ বুদ্ধিতে আবিশ্বাস্য বা অসম্ভাব্য মনে হইলেও স্থূল নাটকীয় উপাদান বহুল পরিমাণে গল্পের ভিতর দিতে ভুলিবেন না।

(ঘ) শোষক ও শোষিতের কথা যেমন করিয়া হউক গল্পের ভিতর আনিতে চেষ্টা করিবেন।' (সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ২২৩)।

এই উক্তি থেকে সতীনাথের মনের গতি বোঝা অসম্ভব নয়। রাজনীতি তাঁর কাছে বহিরঙ্গ বিষয় নয়, তা জীবন প্রত্যয়ে সত্য। মানুষকে পরিপূর্ণ সত্যের আলোকে দেখা ও প্রকাশ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাই 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর তো উপন্যাস তাঁকে লিখতেই হতো। রাজনৈতিক কর্মী হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে যে মাটিঘেঁষা সজীব মানুষগুলিকে তিনি দেখেছিলেন তাদের কথা না লিখলে যে তাঁর রাজনৈতিক জীবন পূর্ণতা পেত না তা তিনি বুঝেছিলেন। তাই বোধহয় তিনি সক্রিয় রাজনীতি ছাড়ার কারণ হিসেবে

আপাত এড়ানো কথাটি বলেছিলেন 'কংগ্রেসের কাজ স্বাধীনতা লাভ করা ছিল। সে কাজ তো হাসিল হয়ে গেছে। এখন 'রাজকাজ' ছাড়া কোনো কাজ নেই আর।'[১] সেই 'রাজকাজ' বড়ো বড়ো কংগ্রেস কর্মীর। সেখানে সতীনাথের পক্ষে মন মেলানো সম্ভব নয়। তাই প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরও কাজ ছিল। তিনিও দায়বদ্ধ ছিলেন। সে দায় সময়ের সঙ্গে পা ফেলে বদলাচ্ছে যে মানুষ, বিবর্তিত সেই মানুষের কাছে ও সমাজের কাছে। মানুষকে দেখার জীবনদর্শনে গভীর আস্থা নিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে ঢোঁড়াই নামের পরিচিত মানুষটিকে তিনি জেনেছিলেন, কাছে পেয়েছিলেন। তাকে বোঝবার ও সকলের কাছে বোঝাবার চেষ্টায় এক নতুন বাণী প্রকরণে লিখলেন "ঢোঁড়াই চরিতমানস" দুটি চরণ। নিজেই বলেছেন—'আমার কাজ হলো চেনা ঢোঁড়াইকে এমনভাবে বদলানো যাতে সে যাতে সারা দেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাদের প্রতিবেশের পূর্ণতম সম্ভাবনাটুকু তার চরিত্রের মধ্যে দিতে হবে।....গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াবার সময় ঐ শ্রেণীর লোকের চরিত্রে, যেখানে যা কিছু ভাল নজরে পড়েছিল, সেই সব সদ্‌গুণগুলো দিয়ে তাতমাটুলির ঢোঁড়াইকে সাজাতে আরম্ভ করলাম।"[২] শুধু তাই নয়, "ঢোঁড়াই চরিতমানস" রচনার জন্য লেখকের মন দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুত হচ্ছিল। নানাভাবে সংগ্রহ করেছিলেন এই জীবন সম্পর্কে তথ্য। তাঁর পরিচিত চোখে দেখা ঢোঁড়াই নামের মানুষটিকে যত দেখছিলেন ততোই ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠছিল—'ইচ্ছা ছিল আমার জ্ঞানে গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমনভাবে বদলাতে দেখেছি, কেমনভাবে তারা ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসাবে নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে, তাই নিয়ে একখান উপন্যাস লিখব। সমগ্র গ্রামীণ সমাজ তুলে ধরবার ইচ্ছা। মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে।"[৩]

এখানে লক্ষণীয়, 'কেমনভাবে ভুল ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে' সাধারণ মানুষ 'নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে'—এই সামাজিক ও ব্যক্তির 'অধিকার সচেতনতা' লেখককে প্রবল প্রেরণা দিয়েছে ঢোঁড়াই-এর পরিবর্তিত জীবন চরিত লিখতে। আর ব্যক্তিজীবন ও সমাজের অব্যাহত চলমান গতির দ্বান্দ্বিক রূপটির মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা মানুষের অধিকার চেতনাকে চিরন্তন মানবিক গুণে সমৃদ্ধ করে তোলার তাগিদ অনুভব করেই 'মানস সরোবরের' মতো গভীর ঢোঁড়াই-এর চরিত লিখতে উদ্যোগী হয়েছেন। সারাজীবন—জন্ম থেকে শেষবারের মতো পাক্কীর পথ ধরে জাতপাতহীন শ্রেণী বর্ণ বিহীন সেই কারান্তরালে নিজেকে সঁপে দেওয়া পর্যন্ত ঢোঁড়াই শুধু পাল্টে গেছে বার বার। আবিষ্কার করেছে নিজের ক্ষমতার ঐশ্বর্যকে। ব্যক্তি ঢোঁড়াই রূপান্তরিত হয়েছে গণপ্রতিনিধি ঢোঁড়াই-এ।

এর পরেও আর একটা চরণ লেখার ইচ্ছে ছিল সতীনাথের। কারণ লেখক তৃপ্ত হতে পারেন নি। পারা সম্ভব নয়, মানুষকে দেখার কি শেষ আছে? এই অতৃপ্তির কারণও ব্যক্ত হয়েছে লেখকের নিজের কথায়—'এতসব করে, শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াই-এর চরিত্র যা দাঁড়াল তাতে আমি মোটেই তৃপ্তি পাই নি। চেষ্টার ত্রুটি আমার ছিল না ; কিন্তু যে বিশালতা ও গভীরতা দিতে চেয়েছিলাম সে চরিত্রে, নিজের অক্ষমতার জন্য তা দিতে পারি নি। ঢোঁড়াই-এর চরিত্র মানস সরোবরের ন্যায় বিশাল ও গভীর। সেইটাকে চেয়েছিলাম

এক গণ্ডুষ গল্পের মধ্যে ধরতে। পারি নি। এক সময় ভেবেছিলাম যতকাল বাঁচব ঢোঁড়াইদের মনের পরিবর্তনের রূপরেখা এঁকে যাব। মনে মনে এর পরের খণ্ডের নাম হবে ঠিক করেছিলাম 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত।'

'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত' আর লেখেন নি। ঢোঁড়াই সম্পর্কে জানা তাঁর অতলস্পর্শী হয় নি বলেই 'নিজের অপর্যাপ্ততা'র পরিমাণ মেপে লেখা থেকে বিরত হয়েছেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে সতীনাথ অগ্রজ শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে ৩০ শে জুন, ১৯৭২, চিঠিতে জানিয়েছেন এই না লেখার কারণ নিয়ে সতীনাথ তাঁর স্নেহধন্য ফণীশ্বরনাথ রেণুকে অনেক কথা বলেছেন। "জাগরী"র মতো "ঢোঁড়াই চরিতমানস" অভিনন্দিত হয় নি বলে লেখকের মনে ক্ষোভ ছিল। কারণ তাঁর মতে এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।[৫]

সেই চিঠি অনুসরণ করে আরো জানা যায়, তৃতীয় চরণে 'স্বাধীনোত্তর রাজনৈতিক বিকাশ সম্বন্ধে' লিখতে চেয়েছিলেন—'স্বাধীনতার পর দেশশাসনে বিশৃঙ্খলা, আমলাতন্ত্র, সরকারী অব্যবস্থা, পুরাতন রাজনৈতিক কর্মীদের সরকারী অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা, অর্থলোলুপতা স্বার্থপরতা, রাজপুত-ভূমিহার-কায়স্থ-হরিজন সমস্যা এই সব লেখার ইচ্ছা ছিল ঢোঁড়াই তৃতীয় চরণে।'[৬]

লেখক নিজেও এই না লেখার কারণ সন্ধানে নিজের ' গোপন আমি'কে বার বার প্রশ্ন করেছেন;সঠিক উত্তর কি পেয়েছিলেন?

কিন্তু আমরা পাঠকেরা যা পেলাম, যে দুটি চরণে ঢোঁড়াই-এর জীবনের বিবর্তনকে জানলাম, ত-ই বা কম কিসের! "ঢোঁড়াই চরিত" পড়ে পাঠকের কি মনে হবে না বিশ শতকের তিরিশ চল্লিশের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক কিম্বা তার চেয়েও বেশি মানব বিবর্তনের ইতিহাস উপন্যাসের আধারে নতুন পথে জীবনসন্ধিৎসার দ্বার খুলে দিয়েছে!

বিশ শতকের তিরিশের দশকের বাংলা উপন্যাসের প্রায় অধিকাংশ নায়ক, চরিত্র জীবন দ্রষ্টা। তারা জীবনকে দেখেছে। দেখার আগ্রহে পথ চলেছে। অপু দেখেছে জীবনকে, প্রকৃতিকে ও মানুষকে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি ও মানুষকে দেখার অনুরাগের দৃষ্টি অপুর দেখায় ফুটে উঠেছে। সেই দেখায় সে নিজেকে অন্বেষণ করেছে—আর সব পিছনে পড়ে থেকেছে। "পুতুল নাচের ইতিকথা"য় শশী দেখে সেই তাল গাছটার উঁচু ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে জীবনের গতিকে। এই চলমান জীবনধারা থেকেই সে আত্মানুসন্ধানী হয়। "ধাত্রীদেবতা"র শিবনাথ বা "গণদেবতা" "পঞ্চগ্রামে"র দেবু ঘোষও দেখেছে তার চারপাশের পরিবেশকে জনজীবনকে। সে উপলব্ধি করেছে দেশের মূল শক্তির উৎস কি ভাবে ক্রমাগত পরাজিত হচ্ছে প্রকৃতির ভয়ঙ্করতায় আর ক্রুদ্ধ, লোভী মানুষের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতায়। শশী, অপু, দেবুঘোষ বা শিবনাথ এই প্রত্যক্ষ দেখা থেকে নিজের মনের মতো জীবনদর্শন গড়ে নিয়েছে। সতীনাথের ঢোঁড়াই, অপু, শশী ও শিবনাথের মতো মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানসিক পরিবেশের সাহায্য পায় নি বা দেবুর মতো সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার মোহময়তায় ও নবসমাজ চেতনায় অভিভূত মানসিকতার পরিবেশ থেকে উঠে আসে নি। বরং সে

‘‘হাঁসুলিবাঁকের উপকথা’’-র করালীর মতো আদিম আঞ্চলিক ভৌম জীবনের গোষ্ঠীবদ্ধ সংস্কারের ধারাকে আঁকড়ে এসেছে এতকাল। ‘‘পদ্মানদীর মাঝি’’র কুবেরের মতো সে আদিম জৈবিক জীবনধারার, দারিদ্র্য,-ক্ষুধা-বঞ্চনা-অসহায়তার মধ্যে আবদ্ধ সমাজের মানুষ। কিন্তু ঢোঁড়াই করালী বা কুবের নয়। করালী কিন্তু ঢোঁড়াই-এর মতো জনপ্রতিনিধি হতে পারে নি, কুবেরের জীবনদ্বন্দ্ব ব্যক্তির জৈব কামনার। ঢোঁড়াই-এর তা নয়। ঢোঁড়াই শুধু দেখে না, শুধু আত্মদর্শন লাভে তৃপ্ত নয় ; ঢোঁড়াই-এর ভূমিকা বিদ্রোহীর। তার বিদ্রোহ পরিবর্তিত জীবন ও সমাজের স্বপ্নকে সার্থক করার। সে নিজে এই বদলানোর কাজে শুধু অংশীদার নয় ; নেতৃ-স্থানীয়। তার কাছে সমাজজীবন স্থাণু নয়। আঘাতে সংঘাতে অভিজ্ঞতায় সে নিজে বদলেছে, সমাজকে বদলাতে সাহায্য করেছে বিদ্রোহ ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। কুবেরের মতো ভাগ্যকে মেনে নিয়ে সে বলে না ময়নাদ্বীপে তাকে আজ হোক, কাল হোক যেতেই হবে। হোসেন মিয়া তার জীবনের বিধাতা, তাকে সে কিছুতেই এড়াতে পারবে না। ঢোঁড়াই অদৃষ্টবাদী নয়। সে শুধু ব্যক্তির পরিবর্তনে শেষ হয়ে যায় নি, সমগ্র জন প্রতিনিধিত্বেই তার পূর্ণতা। তাই ঢোঁড়াইকে তাতমাটুলি থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিতে হয় বিসকান্ধায়। কিন্তু সেখানেও নয়, সংগ্রাম থেমে থাকে না। তাকে এগিয়ে যেতে হয়, আজাদ দস্তায়, ক্রান্তিদলে ; ‘রামায়ণে’র জগতে আত্মস্থ হতে চায়, কিন্তু তাতে তার শেষ হয় না। পাক্কীর পথ ধরে সে কি একবার ফিরতে চেয়েছিল তাতমাটুলিতে রামিয়ার কাছে! কিন্তু যে দেখেছে পথকে সে কি পিছু ফিরতে পারে? এ পথ তার অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানরাজ্যে নিয়ে আসার যোগসূত্রকারী। এ পথ দিয়েই একদিন ঢোঁড়াই পেয়েছিল বৃহৎ জীবনের সন্ধান, গাড়ীর চালক ঢোঁড়াই এসেছিল কৃষিজীবনের পথে। অভিজ্ঞতার বিশাল সঞ্চয় ভাণ্ডার পেয়েছিল এইখানেই। এই পথ দিয়েই এসেছিল ভলেনটিয়ার, এ পথেই ঢোঁড়াই দর্শন লাভ করেছিল মহাত্মাজীর। এ পথেই সে গিয়েছে আজাদ দস্তায়। সবশেষে এই পথ ধরেই সে ফিরে গেছে ভারতবর্ষের শ্রেণী-জাত-বর্ণ হীন বিশাল কারাগারে—ভারতবর্ষের বিশাল জনজীবন যেখানে আবদ্ধ হয়ে একত্রিতভাবে তপস্যা করে চলেছে গণমুক্তির, সেইখানে। ঢোঁড়াই পরিবেশ ও মানুষের দ্বান্দ্বিক বিবর্তন থেকে হয়ে উঠেছে ‘ঢোঁড়াইরাম’। এই বিশালতা থেকেই ঢোঁড়াই হয়ে উঠেছে অনন্য গণনায়ক। করালী, বা কুবের কেউই এই জন প্রতিনিধিত্ব করে নি। একমাত্র গোরাই পেয়েছে এই বিপুল স্বীকৃতি। সে হয়েছে ভারত সন্ধানী মহানায়ক। কিন্তু গোরার সময়, সমাজ পরিবেশ ও ঢোঁড়াই-এর সময় সমাজ ও পরিবেশ এক নয়। গোরা উনবিংশ শতাব্দীর সমুন্নত ভাবধারায় বিশ্বাসী ; জাতীয় জীবনের সামগ্রিক উন্নতির প্রচেষ্টাকে সে করেছে প্রত্যক্ষ। ঐতিহ্যময় ভারতবর্ষের আস্তিকরূপটি তাকে মানস শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করেছে। পাশ্চাত্য ভাবধারার উদার মুক্তি সে পেয়েছে শিক্ষার সাহায্যে। তাছাড়া সে উচ্চবিত্তসম্পন্ন আদর্শনিষ্ঠ হিন্দুসমাজের জল হাওয়ায় তৈরী করেছে নিজেকে ; সাহায্য পেয়েছে বন্ধু বিনয়, মানসপ্রতিমা সুচরিতার ব্যক্তিত্বময় রুচির সহচার্য আর আনন্দময়ীর মত যথার্থ ধরিত্রীসমা মাকে।[7] একেবারে ভিন্ন জীবনধারায় বঞ্চিত মাতৃস্নেহে, দারিদ্র্যে, অজ্ঞতা, অশিক্ষা আর অজস্র আদিম সংস্কারে আবদ্ধ তাৎমাসমাজের মানুষ ঢোঁড়াই। অনিশ্চিত চাঞ্চল্যে বিক্ষিপ্ত

বিংশ শতাব্দীর অবক্ষয়জর্জরিত ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বঞ্চিত সমাজের মানুষ ঢোঁড়াই। "গোরা"র লেখকের সমুন্নত মানসধারা এই শতকের চল্লিশের সক্রিয় রাজনীতি সচেতন লেখকের মধ্যে সন্ধান করা বৃথা। সুতরাং সব অবক্ষয়, অসহিষ্ণুতা, বঞ্চনা ও সংশয়ের সঙ্গে অবিরত সংগ্রামে রত অজ্ঞ অশিক্ষিত হীন দরিদ্র ঢোঁড়াই বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বান্দ্বিক বিবর্তনেই পেয়েছে গণ নায়কত্ব। সমস্ত রকমের ভঙ্গুরতা, বিক্ষিপ্তি আর জীর্ণতার মাঝখান থেকে ঢোঁড়াই হয়ে উঠেছে পূর্ণ মানুষ ; সমবেত জনজীবনের প্রতিনিধি।

তুলসীদাসের 'রামচরিত মানসে'র রীতিতে সতীনাথ রচনা করেছেন "ঢোঁড়াই চরিত মানস"। "জাগরীর মতো শিল্পবৈচিত্র্যেও উপন্যাসটি আকর্ষণীয়। লেখক ঢোঁড়াইকে গড়তে চেয়েছিলেন রামচন্দ্রের আদলে, কারণ দেশের সাধারণ মানুষের ভক্তি রামচন্দ্রের চরণে। উত্তর ভারতের মানুষের মনে রামের চেয়ে বড়ো আদর্শ চরিত্র আর কেউ স্থান পায় না। ঢোঁড়াইকে করতে চেয়েছিলেন এযুগের রামচন্দ্র, যিনি 'নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে'। বাইরের গঠনেও রামায়ণের সাতকাণ্ডের মতো তিনি অংশগুলির নাম করেছিলেন 'আদি', 'বাল্য', 'পঞ্চায়েত', 'রামিয়া', 'সাগিয়া', 'লঙ্কা' ও 'হতাশাকাণ্ড'। মহাকাব্যের বিশাল পটভূমিতে, অজস্র ঘটনা কাহিনী ও চরিত্রের সমাবেশে বিশালতা সৃষ্টি হয়ে করুণ ও শান্তরস সংমিশ্রণে যে মহাকাব্যিক রসাস্বাদ ('বিশালরস') আনে তারই প্রকাশ ঘটেছ "ঢোঁড়াই চরিতে"। কিন্তু এসব প্রকরণসর্বস্ব না হয়ে জীবনের আধারে মিলেমিশে একাকার হয়েছে। মহাকাব্যের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্তির গভীরতায় ঢোঁড়াই-এর চরিত্রের বিবর্তন ও সমাজের পরিবর্তন ব্যাপ্তি লাভ করে সমগ্র ভারতবর্ষের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের যথার্থ রূপকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। এমনিভাবে 'পুরনো মহাকাব্যের ফ্রেমে' লেখক বাঁধতে চেয়েছিলেন ঢোঁড়াইকে। হয়তো এ গঠনভঙ্গি বর্তমানকালের উপন্যাসের উপযোগ্য নির্মিতি প্রকরণ নয় ; কিন্তু উপন্যাসের মানসগঠনে এই ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিটির আবেদন আজও একইভাবে রয়েছে। জনকল্যাণকামী জীবনধারার চলমান প্রবাহকে এর চেয়ে আর কোন ভিন্ন ফ্রেমে লেখক ধরতে পারতেন বা তাতে সফল হতেন? অর্থাৎ, বিষয় বক্তব্যে, চরিত্রচিত্রণে, সমাজ বিবর্তনের রূপরেখা ধারণের উপযুক্ত শৈলী মহাকাব্যিক গঠনকৌশল ছাড়া আর কিছুতেই যথার্থ হয়ে উঠতে পারত না।

ঢোঁড়াই-এর জন্ম তাৎমাটুলিতে বুধনির কোলে। তাৎমারা জিরানিয়া বা জীর্ণারণ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদি বাসিন্দা নয় ; অনেকদিন আগে তারা এখানে এসে উঠেছিল। কোনো এক কালে তারা জাতিতে ছিল তাঁতি আজ সে পরিচয় বিলীয়মান কিন্তু সেই অতীত জীবনের গৌরব আজও তারা স্মরণ করে। তাদের শিল্প নিদর্শনে ঈর্ষান্বিত হয়ে ইংরেজ বাহাদুর পূর্ব-পুরুষের বুড়ো আঙুলগুলো কেটে নিয়েছিল। এখনকার তাৎমারা অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝে—এ ব্যবস্থা ভালোই হয়েছে, কেউ আর তাদের ঠকিয়ে টিপসই দিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু জীবনের কাছে তারা তো ঠকেই আছে। আর ঠকতে ঠকতে অসহায় বিপন্ন। দারিদ্র্য সীমারেখার নীচের বাসিন্দা তারা। আজ একটা সামান্য গোষ্ঠীমাত্র হয়ে টিকে আছে। পুরনো তন্ত্রিমাছত্রীর গৌরব ম্লান হয়ে এসেছে। এদেরই একজন বুধনী আর

তার স্বামী। ঢোঁড়াই-এর বাপের প্রয়োজন শুধু ছিল তার জন্মের স্বীকৃতিটুকু সত্য করে রাখায়। তাই লেখক তার নামটুকু পর্যন্ত দেন নি। কিন্তু লোকটা ভালো ছিল। তার বিশ্বাস ছিল প্রবল, বুধনিকে সে মেনে চলত ; মুসুর ডালের পয়সাটা খরচ করে যুবরাজের আগমনের 'জুলুষ' দেখে এসে অবধি সংশয় নিয়ে অনেক বানিয়ে বুধনিকে সেদিন ভোলাতে পেরে খুশি হয়েছিল। সদ্যোজাত ঢোঁড়াইকে ঘিরে সে-ই প্রথম দেখেছিল বিশালতার স্বপ্ন। বিশ্বাস করেছিল মোটরগাড়ী 'হাওয়া পানিতে' চলে। কিন্তু মানুষটা ঢোঁড়াই-এর দুবছর বয়স না হতেই মরে গেল। বুধনী একা ঢোঁড়াইকে নিয়ে পড়ল বিপাকে। ঢোঁড়াই এখন হেঁটে শিখেছে, দাঁত উঠেছে। অর্থাৎ সহজাত দারিদ্র্য ও ক্ষুধা বুধনিকে দিশাহারা করল। শুধু তাই নয় ; তাৎমা মেয়ের যৌবন থাকতে বিধবা থাকবে কি? বাবুলাল চাপরাশির নিত্য যাতায়াতে বুধনী অনুভব করল দেহের ক্ষুধা আর নিরাপত্তা। বাবুলাল তাকে 'চুমৌনা' করবে কিন্তু ঢোঁড়াই-এর ভার নেবে না। ঢোঁড়াইকে বৌকাবাওয়ার মতো প্রায় মৌনীর কাছে রেখে বুধনী চলে গেল বাবুলালের ঘরে। ঢোঁড়াই এমনি ভাবে হলো পিতৃহারা-মাতৃ-পরিত্যক্ত। জ্ঞান হতে হতেই সে অনুভব করল মায়ের সঙ্গে মনের দূরত্ব, তাৎমা সমাজের ওপর জন্মাল ক্ষোভ। কিন্তু তাৎমাটুলি সে ছাড়ে নি ; তৈরী হলো সমাজের সঙ্গে বিরোধের সম্পর্ক। বৌকাবাওয়া তাকে করল ভিক্ষুক। জিরানিয়ার ধারে বাবুপাড়ায় গিয়ে গান শুনিয়ে সে পয়সা রোজগার করে ; কিন্তু বালক ঢোঁড়াই বুঝতে পারে শহুরে মানুষদের উপেক্ষা আর ঘৃণা ; সেখানেও মন তার বিরোধী হয়ে উঠল। সে তার নিজের সমাজকে করল প্রথম আঘাত। প্রতিবেশী ধাঙড়টুলির মানুষদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গাঢ় হলো, সে নিল পাক্কীতে মাটিকাটার কাজ। তাৎমাদের জাতব্যবসা ঘরামির কাজ আর কুয়োর বালি ছাঁকা—বছরের অধিকাংশ সময় বসে থেকে কয়েকটা দিন মাত্র এই কাজ নিয়ে অন্ধ আবেষ্টনে দারিদ্র্যকে লালন করার গৌরববোধকে ঢোঁড়াই আঘাত করল। নিজের তাৎমা সমাজ উঠল ক্ষেপে। ধাঙড় বা 'কিরিস্তান'দের সঙ্গে তাদের চিরকালের বিরোধ। সেই ধাঙড়দলের শুক্রার 'সন্‌ বেটা' হলো ঢোঁড়াই ; পাক্কীতে কাজ নেওয়া—এসব সহ্য না করে তাৎমা মাহাতোরা চক্রান্ত করে বৌকাবাওয়ার থান জ্বালালো। মনে মনে ঢোঁড়াই ক্ষেপে উঠল। কিন্তু পুলিশের কাছে কারুর নাম না বলে মাহাতো পঞ্চায়েতের ওপর প্রথম আঘাতটা এমনি ভাবে ফিরিয়ে দিলে ঢোঁড়াই। লেখক এই অংশের নামকরণ করেছেন 'ঢোঁড়াই-এর যুদ্ধ ঘোষণা'। এ যুদ্ধ জীর্ণ সংস্কার ও সেই গড্ডলিকার স্রোতে যে মানুষগুলো এসে ঠেকেছে মজা জলার ধারে সেই মানুষ ও সমাজের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিরোধের এই শুরু। এই বিরোধ শুধু তাকে আত্মশক্তি দেয় নি, গোটা তাৎমা সমাজও ঢোঁড়াই-এর কাছে আহত হয়ে নিজেদের ভুল বুঝতে শিখেছে ধীরে ধীরে।

এই নিম্নশ্রেণীর গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষগুলি আবার নিজেদের মধ্যেই বর্ণ বৈষম্যকে সংস্কারের মতো আঁকড়ে থেকেছে। সোনবর্গা থেকে আগত মরগামার তন্ত্রিমাদের সঙ্গে জিরানিয়ার তাৎমাদের করণ-কারণ চলে না। মরগামার তাৎমারা পৈতে ধারণ করেছে জানতে পারে তাৎমাটুলির ছেলের দল। ঢোঁড়াই নিজের সমাজের রীতি ভেঙ্গে পৈতে নিল, ছেলের দলকেও উৎসাহিত করল। এমনিভাবে মাহাতো নায়েবদের অস্বীকার করতে করতে ঢোঁড়াই

হয়ে উঠল তাৎমাটুলির নেতা। এছাড়া তেরোদিনে শ্রাদ্ধের কাজ করেও ঢোঁড়াই আর ছেলের দল গ্রামের বুড়ো পঞ্চায়েত, মাহাতোর আজন্মের সংস্কারকে আঘাত করেছিল। সমাজের প্রাথমিক ওজর আপত্তি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে নি। মাহাতোরা তাদের পুরনো তেজ শক্তি ক্ষমতা হারাতে বসেছে। ঢোঁড়াই বৌকাবাওয়ার মনের ইচ্ছে পূরণ করে 'ভকত', বা 'বাওয়া' হলো না। গোঁসাইজীর চাদর পেয়েও সে বাওয়া হবার সাধনা করে নি। মাহাতোর খোঁড়া মেয়ে ফুলঝরিয়ার সঙ্গে ঢোঁড়াই-এর বিয়ে দেবার ইচ্ছায় মাহাতোগিন্নির আদর যত্ন বাড়ল, মাহাতো নীরবে সহ্য করে নিল ঢোঁড়াই-এর দেওয়া সামাজিক আঘাত। কিন্তু ঢোঁড়াই কোনো আকর্ষণ বোধ করে নি ফুলঝরিয়ার প্রতি। তাৎমা ধানকাটানিদের সঙ্গে এল পশ্চিমের মেয়ে রামিয়া। পাক্কীর পথেই রামিয়ার সঙ্গে ঢোঁড়াই-এর প্রথম সাক্ষাত। তার জাতের তাৎমা 'ঝোটহা'দের মতো নয় রামিয়া ; সে পরিচ্ছন্ন, লাস্যময়ী হাস্যমুখী। ঢোঁড়াই মুগ্ধ হলো। নিজের জাতের মধ্যে বিবাহের রীতি লঙ্ঘন করে ঢোঁড়াই রামিয়াকে বিয়ে করল। নতুন জীবনের পথে সাহায্য করল বৌকাবাওয়ার গুলি খেয়ে পাওয়া অনেক টাকা। বাওয়া তাকে ঘর বেঁধে দিল, সে গরু কিনল। পাক্কীর মাটির কাটা কাজ ছেড়ে ঢোঁড়াই পাক্কীর পথে গরুর গাড়ী চালিয়ে ছুটল অনেকদূরে—আবার ফিরতে লাগল রামিয়ার নিশ্চিত সুখাশ্রয়ে। পাক্কী তাকে দেয় দূর দিগন্তের ইশারা। তাৎমাটুলির ঢোঁড়াই এই পাক্কীর পথেই অনেক কিছু জানল, দেখতে শিখল। কিন্তু গৃহ সুখ ঢোঁড়াই-এর নয়—একদিন বাওয়া চলে গেল অযোধ্যাজীর কাছে তাকে কিছু না জানিয়ে। ঢোঁড়াই-এর অনুপস্থিতিতে ধাঙড়টোলার কিরিস্তান সামুয়েল রামিয়াকে করে তুলল উচ্ছল, ঢোঁড়াই হলো ক্ষুব্ধ। সামুয়েল আর পঞ্চ মাহাতোর চক্রান্তে রামিয়ার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটল। রাগে ক্ষোভে হতাশায় পাগল হয়ে রামিয়াকে প্রহার করে ঢোঁড়াই ছাড়ল তাৎমাটুলি।

ঢোঁড়াই হলো সম্পূর্ণ একাকি নিঃসঙ্গ শিকড় ছেঁড়া মানুষ। সে হেরে গেছে নিজের কাছে। রামিয়ার প্রতি দুর্বলতায় তার পরাজয়। পশ্চিমের মেয়েটা যে বলেছে তার সঙ্গে ঘর করবে না। এ যে দারুণ পরাজয়। তাই পঞ্চদের বিধানের প্রতিবাদ করে নি, বেরিয়ে এসেছে সেখান থেকে। রামিয়ার কাছেও একবার প্রশ্ন করে নি—তার কি ইচ্ছে? রামিয়ার মুখ থেকে উপেক্ষার কথা শুনতে ভয় পেয়ে সে চলে এসেছে সমাজ ছেড়ে। এক দিন রাত-এক বেলা হেঁটে সে পৌঁছোল বিসকান্ধায়। মোসম্মত সাগিয়ার গৃহে 'ভূমিদাস' রূপে আশ্রয় পেল। গরুর গাড়ীর চালক ঢোঁড়াই, মাটিকাটা কাজের মজুর ঢোঁড়াই কোয়েরী-টোলায় এসে হলো নতুন অভিজ্ঞতা। জমির সঙ্গে সম্পর্ক ঘটল। বিলটার বাটাহিয়া গানে সে শুনল—খাজনা, শোষণ-পীড়ণের কথা। নিজে চোখে দেখল বাবুসাহেবের অত্যাচার। দারোগা হাকিমের সঙ্গে বচ্চনসিং, আনোখি বাবুদের যোগাযোগের পরিচয় পেল। কোয়েরিটোলাতেও সহজেই ঢোঁড়াই হয়ে উঠল নেতা। তার মনের গঠনই এইরকম। এখানে সে 'পরদেশী'। নিজের লাভ নয়, সকলের লাভের জন্যই সে বিরোধ শুরু করল বচ্চনসিং, বাবুসাহেবের সঙ্গে। ঢোঁড়াই-এর বিদ্রোহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাই তার ভয় নেই। কারণ সে জানে যে সে রামজীর কাছে কোনো পাপ করছে না, অন্যায় করছে না।' বাবুসাহেবের

গোলার ধান নিতে এসেছে আকালের সময়। তাদেরই শ্রমে এই ধানের গোলাগুলো ভরে উঠেছে। আজ দুর্ভিক্ষের সময় অনাবৃষ্টির দিনে তাদের পাওনা তারা বুঝে নিতে চায় ক্ষেতের চাষের জন্য।

এতদিন ঢোঁড়াই-এর বিরোধ ছিল নিজের সঙ্গে, নিজের সমাজের অসহায়তা ও জড়তার সঙ্গে। সেখানে তার একটা কারণ ছিল—দুখিয়ার মা (বুধনী) তাকে ছেড়ে চলে গেছে বাবুলালের ঘরে কিন্তু তার সমাজ কেন তাকে রক্ষা করল না—এই অভিমান ঢোঁড়াইকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল গোটা তাংমা জাতটার ওপর। তখন ঢোঁড়াই-এর ছিল আত্মভাবনা, সে ছিল আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু তাংমাটুলি চিরকালের জন্য পিছনে ফেলে এসে, রামিয়াকে পরিত্যাগ করে ঢোঁড়াই-এর ব্যক্তিপরিচয়ের আবরণটা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল। বাবুসাহেবের সঙ্গে ধান নিয়ে বিরোধে সে আবরণ অপসৃত হয়ে ঢোঁড়াই হয়ে উঠল আধিয়ারদের নেতা। দ্বিতীয় চরণে ঢোঁড়াই-এর আচরণ দুটি খাতে বয়ে গেছে—একদিকে সে ধীরে ধীরে জন-প্রতিনিধিত্বের পথে এগিয়েছে, অন্যদিকে সাগিয়ার নীরব জৈব কামনাহীন প্রেমের আকর্ষণ ও পশ্চিমা মেয়েটির প্রেমের স্মৃতির টানাপোড়েনে ঢোঁড়াই-এর অন্তর্লোক উদ্বেল হয়েছে ; ব্যক্তি ঢোঁড়াই-এর অতৃপ্ত প্রেম-পরিণতির স্বরূপ ও নিরাসক্ত জীবনবোধ গড়ে উঠেছে। এরপর থেকে অসংখ্য ঘটনা উত্তেজনার সঙ্গে ঢোঁড়াই জড়িয়ে পড়েছে। চাষবাস ও জমির সংস্পর্শে এসে ঢোঁড়াই দেখেছে নতুন জীবনকে। এখানে এসেই সে প্রত্যক্ষ করেছে সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার নির্মম শোষণ। এখানে অবসরের গানেও সেই শোষণ পীড়ণের চিত্র—'জমিদারের সেপাই এসেছে খাজনা নিতে, রে বিদেশিয়া। সকালবেলা ধরে নিয়ে গেছে ভাসুরকে রে বিদেশিয়া। বেঁধে রেখেছে কুঠির খুঁটিতে /— ইত্যাদি। অত্যাচার, পীড়ণ ঢোঁড়াইকে করেছে সজাগ। এখানে বিরোধ জমির জন্য ; ফসলের লড়াই। এই সূত্র ধরে সে সকলের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। কোয়েরিটোলার মাটি ঘেঁষা মানুষগুলোর দুঃখে সে অভিভূত। বাবুসাহেবের হাজার হাজার বিঘে জমি, আহারের প্রাচুর্য। অন্যদিকে আধিয়ারদের নিঃস্ব অবস্থা তাকে অন্যায় বিনাশে শক্তি জোগাল। আধিয়ারদের মনে সেই জাগাল বিদ্রোহের মনোভাব—তাদের সচেতন করে তুলল 'নিজেদের পাওনা বুঝে নিতে।'

তাংমাটুলিতে থাকতেই ঢোঁড়াই শুনেছিল 'গান্ধীবাওয়া'র কথা। তাংমাদের মতো অন্ধবিশ্বাস নিয়ে সেও বিলিতি কুমড়োর মধ্যে বাওয়ার মূর্তি দর্শন করেছিল। মোহাবিষ্টের মতো সেটি বহন করে নিয়ে গিয়েছিল সে। সেখানকার মাস্টার সাহেবের মতো বড়োমানুষ গান্ধীবাওয়ার শিষ্য সুতরাং তিনি বড়ো 'গোঁসাই' সন্ন্যাসী। ভক্তি আরো বেড়েছিল যখন দেখেছিল রেবণ গুনীর মতো মানুষ বা রুখার সময়ে তাংমা পুরুষেরা যারা নেশা ছাড়া আর কিছু জানে না তারাও মদ ছেড়েছে, গান্ধীবাওয়া 'মুসলমানদেরও পেঁয়াজ গোস্ত ছাড়িয়েছে।' মরণাধারে লবণ তৈরী করতে সকলকে একত্রিত হতে দেখেছে ; শুনেছে গান্ধীবাওয়ার আদেশ। আর কোয়েরীটোলায় এসে পেয়েছে 'বলেনটিয়ারের' দেখা, সতি-গরিয়ার উৎসব। সাগিয়াকে নিয়ে সেও গিয়েছিল গান্ধীদর্শনে। আসমুদ্র হিমাচল জুড়ে

গান্ধীজীর বিশাল আহ্বান দেশের মানুষকে অভিভূত করেছিল। নির্দিধায় গান্ধীজীর ভাবদর্শের প্রতি গ্রামের অতি অজ্ঞ মানুষেরও যে তীব্র মোহাশক্তি জন্মেছিল তা 'ঢোঁড়াই চরিতে'র মতো আর কোনো উপন্যাসে এমন ভাবে ব্যক্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। সাধারণ মানুষের অন্ধ স্বপ্নাচ্ছন্নতায় গান্ধীবাওয়া কখন যে মহাত্মাজী রামজীর সমান হয়ে উঠেছেন তা তারা জানতেই পারে না ; শুধু ভক্তি বিনম্র হয়ে তাঁর মত শোনে তাঁরই শিষ্য আর চেলাদের কাছে। তাই গান্ধীজীর বাণী স্বরূপ চিঠি বহন করে কোয়েরীটোলায় যে ভলেণ্টিয়ার আসে তাকে তারা যোগ্য সমাদর জানায়। তার বক্তৃতা, কাজকে তারা বিনা দ্বিধায় অনুসরণ করে চলে। কিন্তু তারা বোঝে 'বলেণ্টিয়ারজী' তাদের একজন নয় কাজ ফুরলেই বলেণ্টিয়ার চলে যাবে। কিন্তু অভিজ্ঞতাই এদের শেষ সম্পদ। আর বাস্তব অভিজ্ঞতা বারবার ভেঙ্গে ভেঙ্গে তাদের নিয়ে গেছে নতুন প্রত্যক্ষতার জগতে। তারা বদলেছে—অভিজ্ঞতার আঘাতে তারা নিজেদের গড়ে তুলেছে। ঢোঁড়াইরা ভেবেছিল বাবুসাহেবের ছেলে লাডলীবাবু মাস্টার সাহেবের মতো ভালমানুষ, ভলেণ্টিয়ার বুঝি দেবতা। কিন্তু অভিজ্ঞতাই এদের চিনিয়েছে লাডলীবাবুরা কেমন সুবিধাবাদী ; ভলেণ্টিয়ার তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করে ; তাদের রিলিফের জন্য তোলা চাঁদা আত্মসাৎ করে পালায়। অর্থাৎ ঢোঁড়াইরা শুধু সমকালকে চেনে নি, সমাজের শোষণ পীড়নকেই চিনতে শেখে নি, সেইসঙ্গে ভদ্র-শিক্ষিত মানুষগুলোকেও চিনতে শিখেছে। আর তারা বারবার এদের কাছেই ঠকেছে। কিন্তু তাদের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা ততোই প্রবল হয়। এইসব অসৎ অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়। তারা বুঝতে শেখে ন্যায্য অধিকার পেতে গেলে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করতে হবে। হাকিম, বাবুসাহেব, দারোগা, চেয়ারম্যান সকলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই নিজেদের পাওনা বুঝে নিতে হবে। কিন্তু সতীনাথ ঢোঁড়াইদের বিদ্রোহের সাফল্য কোথাও চিত্রিত করেন নি। পোড় খাওয়া মানুষগুলো বাঁচার লড়াইয়ে হারতে হারতেই জীবন কাটিয়েছে—এ পরাজয় ও পরাজিতের সংগ্রামের শেষ নেই।

ঢোঁড়াই পরাজিতদেরই একজন। শুধু এদের নয়, আগামী দিনের এই সব মানুষেরই একজন। সেই আগামী দিন সতীনাথের কাছে কোনো আশায় ভরা ভারতবর্ষ নয়, পূর্ণতায় গঠিত নতুন ভারতবর্ষের চেহারা তাঁর উপন্যাসে স্থান পায় নি। জীবনের যথার্থ স্বরূপ চিনতেই ঢোঁড়াইকে হতে হয়েছিল সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। আজাদ দস্তায় সে যোগ দিয়েছিল। সে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের উত্তেজনার স্পর্শে রেশমকুঠি পুড়িয়েছে— কিন্তু জীবনের জন্য তার প্রবল মায়াও অব্যক্ত থাকে নি। সে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের বিলু, অভিমন্যুদের রাজনীতিকে জানে না; সাধারণ উপলব্ধি দিয়ে যাকে সত্য বলে জানে তাকেই সে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তার স্বাভাবিক 'মানবিক প্রাণ' তাই গুটিপোকাদের জীবনের মায়ায় বিচলিত হয়, বিলটাদের এত সংগ্রামী সহানুভূতিশীল মন সত্ত্বেও মোসম্মতকে ডাইনি ভেবে অত্যাচারে সে দুঃখকাতর হয়; সাগিয়ার মতো নীরব মমতাময়ীর অর্ন্তধান সহ্য করতে পারে না। আবার সেইরকমই সহ্য করতে পারে না ধনী কৃষাণের অত্যাচার, হাকিম, আর সাহেবদের ক্রোধ, হিংসা, লোভ, পীড়ন ও রাজনৈতিক কর্মিদের সুবিধাবাদী মনোভাব। লাডলীবাবুর হাকিমের মতো ক্ষমতা পাওয়া, কলস্টর হওয়ার চেষ্টা তাদের

মতো সাধারণদের ক্রমেই অভিজ্ঞ করে তোলে। তারা বুঝতে পারে 'কাংগ্রিস মন্ত্রিত্ব ছাড়াতে, 'ছুমন্তরে ফুস বিড়াল' হয়ে গিয়েছে সব। লাডলীবাবু যে লাডলীবাবু মহাৎমাজীর অত আদরের চেলা, সে সুদ্ধ তাঁর হুকুম মানলে না, চেরমেন গিরির রোজগারের লোভে। লোকটা যে কেবল 'মুখেই মালপুয়া ভাজে' তা কি কেউ আগে ভাবতে পেরেছিল। আসল কাজের সময় কে কী মেকদারের লোক বোঝা যায়। 'ঐরু গৈরু নথু খৈরু শুনতে সবাই ভাল গোরুর গাড়ি চালায়। ...চিরকাল হাকিম পুলিশের দিকে ওরা। দেখে আসছি তো! লড়াইয়ের সময় অংরেজের পা চাটবে না তো কী, চার পেয়ে জানোয়ারগুলো যেদিকে সবুজ দেখে সেই দিকে ছোটে চরতে।' ক্রান্তিদলে এসেও ঢোঁড়াই দেখে সেই একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি। কিম্বা উত্তেজনায় একত্রিত মানুষগুলি উত্তেজনা শেষে কিভাবে লক্ষ্য ভ্রষ্ট, অসহায় দিনযাপনে ব্যস্ত। এখানে এসে ঢোঁড়াই শুধু বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে জ্ঞান সঞ্চয় করে নি; সে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন হয়েছিল। তার পরিচয় আর তাৎমাটুলির ঢোঁড়াই বা কোয়েরীটোলার ঢোঁড়াইদাস নয়— সে এখন রামায়ণজী। কনিষ্ঠ আজাদদলের কাছে আলোচিত নাম এই রামায়ণজী। সমস্ত উত্তেজনা শেষে রাজনীতির মধ্যে ব্যর্থতাকে, হতাশাকে প্রত্যক্ষ করে ঢোঁড়াই রামায়ণে আত্মস্থ হতে চেয়েছে। ঢোঁড়াই বুঝতে পেরেছে অপ্রস্তুত আন্দোলনের শেষে সুবিধাবাদী নেতারা নিজেদের স্থান চিনে ফিরে যায়। আর সত্যনিষ্ঠ সাধারণ মানুষ ঢোঁড়াই-এর মতোই নিজেদের পরিণতির শেষ দেখবার জন্য অভিজ্ঞতার পুঁজি ঘাড়ে করে দিন কাটায়। 'রামায়ণ' শুধু অভিজ্ঞতার যন্ত্রণা ভোলবার একটা আশ্রয় ঢোঁড়াই-এর কাছে। 'রামায়ণের আড়ালে গিয়েও মনের অস্থিরতা কাটে না রামায়ণজীর; ওর মধ্যে ডুবে থেকেও মনে বল পায় না। স্বাদ পায় না কিছুতে। একটা সর্বগ্রাসী উদাসীনতার ছায়া পড়েছে মনের উপর। মূল শিকড় কেটে গিয়েছে। এখন বাঁচতে হলে ছোট ছোট বিধিনিষেধ, আর বড় কথার মধ্যেই বাঁচতে হবে। প্রাণ বাঁচানোর একঘেয়েমিটুকুকেই ভালবাসতে হবে। নইলে হবে এই রামায়ণজীর হাল। সে সমান তালে পা ফেলে চলেছে দলের সঙ্গে; কিন্তু হোঁচট খেতে খেতে ছুটেছে একঘেয়েমির থেকে উদাসীনতার পথে, তারপর উদাসীনতা থেকে বিতৃষ্ণার দিকে। পথ ফুরিয়ে এসেছে। তাই আজকাল মিটিনের সময়ও সে বহুদূরে বসে থাকে রামায়ণ খুলে।' কিন্তু এভাবে কতদিন একটি শক্তিমান মানুষ বাঁচতে পারে! ঢোঁড়াইও পারে নি। এন্টনিকে দেখে রামিয়া পুত্র ভেবে আশায় বুক বেঁধে দাঁড়াতে চেয়েছিল ঢোঁড়াই। সব ভুল ভ্রান্তিকে আর একবার তলিয়ে দেখে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে অসুস্থ এন্টনিকে নিয়ে তাৎমাযুলিতে ফিরেছিল ঢোঁড়াই। কিন্তু ঢোঁড়াইদের কোনো স্বপ্নই সত্যি হয় না। শ্রেণীর অধিকারের স্বপ্ন, সংগ্রামে জয়ের স্বপ্ন, এমনকি ব্যক্তি জীবনে বাঁচার স্বপ্ন— কোনোটাই সফল হয় না। এন্টনি রামিয়া বা তার সন্তান নয়। সুতরাং ঢোঁড়াইকে ফিরতে হয়; সময়ের ব্যবধান, জীবনের পারস্পরিক ভুলভ্রান্তিতে সৃষ্ট ব্যবধান, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবের চূড়ান্ত পরিণতিতে ব্যবধান ক্রমেই বিশাল হয়— তখন অসহায় বিপন্ন ঢোঁড়াইকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। পাক্কীর পথ ধরে সে চলে জেলের দিকে, সেখানে সাগিয়া আছে ঠিকই, তার চেয়ে আরও কিছু আছে, সাগিয়ার থেকেও বড় কিছু। বিপন্ন ভারতবর্ষের চেহারাটাকে দেখার চেয়ে কারার অন্তরালে বসে

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্পর্শ বাঁচিয়ে সম্ভাবনাময় ভারতবর্ষের তপস্যা করা ছাড়া ঢোঁড়াই আর কিই বা করতে পারত।

'ঢোঁড়াই চরিতমানস' দুটি চরণেই রাজনীতি প্রসঙ্গ এসেছে। "জাগরী", "চিত্রগুপ্তের ফাইলে"র চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে রাজনীতি ও উপন্যাসে স্থান করে নিয়েছে। ভারতবর্ষের তিরিশ-চল্লিশের দশক মূলত রাজনৈতিক আন্দোলনের কাল আবার এই দুটি দশক বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তী ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই যে উত্তেজনা ও উদ্দীপনা জনজীবনের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল; সমসাময়িক জীবনধারা, সমাজধারাকে দ্রুত পালটে ফেলছিল তা তৃতীয় দশক থেকে আরও গতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে থাকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ ক্রমেই নিজেদের অজ্ঞতা, বঞ্চনা ও শোষণের যথার্থ চেহারাটাকে ধীরে ধীরে বুঝতে শিখেছিল। এর মানে এই নয় যে এর আগে আর কখনও তাদের সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় নি, তা নয়। কিন্তু এর আগে এমন সামগ্রিকভাবে এরা নিজেদের অস্তিত্বের সঙ্কটকে উপলব্ধি করে নি। করা সম্ভব ছিল না কারণ অর্থনৈতিক মন্দার তীব্রতা গ্রামের ভূমিজ মানুষগুলোকে এর আগে এত প্রবলভাবে বিচলিত করে নি। কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছিল, খাজনা ইত্যাদির চাপে ভূমিহীন হতে হচ্ছিল ভূমি নির্ভর মানুষকে। জমি চলে যাচ্ছিল একশ্রেণীর হাতে যারা ক্রমেই কাঁচা পয়সার লেনদেন ও দেশীয় ব্যবসার সুযোগ নিয়ে অর্থলগ্নী করতে পারছিল। তারাই ক্রমে "জাগরী"র ধনী কিষাণ, "ঢোঁড়াই চরিতে"র রাজাসাহেব বা "গণদেবতা"র কঙ্কণার জমিদার ও চামড়ার ব্যবসায়ী বা ছিরুপালের মতো নিষ্ঠুর শোষকের রূপ নিচ্ছিল। নতুন সামন্ততন্ত্রের এই চেহারা, দেশব্যাপী অত্যাচারের এমন অবস্থা, পুরনো সামন্তশ্রেণীর ক্ষীয়মানতা, রাজনৈতিক দলগুলির আত্মপরতা ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের প্রবল দমননীতি— সব মিলিয়ে ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানের অবস্থা তিরিশ চল্লিশের দশকে এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এর সঙ্গে এই পর্বের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথাও মনে আসে— দেশ জুড়ে অজন্মা, খরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চরমরূপ; ৩৪-এ বিহার জুড়ে ভূমিকম্প, ৪০-এর দশকে দুর্ভিক্ষ ও পরে মন্বন্তর ইত্যাদি একের পর এক ঘটনা দরিদ্র মানুষগুলিকে ক্রমেই বিপন্ন করে তুলছিল।

এছাড়া এইসব সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনও অজস্র অভিশাপ-সংস্কারে ভারাক্রান্ত। এ জনজীবনের সত্তর শতাংশেরও বেশি মানুষ শুধু শারীরিক অপুষ্টিতে পঙ্গু নয়; মানসিক পুষ্টির অভাব তাদের তার চেয়েও বেশি। সেই মানসিক অন্ধতা নিয়ে তারা নিজেদের করে ফেলছে স্বতন্ত্র গোষ্ঠিবদ্ধ। অজস্র বিভেদনীতি আর বিধিনিষেধের ভারে তারা ক্রমেই জীর্ণ হয়ে পড়েছে। এর ওপর সমাজের ওপরতলার সঙ্গে এই নীচের মানুষগুলির বিভেদ ধনবৈষম্যের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। অশিক্ষা ও শিক্ষিতের বৈষম্য এখানে সভ্য ও আদিম মানুষগুলির মধ্যে আজও দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান হয়ে আছে। গ্রামীন মানুষের সঙ্গে শহর শহরতলির মানুষের মনোভাবের ব্যবধান নীচুজাতকে ক্রমেই হীনমন্য করে ফেলছিল। আরো অসংখ্য বর্ণ, শ্রেণী, জাতি-বিভেদ তো বহুকাল ধরে পাষাণের মত

জগদ্দল হয়ে বসে এই দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষগুলিকে অন্ত্যজ করে রেখেছে। এরাও এটা ভগবানের বিধান বলে মেনে নিতে প্রস্তুত। নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে ও সমাজের দূর সীমা পর্যন্ত এই বিভেদনীতি মেনে নিয়ে তারা এতকাল জীবন কাটাতেই অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। তিরিশ-চল্লিশের দশকে এই পুরনো অন্ধ চেতনায় যে কিছুটা তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল সে কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। আর এই তরঙ্গাঘাত সৃষ্টি করবার অনেকটা সাফল্যই গান্ধীজীর। গান্ধীজীই এদেশে জন অভ্যুত্থানের প্রথম সার্থক আহ্বান করেন। অস্পৃশ্যতা মুক্তি, হরিজন আন্দোলনের ডাক এই মানুষগুলিকে মানবিক স্বীকৃতির প্রথম সুর শুনিয়েছিল। তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের আহ্বান এই সঙ্গে মিশে গিয়ে অতিসাধারণ মানুষগুলির অধিকারবোধকে কিছুটা সজাগ করে তুলেছিল। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিনিধি "জাগরী"র পরিবারটিকে রাষ্ট্রসচেতন হয়ে উঠতে দেখা যায়। দ্বিতীয় দফায় ১৯৩০-এর অসহযোগের ডাক, সত্যাগ্রহ, আইনঅমান্য সাধারণ মানুষের সীমানার প্রান্তে যে ঢেউ তুলেছিল তারই বাস্তব আলেখ্য তৈরী হয়েছে "ঢোঁড়াই চরিতমানসে"র প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে। সাধারণ মানুষ এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে কোনো কালেই সচেতন ছিলনা (আজও সম্পূর্ণ নয়), তখনও হয় নি। কিন্তু তাদের অভ্যস্ত সংস্কারবদ্ধ জীবনে একটা ঝড়ের হাওয়ার সংকেত শুনেছিল; তাকে তারা নিজেদের সুবিধে মতো ব্যাখ্যা করে নিয়েছিল ও আন্দোলনের কর্মপদ্ধতিকে নিজেদের মতো করে তৈরী করবার চেষ্টা করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ তাদের কাছে ইংরেজ রাজা-বাহাদুরের অস্তিত্বের চেয়েও তাদের অধস্তনদের চেহারাটা এত প্রকট ছিল যে সেটাকে সামলাতেই তার বেশি ব্যস্ত হয়েছিল। হাকিম দারোগা, 'কলস্টর', 'চ্যারম্যান', উকিলবাবু বা বচ্চনসিং, রাজাসাহেব, আনোখিবাবু এমনকি বাবুলাল চাপরাসী, ছড়িদার তাদের কাছে 'হাওয়াগাড়ী চালানো সাহেবদের' চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর ছিল। তাদের উত্তেজনা এদের ঘিরেই; ক্ষোভ বিদ্রোহ এদের প্রতি। 'বাদশাহী বদল', 'সার্বিকমুক্তি' এসব কথা তারা বোঝে না। এই পর্বে এরা শুধু বুঝেছিল— দিন বদলাচ্ছে, মানুষ বদলাচ্ছে। কোনো কিছু পাওনা আদায় করতে গেলে অনুরোধ আর আত্মসমর্পণে কাজ হবে না; আদায় করতে হবে সংগ্রাম করে; শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রতিরোধ তৈরী করেই সফল হওয়া সম্ভব।

"ঢোঁড়াই চরিতে" এইভাবে সাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ মানবিক আন্দোলনের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। সতীনাথ এখানে কংগ্রেস, গান্ধীবাদী বা সোস্যালিস্টদের রাজনৈতিক ইতিহাসকে উপন্যাসে রূপায়িত করতে চান নি। প্রচারমূলক রাজনীতি তাঁর উদ্দেশ্য নয়; তিনি মানুষের চেতনার পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই রাজনৈতিক সত্য ঘটনা, বিয়াল্লিশের আন্দোলনকে উপস্থাপিত করেছেন। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি স্থানীয় ঢোঁড়াইকে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন, ব্যক্তিজীবন, কৃষি নির্ভর জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিবর্তিত হয়েই গণনায়কত্ব পেতে হবে— একথা লেখক মনেপ্রাণে অনুধাবন করেছিলেন।

"ঢোঁড়াই চরিতমানসে" সতীনাথের রাজনৈতিক দৃষ্টি অন্ধ আনুগত্যে আবিষ্ট নয়; বরং সমালোচনায় দীপ্ত। লেখক নিজেও ব্যক্তিজীবনে কখনও নিজের রাজনীতি সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না অন্যান্য সহকর্মীদের, মতো। তিনি গান্ধীবাদী কংগ্রেসকর্মী হয়েও

চিন্তায় ভাবনায়, অধ্যয়নে-অনুশীলনে অন্যদলের রাজনৈতিক মতকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন তা জীবন পর্যালোচনা অংশে লক্ষ্য করা গেছে। "জাগরী" উপন্যাসে যেমন পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী নীলু-বিলু-বাবা আত্মসমালোচনা, অন্যের মতের সমালোচনা সুযোগ পেলেই করেছে; "ঢোঁড়াই চরিতমানসে"ও তেমনি সাধারণ মানুষের মনে রাজনীতির আদর্শের রূপটি কেমনভাবে ধরা পড়েছে তারও সমালোচনামূলক পরিচয় আছে। সাধারণ মানুষের কাছে গান্ধীজীর ও তার দলের ভূমিকা, আজাদদস্তার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকার স্বরূপ ও পরে নিজেদের কাছে ও সাধারণ মানুষের কাছে কিরকম সমাদৃত হয়েছিল তারও ঐতিহাসিক চিত্র এ উপন্যাসে অতিরিক্ত সম্পদ হয়ে উঠেছে। ঢোঁড়াই দ্বিতীয় চরণে এসে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি ও তার বিরোধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের আবহাওয়া দ্বিতীয় চরণে উদ্দাম উত্তাল। কিন্তু প্রথম চরণে রাজনৈতিক সম্ভাবনা শুরু হয়েছে। সেখানকার রাজনীতিতে অংশ নিয়েছে ঢোঁড়াই-এর নিজের সমাজ। বিরোধ কখনও হয়েছে ধাঙড়টোলার মানুষের সঙ্গে তাৎমা পঞ্চ মাহাতোদের আবার জিরানিয়ার শহুরে বাবুদের সঙ্গে ঢোঁড়াই-এর, রামিয়াকে নিয়ে সামুয়েল ও পঞ্চদের রাজনীতির খেলাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এখানে এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর, ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের স্বার্থসংঘাতে রাজনৈতিক বাতাবরণ সমাজের নীচুতলার মানুষগুলির আচরণও মানসিকতা পরিবর্তনের দলিল হয়ে আছে। এই সমাজেই আবার ঐক্যবদ্ধ হবার প্রচেষ্টাও দেখা যায়— গান্ধীজীর ভাবাদর্শ বিশাল চেতনা নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। দল বেঁধে মরণাধারে লবণ আন্দোলনে এগিয়ে যেতে চেয়েছে তখন রাজনৈতিক শক্তি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। আবার সাধারণ মানুষের ভীতি প্রবণতা তাদের পিছু হটিয়ে দিয়েছে যখন সাহেব দারোগা এসে তাদের মরণাধারের মাঠে যেতে নিষেধ করেছে।

দ্বিতীয় চরণে প্রকৃত আন্দোলনের একটা প্রত্যক্ষ রূপ বিসকান্ধার কোয়েরীটোলার মানুষগুলোকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু শুধু প্রেরণা নয় রাজনীতির কালকূট রূপটিও সতীনাথের পাঠকের মনকে নাড়া দেয়। শাণিত কৌতুক ব্যঙ্গে তা অসাধারণ উজ্জ্বলতা পায়। বলেণ্টিয়ারের সতিগিরিয়াকে ঘিরে বিসকান্ধার লোকের মনে উৎসাহের শেষ নেই। এই উৎসাহের অভিব্যক্তির তুলনা চলে শুধু 'রামখেলিয়ার নাচ'-এর সঙ্গে। আবার লাডলীবাবুর জনসেবার নামে আখের গোছানোর পালাও ব্যঙ্গে সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। বিহার জুড়ে ভোট হলো যখন, তখন আধিয়ারদের আশা দেওয়া হয়েছিল 'কাংগ্রিস থেকে আধিয়ারদের জন্য নতুন কানুন হবে।' কিন্তু সে তো সফল হলো না। তার পরিবর্তে লাডলীবাবুরা হলেন চেয়ারম্যান। তাদের মতে 'মন্ত্রীর গদি ছেড়ে কাংগ্রিস ভুল করেছে। আরও করবে যদি ডিস্টিবোড ছাড়ে। ... 'ন এক পাই, ন এক ভাই' বলে জেলে চলে গেলেই অংরেজ হেরে গেল আর কী! আমি তো সাফ বলে দিয়েছি যে, চেরমেনের পদ থেকে আমি ইস্তাফা দেব না। 'পাবলিসের' ভালর জন্য এসেছি এখানে যতদিন পারব সাধ্য মতো পাবলিসের উপকার করে যাব।' আজাদ দস্তায় এসে আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় ঢোঁড়াই-এর মন ক্রমেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। তার মনে হয়েছে এখানে বিভিন্ন সুবিধাবাদী মানুষেরা

এসেছিল সুযোগ সন্ধানে আর তার মতো বিশ্বাসের ভূমিতে পা পেলে পরিবর্তন প্রয়াসী মানুষেরা এসেছিল; তারা আজ ব্যর্থতায় হতাশায় তারই মতো জর্জরিত। 'ভিনদেশের রঙ বেরঙের পাখি লাল মুখো কাকতাড়ুয়া দেখে দিশাহারা হয়ে পালাচ্ছিল, সাঁঝ পড়াতে এক গাছে রাত কাটাচ্ছে। তারই নাম আজাদ দস্তা। বুলি মুখস্ত তোতা আছে, নাচনদার ফিঙে আছে, পাঁকে পাখি কাদা খোঁচা আছে। সবজান্তা ভুশণ্ডী কাক আছে।' এদের কাজটা কি? চাঁদা তোলা, অসাধুতাকে প্রশ্রয়, সক্রিয় আন্দোলনের নামে সাধারণ লোককে, ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়; দোষ ত্রুটি চাপতে ইউনিয়ন বোর্ডের ফাইল জ্বালানো; টাকার অংশ ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার তারপর একদিন দলছুট হয়ে বেরিয়ে গিয়ে আদল পালটে ফেলা—এসবই ঢোঁড়াই দেখেছে। দলের শূন্যগর্ভ পরিকল্পনা, বক্তৃতা শুনতে শুনতে ঢোঁড়াই হাই তোলে। আদর্শহীন সংগঠনের পরিণতি সত্যনিষ্ঠ কর্মীর কাছে কি দুঃসহ বেদনাদায়ক তা ঢোঁড়াই-এর ক্রান্তিদলে প্রাণ বাঁচানোর জন্য থেকে যাওয়ার চিত্র থেকে বোঝা যায়। কারণ ঢোঁড়াই এই পরিণতি চায় নি। তার রাজনীতি স্বাধীনতা প্রাপ্তির নয়; তার এ পথে আসার কারণ সত্যের পথে নিজেকে তৈরী করা ও সমাজকে পরিবর্তিত করা। কিন্তু সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। মহাকাব্যের বিশাল আধারে গণঅভ্যুত্থানের চলিষ্ণু রূপটি ধরতে চেয়েছিলেন লেখক। কিন্তু লেখক তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন গান্ধীজীর সর্বাত্মক আন্দোলন জাতীয় আন্দোলন পর্যায়ে পৌঁছোলেও সাধারণ মানুষ এ পথে শুধু উত্তেজিত হয়েছিল; তারা বিশ্বাস করেছিল 'রামচন্দ্রের অবতার মহাৎমাজী। রামায়ণের লেখার সমান তাঁর কথার ওজন।' তারা শুনতে চায় মহাত্মাজীর কথা—'মহাৎমাজীর কথা বলুন। ঢোঁড়াইয়ের ইচ্ছা হয় আরও শোনে, সব কথা শোনে। রামায়ণ শোনার পুণ্যি না থাকুক এতে। তবু একথা আরম্ভ হলে বলেনটিয়রের কাছ ঘেঁষে বসতে ইচ্ছা করে। রাবণের চাইতেও অংরেজ সরকারের উপর আক্রোশ আরও জীয়ন্ত হয়ে ওঠে।' সমাধানের পথ কিন্তু তারা পায় নি। তাই সমস্যা সেই একই থেকে গেল। সমাজের গভীরে এই আন্দোলনের শেকড় প্রসারিত না হওয়ায় উত্তেজনার সমাপ্তিতে ধর পাকড়, দলগুলিকে বেআইনি ঘোষণা করায় ব্যর্থতা প্রচণ্ড আকার নিয়েছিল। গান্ধীর ভাবমূর্তিকে নষ্ট করেছিল তাঁরই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অনুগতজনেরা। তারা মহাত্মাজী নামের যে মোহ ছড়িয়েছিল, সে মোহভঙ্গ হতে বেশিদিন লাগল না। আসলকথা গান্ধীজীর আন্দোলন ছিল ভাববাদী আন্দোলন। সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চেতনার আমূল পরিবর্তন ঘটানোর কোনো চেষ্টা এ আন্দোলনে দেখা যায় না। তিনি অস্পৃশ্যতামুক্তি, জাতিভেদ মোচনের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তনে এর প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা অর্থনৈতিক মুক্তি—দারিদ্র্য মোচন করে অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় করে গড়ে তোলা। স্বাধীনতার আগে বা স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যস্ত তিরিশ-চল্লিশের দশকেও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কোনো বিপ্লব, গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে এমন মানুষগুলোকে অন্নমুক্তির স্বাদ দেওয়া হয় নি। এ ব্যাপারে কোনো সক্রিয় সংগঠন প্রচেষ্টা পরিকল্পনা ছিল না কংগ্রেস বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির। বরং এদের অশিক্ষা, অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে গান্ধীবাদী ভলেন্টিয়ার

থেকে শুরু করে সামন্ততান্ত্রিক বচ্চনসিং সকলেই জুলুম আর শোষণ করে এসেছে। এরা শুধু ঠকেছে, হার মেনেছে, বিশ্বাস করে ভুল করে মার খেয়েছে, শোষণ আর পীড়নে এরা পেটে ও পিঠে মারের চিহ্ন বহন করে; সবুজ ধানী জমিতে নীলের জন্য দাগ পড়ে বা রেশমগুটির জন্য তাদের অজান্তে বচ্চন সিংরা জমি ইজারা দেয় মোটা টাকার বিনিময়ে। এই মানবিক আর্তির স্বরূপ ফুটে উঠেছে 'ঢোঁড়াই চরিতে'; 'আন্টা বাংলা' প্রভৃতি গল্পে। 'মরণাধারে' যার পাশে লবণ তৈরীর জন্য মাস্টার সাহেব এসেছিলেন, তারা এসেছিল—সেই 'মরণাধার' শেষ পর্যন্ত জিরানিয়ার মানুষগুলোকে 'মরণে'র কাছেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করল। নদী যার নাম জীবন, সে সতীনাথের সাহিত্যে হলো 'মরণাধার', এরই ধারে হৃতসর্বস্ব মানুষগুলো মরীচিকার পেছনে ছুটে বারবার একত্রিত হয়েছে, গান্ধীজীকে 'বাওয়া' বলে জেনেছিল ; তাঁর মহাত্মাজীররূপে তারা শক্তি পেয়েছিল। কিন্তু কি পেল? সত্যকে জানতে গিয়ে, অধিকারকে আদায় করতে গিয়ে তারা তাঁরই আদর্শ পথ অনুসরণ করেছিল। তাদের প্রতিনিধি ঢোঁড়াই রাজনীতির আদর্শে, সাহচর্যে হয়ে উঠল সত্যসন্ধিৎসু; শিক্ষার সাহায্যে হলো রামায়ণজী কিন্তু এখানেই হলো মোহ-ভঙ্গ; দেখল বিপুল আত্মশক্তির ক্ষয়, নেতৃত্বের ত্রুটি। তখন শুধুই যন্ত্রণা, গোপনে পালিয়ে বেড়ানো—নিজের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে থাকার যন্ত্রণা ঢোঁড়াই-এর। সে নিজে বদলেছে, তাৎমা সমাজের বদল দেখেছে। দেখেছে মাহাতো গাড়ী চালাচ্ছে, ফুলঝরিয়া ভিক্ষে করছে, পলটন ছাউনি পড়ায় তাৎমারা সাধের তাৎমাটুলি ছেড়ে চলে গেছে। একদিন ধাঙড় টোলা থেকে শনিচরা আর তার বউ চলে গিয়েছিল বাধ্য হয়ে; যাওয়ার আগে ক্রোধ আর ক্ষোভ প্রকাশ করে ছিল বাঁশঝাড়টাকে ধ্বংস করে। সেদিন ধাঙড় টোলার শুক্রা বলেছিল আজ হোক কাল হোক সবাইকে যেতে হবে। তাই হয়েছে। সমাজের বদল ঘটেছে; সমাজবদ্ধ মানুষের স্থানবদল, জীবিকাদল, সংস্কার ও চিন্তার বদল হয়েছে—কিন্তু এ বদল বড় দ্রুত—যেন হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ছে। এ ভাঙন ঢোঁড়াই-এর সমাজের সেই সঙ্গে মূল্যবোধের অবক্ষয়ে ভরা ভারতবর্ষের। এ ভাঙনের কথা না লিখে সতীনাথের তো অন্য কোনো উপায় ছিলনা।

"ঢোঁড়াই চরিতমানস" উপন্যাসের দুটি চরণেই সমাজ তার সামগ্রিক রূপ নিয়ে উঠে এসেছে। বিহারের বিশেষ অঞ্চলের অন্ত্যজবাসীর জীবনধারার সামাজিক দলিল হলেও লেখকের শিল্পক্ষমতার দক্ষতায় শেষপর্যন্ত তা গোটা ভারতবর্ষের অবহেলিত গ্রামীণজীবনের যথার্থ সত্য ও সার্থক চিত্র হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই গ্রামজীবনের লৌকিক রীতিনীতি, লোকাচার সংস্কারের নিখুঁত পরিচয় আর কোনো বাংলাসাহিত্যে এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হয় নি। এর মূলে আছে লেখকের জীবনদৃষ্টির গভীরতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাঁর ডায়েরী থেকে জানা যায় যে এ জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কত প্রবল, কল্পনা আর বাস্তবের টানাপোড়েনে ব্যক্তিগতভাবে তিনি এই আদিম জীবন সম্পর্কে নিবিড় অনুরাগ অনুভব করেছিলেন—'তাৎমাটুলি ধাঙড়টুলি ছোটবেলা থেকে

আমার মনে অজানা স্বপ্নরাজ্যের দুয়ার খুলেছে—ও নিয়ে না লিখে আমার উপায় ছিল না।'

. আক্ষরিক পরিচয় এ গ্রামজীবন বাংলাদেশের বাইরে বিহারে। বিহার-প্রবাসী সতীনাথের জীবনের সিংহভাগ এখানে অতিবাহিত হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মী হয়ে তিনি জেলায় জেলায় ঘুরেছেন। গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় যে সত্য উপলব্ধি হয়েছে তাকে তুলে ধরেছেন "ঢোঁড়াই চরিতমানসে"। আগের উপন্যাস "জাগরী"তেও পূর্ণিয়া ও তার চারপাশের জনজীবন, সেখানকার সাধারণ মানুষের বিয়াল্লিশের গণ অভ্যুত্থানে যোগদানের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গক্রমে পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু "ঢোঁড়াই চরিতে' প্রসঙ্গ নয়, লোক-জীবন ও তাদের পরিবর্তনের গতিপ্রবাহই লেখকের প্রধান অবলম্বন। ঢোঁড়াই-এর ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডি যেমন উপন্যাসে গভীর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে; তেমনি 'ঢোঁড়াইদের' সমষ্টিগত জীবনচেতনার তীক্ষ্ণতায় লেখকের 'মানুষকে দেখা' যথার্থই পূর্ণতা পেয়েছে। তাই ঢোঁড়াইকে একক না করে সমষ্টিচেতনার পূর্ণরূপের প্রতিনিধি করেছেন। লেখকের মনোভাব শুধু 'ঢোঁড়াই'কে নয় 'ঢোঁড়াইদের' জীবনালেখ্যের যথার্থ পরিচয় দেওয়া—'সমগ্র গ্রামীণ সমাজকে তুলে ধরবার ইচ্ছা' নিয়েই 'রাম চরিতমানসে'র অনুসরণে 'ঢোঁড়াই চরিত' রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'ঢোঁড়াই চরিত' সম্পর্কে "সতীনাথ গ্রন্থাবলী", ২য় খণ্ড, 'নিঃসঙ্গদীক্ষা' অংশে গ্রন্থ-পরিচিতি দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—'এর ঘটনাভূমি আমাদের চির পরিচিত বাংলাদেশ নয়, বিহার। এখানে নেই আমাদের অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত জীবনের কোনো ছবি। এর জগতটা গড়ে উঠছে 'অন্ত্যজ' ধাঙড় আর তাৎমাদের নিয়ে।' তাই সে সমাজের যথার্থ চালচিত্রটির আধারে পড়তে হবে ঢোঁড়াই-এর বা ঢোঁড়াইদের জীবনের ট্র্যাজেডি।

এ উপন্যাসের বাস্তব পরিবেশ, বাস্তব চিত্র, সেখানকার মানুষের আচার কৃষ্টি, জাতকলহ ইত্যাদি প্রসঙ্গে সতীনাথগবেষক সন্তোষকুমার মজুমদারের দেয়া পরিচয়টি উল্লেখ না করলে ত্রুটি থেকে যাবে—'ঢোঁড়াই চরিতমানস'-এ পূর্ণিয়ার কিছু লোকের প্রতিরূপ স্পষ্টতর। সতীনাথ তো ঢোঁড়াই প্রবন্ধে লিখেই গেছেন যে তাৎমাটুলিতে সত্যি একজন ঢোঁড়াই আছে এবং 'ঢোঁড়াই' জানত যে তাকে নিয়ে একটা বই লেখা হয়েছে। এই উপন্যাসে 'বাবুসাহেব'-এর মধ্যে দেখি পূর্ণিয়ার ধামধাহার ভূমধ্যিকারী স্বর্গত বাবুলালচাঁদকে, লাডলীবাবুর মধ্যে দেখি বাবুলালচাঁদের দ্বিতীয় পুত্র মৌলবাবুকে।...কেবল নরনারীই নয়, পূর্ণিয়ার নানা জায়গার বর্ণনা তাঁর গল্প ও উপন্যাসে আছে। পূর্ণিয়ার কুশীনদীর শাখা প্রশাখার নানাধার—মরণাধার, হীরাধার, নানাস্থান—তাৎমাটুলি ক্রীশ্চানটুলি নানা রাস্তা—পাক্কী (কোশী শিলিগুড়ি রোড) তাঁর গল্প উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। লৌকিক জীবনের রূপরেখা পড়েছে "জাগরী" ও বিশিষ্ট ভাবে "ঢোঁড়াই চরিতমাসে।"[৯] কিন্তু এসব চরিত্র, স্থান, লৌকিক জীবনচর্যা এ উপন্যাসের বহিরঙ্গ শোভা হয়ে থাকে নি, সমাজ এখানে রাজনৈতিক সময়াবর্তের দ্রুত চলমানতায় পরিবর্তিত হয়েছে। সামাজিক মানুষ ও তাদের দ্বারা গঠিত সমাজের সামগ্রিক 'বদলে যাওয়া'র ইঙ্গিত ও উপন্যাসে সমাজতত্ত্বের সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। লেখকের উদ্দেশ্য চলিষ্ণু জীবনধারার প্রবাহের বাস্তব রূপায়ণ। তিনি

সে বিষয়ে সার্থক হয়েছেন। তাৎমা, ধাঙড় ও কোয়েরিদের আদিম সমাজচিন্তা কিন্তু অনড় অচল স্থাণু নয়; তা পরিবর্তমান। প্রথম মহাযুদ্ধের পরের দিনগুলিতে এ দেশের জীবনপটে পুরনো জীবনধারার ভাঙন ক্রমেই দ্রুত প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠছিল। নগর শহরকেন্দ্রিক জীবন বা উন্নত কৃষিনির্ভর গ্রামপরিবেশে এই সামাজিক-অর্থনৈতিক ভাঙন যত স্পষ্ট দূর প্রত্যন্ত গ্রামীণ জীবনে তার গতি তত দ্রুত না হলেও তা যে ক্রমেই পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিচ্ছিল—এই চলমান সমাজ জীবনের আদ্যন্ত পরিচয় লক্ষ্য করা যায় 'ঢোঁড়াই চরিতে'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যত কাছে এগিয়ে আসছিল ততই রাজনৈতিক উন্মাদনা, স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতি দ্রুত পালাবদলে অভিনিবিষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিরিশের দশক থেকেই সে আঘাতের তরঙ্গ গ্রামের প্রান্তসীমায় পৌঁছোতে লাগল, অর্থনৈতিক অবস্থায় ক্রম অবনতি অসহায় দরিদ্র মানুষগুলোকেও ক্রমে ক্ষিপ্ত করে তুলছিল—ফলে এই সব সমাজও কম বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠল। সরল সহজ আদিম বিশ্বাসে ভরপুর মানুষগুলির উত্তেজনার সং চিত্র ফুটে উঠেছে এ উপন্যাস। এরা অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছে তাদের বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গের বেদনাকে। বিরোধের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি ও মানসিক পরিবর্তন—এই দ্বান্দ্বিক সূত্রটি সারা উপন্যাসে সক্রিয়-সজাগ ও স্পষ্ট করে ধরে রেখেছেন লেখক অসামান্য সমাজসচেতন মনোভঙ্গির সাহায্যে।

উপন্যাসের সূচনা ঢোঁড়াই-এর জন্মভূমি তাৎমাটুলি নিয়ে। পূর্ববৃত্তান্তে তাৎমাদের আদি পরিচয় দিয়ে লেখক জাতটার রক্ষণশীল সাবেক জীবনধারার নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিয়েছেন। 'জিরানিয়া' বা জীর্ণারণ্য হলো ঢোঁড়াইদের জীবন প্রবাহের তটভূমি। তাৎমাদের কাছে জিরানিয়া 'ভারি সাহার' বা 'টৌন' (টাউন)। পাকাবাড়ী, পাকারাস্তা, রাস্তায় চলে টমটম। সেই শহরের প্রান্তে তাৎমাদের বাসস্থান—পশ্চিমে বকরহাট্টার মাঠ, দক্ষিণে মজানদী—মরণাধার বা কারীকোশী। 'মাঠের বুক চিরে' চলে গেছে কোশী শিলিগুড়ি 'পাক্কী' রোড। রাস্তার ওপারে ধাঙড়টোলা। মাঝখানে এই রাস্তা শুধু পথ নয়—উভয় সমাজের জাতকলহের 'বিচ্ছেদরেখা', তাৎমারা কোনোকালে জাতে তাঁতি থাকলেও এখন তাদের কাজ কুয়োর বালি ছাঁকা আর 'ঘরামির কাজ'—ফলে দারিদ্র্য নিত্যসাথী। কবে আঁধি ঝড় হবে, বাবুভাইদের ঘরে শিলাবৃষ্টিতে চাল ভাঙ্গবে তবে তাৎমাদের কাজ হবে, ডাক আসবে বাবুপাড়ায় ঘর ছাইবার; তখন দুটো পয়সা। পাকা বাড়ীঘরের দৌলতে এ ব্যবসাও নাভিশ্বাসে ধুঁকছে। ধাঙড়রা নিজেদের জাত ধর্ম ত্যাগ করে ক্রীশ্চান হয়েছে। সাহেবদের বাড়ীতে তারা মালির কাজ, সাফাই কাজ বা খানসামার কাজ করে মেয়ে পুরুষে মিলে। তাৎমাদের রাগের কারণ তারা গরীব হলেও জাতধর্ম খোয়ায় নি, তাদের 'ঝোটাহা'রা এমনভাবে বাইরে যায় না সচরাচর, তাদের পুরুষেরাও খেতে না পেলেও জাত কাজ ছেড়ে অন্য কাজ নেয় নি। তাদের মেয়েরা বছরে একবার স্নান করার রীতি আজও মনে চলে। ধাঙড়দের ঘর বাড়ী দেহ-পোশাকে পরিচ্ছন্নতার ছাপ। কিন্তু তাৎমাপাড়া দিয়ে বাবু ভাইরা ফরসা কাপড় পরে গেলে পাড়ার কুকুরগুলো ডাকতে থাকে; বস্ত্রহীন বুড়ো মানুষ কাপড় টেনে শরীর ঢাকতে ভুলে গিয়ে অবাক হয়ে থাকে—ঠিক "পদ্মানদীর মাঝির" জেলে পাড়ার মতো দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অপরিচ্ছন্নতা এদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। অথচ

তাৎমা মেয়েদের বাবুভাইয়াদের সঙ্গে একটু শিথিল সম্পর্ককে তাৎমা পুরুষেরা ত্রুটি বলে দেখে না বা ধানকাটনীর দেশে যাত্রাকালে সেখানে অবৈধ মেলামেশাতেও মেয়েদের খুব একটা দোষ হয় না বলে পুরুষেরা মনে করে। আরও মনে করে যৌবন থাকতে তাৎমা মেয়ে বিধবা আবার কি কথা, তাই বুধুনির বাবুলালের সঙ্গে 'চুমৌনা' নতুন কোনো ঘটনা নয়। এটাকেই তারা স্বাভাবিক মনে করেছে; একবারও ভাবে নি শিশু ঢোঁড়াই-এর ভাগ্যটা এরপর কোন পথে চলবে। সমাজের এই আজন্মের সংস্কার তা ভালো কি মন্দ, তার কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে কি না সেটা গ্রামপ্রধান বা পঞ্চদের চিন্তার বিষয় হয় না বরং 'রীতি' রক্ষা করাতেই তাদের উৎসাহ। এদের সমাজে বৌকা তাই জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ 'বাওয়া'র মর্যাদা পায়। পাড়ার মাঝে থান গড়ে ওঠে একটা স্বাভাবিকের ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটলেই। তাই গাছ কাটার পরও গুঁড়িটা সোজা হয়ে থাকতে দেখে লোকে বিশ্বাস করে 'জীনের কাণ্ড' এটা। বৌকাবাওয়াকে গুঁড়ির চারধারে হাতজোড় করে সূর্যপ্রণাম করতে দেখা তারা বিশ্বাস করল গোঁসাই-এর কৃপা হয়েছে—সেদিন থেকে সেটা হলো 'থান', বৌকাবাওয়া হলো যোগী—তার গ্রাসাচ্ছাদনের কোনো চিন্তাই রইল না। থানে উঠল চাল ধাঙড় আর তাৎমাদের সহায়তায়—এই হলো তাদের আদিম বিশ্বাসবোধের নিগূঢ় পরিচয়।

আরো অজস্র বিশ্বাস তাদের রক্তের সঙ্গে মিলে মিশে আছে। যেমন তারা বিশ্বাস করে তাৎমা পুরুষরা মুসুর ডাল খেলে তাদের সহ্য হবেনা—কুষ্ঠ হবে, কিন্তু প্রসূতি মা খাবে মুসুর ডাল, তাৎমারা সবাই জানে বর্ষার আগে পেয়ারা খেলে জ্বর হয় আর আশ্বিনের পর জ্বর হয় বাতাবিলেবু খেলে। এ জ্বর মরণ জ্বর। শারীরিক অসুস্থতা তাদের কাছে 'বাই উখড়ানো'; শুষনি শাক এর একমাত্র ওষুধ। ঝোটাহারা যদি তাদের সমাজের রীতি বাৎসরিক স্নান না মেনে ঘন ঘন স্নান ও কাপড় পরিষ্কার করে তাহলে তাৎমা ছেলে বুড়ো অন্য মেয়েরা তাকে ভালো চোখে দেখে না। তাকে তারা 'নট্টীন' বলে উপহাস করে। পশ্চিমের মেয়ে রামিয়ার লোটা হাতে ময়দানে যাওয়া মাহাতো গিন্নীর চোখে অশোভন ঠেকেছে; কারণ তাদের সমাজে 'মরদ' ছাড়া কেউ একাজ করে না। এমনি অজস্র সংস্কার 'সহজাত বিশ্বাস' রূপে তাৎমা-ধাঙড়—এই অন্ত্যজ মানুষগুলিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব ও আচার আচরণের আদিম প্রথার সঙ্গে মিশে আছে তাদের জীবনচর্যা। তাই রোগ ব্যাধি, শারীরিক ত্রুটি সবকিছুরই একটা আদিম ব্যাখ্যা তারা ঠিক করে রেখেছে মনে মনে, এবং সেই রীতিনীতি মেনে তারা নিশ্চিন্ত; তার জন্য বহু মূল্য দিতেও কুণ্ঠিত নয়। ঢোঁড়াই-এর অসুখ শুনে তার মা বাবুলালের ঘরনী আকুল হয়ে ছুটে গেছে রেবণ গুণীর কাছে, সন্তানের প্রাণ ভিক্ষে চেয়েছে। এর জন্য বুধনিকে যে মূল্য দিতে হয়েছে তার জন্য তার মনে কোনো ক্ষোভ দুঃখ হয় নি কোনদিন। ঝাড়ফুঁক, জলপড়া, থানে মানত করা—এসবের প্রতি বিশ্বাসের প্রাবল্য; প্রাকৃতিক শক্তির রোষ উল্লাস গোঁসাইয়ের ক্রোধ বা কৃপা মনে করেই তারা নিশ্চিন্ত থাকতে চায়। তারা বিশ্বাস করে আগের জন্মে স্বামীকে দিয়ে পা টেপাবার ফলেই এ জন্মে পঙ্গুত্বের অভিশাপ বহন করতে হয়। শাপ উদ্ধারের উপায়টিও তারা সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে তা বুদ্ধিনির্ভর সমাজে হাস্যকর পন্থা বলে মনে হবে। অথচ তাদের মনে সংস্কারের মতো গ্রথিত আছে

যে সদ্য মৃত ভুঁড়ো শেয়ালের গরম নাড়িভুঁড়িতে পা ডুবিয়ে নিয়মিত বসে থাকলে পঙ্গুত্ব থেকে মুক্তি ঘটবে। ফুলঝরিয়ার মা বাবা সময় থাকতে এ উপায় মেনে নিয়ে মেয়ের পা সারাতে উদ্যোগী হয় নি বলে ফুলঝরিয়া আজীবন পঙ্গু হয়েই থাকল। আর পাগল হয়েও তার এ বিশ্বাস নষ্ট হয় নি বলেই টমিদের সে অনুরোধ করেছে—'সাহেব ওটা কি? বন্দুক? একটা ভুঁড়ো শিয়াল মেরে দিয়ো তো আমাকে বন্দুক দিয়ে।'

ধাঙড়টোলার মানুষগুলো জানে 'বাঙ্গাবাঙ্গী'র (দেবতার) নির্দেশ আছে পাড়ার বাঁশঝাড়ে ফুল ফুটলেই বুঝবে যে আকাল না হয় দুঃসময় কাছে। ঐ ফুলের ফসল ছেড়ো না। তাই দিয়ে রুটি তৈরি করে খাবে। তারপর বারো বছরের বেশি, সেখানে থেকো না—বারো বার গাছে তেঁতুল পাকুক। তারপর তল্পিতল্পা গুটিয়ে নতুন জায়গায় বসবাস করবার কথা ভাবতে হবে।' তাই ধাঙড়পাড়ার মোড়ল এতোয়ারীকে 'বাঙ্গাবাঙ্গী'র নির্দেশ মানতে অনেক খারাপ কাজ করতে হয়। মোড়লের নির্দেশে শনিচরা আর তার বৌটাকে গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হয়। এই লৌকিক বিশ্বাসের বশে এরা মনে করে নদীর পানি খেলে গলগণ্ড হয়; জলে ডুবে যে মরে সে হয় 'পানীভূত'। ঠিকমত শ্রাদ্ধশান্তি না হলে মৃত মেয়েমানুষ হয় 'শাঁখড়েল পেত্নী'। বিয়ের সময় চাল দান দিলে বিজোড় দান উঠলে বিয়ে স্থায়ী হয় না। ঢোঁড়াই-রামিয়ার বিয়ের সময় ঢোঁড়াই চেলেছিল নয়। তখন সে ঠিকই দেখেছিল বেজড় সংখ্যার চাল। মিশিরজী চেঁচিয়ে জোড় সংখ্যা দশ বললেও ঢোঁড়াই সঙ্কটের দিনে স্থির করে নেয় তার বেজড় দান চালার জন্যই রামিয়াকে হারাতে হলো। এ ধরণের চিন্তাভাবনা শুধু তাৎমা বা ধাঙড় সমাজেই নয়; একরাত একবেলা পাক্কীর পথ ধরে হেঁটে বিসকান্ধা পৌঁছলেও দেখা যাবে সেখানকার কৃষিনির্ভর মানুষের অন্ধ ভ্রান্ত বিশ্বাস কি প্রবল এবং অনেক সময় কি ভয়ঙ্কর রূপ নেয় তা পাঠককে বিস্মিত না করে পারে না। কোয়েরীটেলার বড়হাদাদার পাঁচ বছরের নাতি হঠাৎ রক্তবমি করে মারা গেলে গিধরমণ্ডল রটালো ডাইনী মোসাম্মতের কাজ। সারা গাঁ বিশ্বাস করল কথাটা। বিলটার মতো নিষ্ঠাবান কৃষকও সায় দেয় এই কথায়, বলে—এ 'জাতের সওয়াল।' সকলে একমত হয়ে মোসম্মতকে 'ডান' বলে গ্রাম থেকে উৎখাত করে দেয়। এসব অন্ধবিশ্বাস অন্ত্যজ সমাজের বুকে চেপে মানুষগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আবার প্রথানির্ভর সংস্কারের সুযোগ নিয়ে গিধর মোড়লের মতো ব্যক্তিস্বার্থলোভী মানুষও সরল সামাজিক প্রথাসংস্কারে বিশ্বাসী মানুষগুলোকে ঠকিয়ে নিজের লাভের কড়ি ঘরে তুলছে—মোসম্মতের জমির প্রতি তার যে দীর্ঘলালিত লোভ ছিল এই সুযোগে তা চরিতার্থ করেছে।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণীয়। তাৎমা ধাঙড়রা জিরানিয়াতে জন্মসূত্রে বাসিন্দা নয়। ধাঙড়রা এসে বাসা বেঁধেছিল বহুকাল আগে সাঁওতাল পরগণা থেকে; তাৎমারাও তেমনি এসেছিল দ্বারভাঙ্গা থেকে—উভয়েই এসেছিল 'পেটের ধান্দায়।' আর্থিক সঙ্গতির উদ্দেশ্যেই এরা বসতি গেঁথেছিল—নিয়ে এসেছিল শুধু 'করণ', 'কৃত্য' আচার আর লৌকিক জীবনধারা'। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনধারায় গভীর আনুগত্যের জন্যই স্থানবদলে মানসিক চর্যার পরিবর্তন তেমন হয় নি। কিন্তু একেবারে হয় নি এমন কথাও বলা যাবে না। আমূল গ্রথিত জীবনচর্যার রীতিনীতিতে নড়চড় হয়েছে তাও ঐ জৈবিক ক্ষুধার জন্যই। কিন্তু

মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য যে শিক্ষালব্ধ সত্য উপলব্ধির প্রয়োজন তার স্পর্শ তারা কমই পেয়েছে। তাই শহর ও শহরতলির মানুষগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সমীহের, ভয়ের এবং দূরত্বের। এমন কি নিজেদের সমাজের কেউ যদি ছিটকে গিয়ে তাদের সংস্পর্শে জীবনের চেহারা ফিরিয়েছে, যেমন বাবুলাল চাপরাসীর মতো মানুষকে তারা একটু স্বতন্ত্রভাবে দেখে। এরকম মানুষ তাদের জাতের গৌরব কিন্তু ধাঙড়রা নয়; কারণ তারা সভ্য মানুষের সংস্পর্শে আসতে নিজেদের জাতধর্ম হারিয়েছে—তারা 'কিরস্তান' হয়েছে—তাৎমারা তাদের আর কাছের মানুষ ভাবতে পারেন না। এমনিভাবে নিজেরাই নিজেদের ধারণা গড়ে তুলে নিকট দূর সম্পর্ক স্থাপন করে তার সমর্থনে যুক্তি তৈরী করে রেখেছে।

এত সত্ত্বেও তাদের সমাজের স্বকীয়তার রূপরেখা একটি কারণে প্রত্যক্ষ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে। তাৎমারা অক্ষরজ্ঞানহীন অজ্ঞ হলেও কবচকুণ্ডলের মতো 'রামায়ণের' সঙ্গে তাদের অচ্ছেদ্য বন্ধন রক্ষা করে চলেছে। তাদের নৈমিত্তিক জীবনধারায় 'রামায়ণ' সঞ্চারিত হয়ে গেছে। গভীর বিশ্বাস 'রাম চরিতমানসে', রামজীর প্রতি। আর এই 'টোলা'য় যে রামায়ণ পাঠ করে শোনায়, মিসিরজী, তাকেও তারা সমান ভক্তি করে। আচারে আচরণে, শয়নে জাগরণে 'অযোধ্যাজী', 'রামমন্ত্র' তাদের উদ্বুদ্ধ করে। সারা উপন্যাস জুড়ে "রাম চরিতমানসের" উদ্ধার জীবনের স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। শিশু ঢোঁড়াইকে থানে শুয়ে থাকতে দেখে বৌকাবাওয়া মনে করেছে তার নিঃসঙ্গ জীবনে রামজীর কৃপা হয়েছে। ঢোঁড়াই-এর নাভি মূলের তিনটি বলিরেখা দেখে তার মনে পড়ে—'কটি কিঙ্কিনী উদরত্রয়রেখা।/ নাভি গঁভীর জান জিন্হ দেখা।' বালক শ্রী রামচন্দ্রজীরও এমন ছিল। ঢোঁড়াই ভিক্ষে করতে বেরিয়ে গান গায় সেও রামজীর গান। মহৎ মানুষের বিরাট আদর্শ তাদের মনে জাগায় রামজীর মহিমা। দুঃখে-সুখে-আনন্দে, দুঃসময়ে, দুর্বিষহ যন্ত্রণায় তাদের স্মরণ-বরণ রামজীই। এমনিভাবেই রামায়ণের প্রবাহ তাদের মনকে এক ধ্রুব বিশ্বাসে দৃঢ় করে রেখেছে।

এই আঞ্চলিক জীবন, গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজধারা কিন্তু পরিবর্তনশীল। অন্ধ সংস্কার আর প্রচলিত প্রথার দাস হলেও এই সমাজের তটে আধুনিক জীবনের চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এসে তাদের নাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বাসে চমক জাগিয়েছে। রাজদরবারের উৎসবের জুলুষ যোগ দিতে পারে নি বলে বুধনির মনে ক্ষোভের সীমা ছিল না। স্বামীর কাছে সেই উৎসবের বিবরণ শুনতে গিয়ে মুসুরডাল না কেনার কারণটা চাপাই পড়ে গেল। কিম্বা বুধনির সেই প্রথমপক্ষের স্বামীর কাছে অসুস্থ বুধনির তাগদের চেয়ে 'পকেট বাত্তিমারে'র (সিগারেট) লোভটা বেশি হয়েছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই। আবার এই সরল সাধাসিধে লোকটা হাওয়া আর পানিতে চলা গাড়ী দেখতে গিয়ে জ্বর বাঁধিয়ে বসেছিল। সেদিন বুধনিও ফৌজী ইঁদারা থেকে জল নিয়ে ছুটে এসেছিল গাড়ীর বৃত্তান্ত শুনতে। এমনি অজস্র বাইরের সমাজের আধুনিকতা, উত্তেজনা তাদের জীবনকে নাড়া দিয়ে গেছে। ধীর মন্থর গতিমুখর সমাজে প্রবেশ করেছে এই শতকের বিশ-তিরিশ দশকের উত্তেজনা। কূপমণ্ডুক, প্রথানির্ভর শ্রমহীন মানুষ গুলির স্বেচ্ছাকৃত সমর্থন না থাকলেও নানাভাবে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রতিবেশে এই চলমানতাকে স্বীকার করতে হয়েছে। অভিজ্ঞতা দিয়ে ধীরে

ধীরে তারা হয়ে উঠেছে সময়ের অংশীদার। তাই প্রথমে বর্ণিত রীতি সংস্কার জর্জরিত আপাত স্থানু সমাজের তলে যে ফল্গু স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল তা সুযোগ পেয়ে স্বাভাবিক গতিপথরেখা নিয়ে প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। উপন্যাসের প্রথম দিকে ঢোঁড়াই-এর তাৎমা সমাজ ছিল মন্থরগতি। লেখক ঢোঁড়াই-এর জন্মবৃত্তান্ত, মাতৃপরিত্যক্ত-রূপ, ভিক্ষান্বেষণনির্ভর জীবনধারার সঙ্গে সমাজজীবন ও পরিবেশের অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন তখন একপ্রকারের ধীরগতি জীবনপ্রবাহের ছবি স্পষ্ট হয়েছে। কারণ হিসাবে বলা যায় যে কালপরিধির মধ্যে (প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব) ঢোঁড়াই জন্ম থেকে ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠেছে সেই সময়কার গ্রামীণ জীবন মূলত পুরনো ঐতিহ্যনির্ভর জীবনচর্যায় আস্থাশীল ছিল। কৃষিনির্ভর সমাজের মন্থর পরিবেশ মূলত ভারতবর্ষের বৃহৎ অংশের জীবনধারার গতিনির্দেশকারী। সমাজের গতির রূপরেখা গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবনস্রোতে অর্থনীতির সূচকদণ্ডটি তেমন দ্রুত ওঠা নামা করে নি। ফলে প্রায় যোগাযোগহীন জাত-জীবিকা নির্ভর মানুষের জীবনে তার ঢেউ বড়ো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে না। তাৎমা সমাজও এই কারণেই মন্থর ছিল বলে মনে করা অসমীচীন হবে না।

কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য নয় গড্ডলিকাময় জীবনের ও সমাজের কাহিনী রচনা। তাঁর অভিজ্ঞতায় মানুষ ও তার সমাজ সজীব ও গতিসম্পন্ন। দ্বান্দ্বিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে তার প্রবাহ চলেছে কাল থেকে কালান্তরে। কালোত্তরণের চেষ্টায় মানুষ আশ্রয় নিচ্ছে নিত্য-নতুন অভিজ্ঞতার। পুরনো সঞ্চিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের সঙ্গে অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে মানুষ অর্জন করছে পরিবর্তন মেনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি।

এই শক্তি অর্জনে ও প্রকাশে সাহায্য করেছে ব্যক্তি নিজে একক ভাবে আবার সে উদ্বুদ্ধ করেছে সমগ্রকে। ঢোঁড়াই নিজে একা করেছে অনুধাবন ও প্রয়োগ, আবার তারই প্রেরণা প্রচেষ্টায় তাৎমা সমাজের বৃহৎসংখ্যক মানুষ হয়ে উঠেছে সজাগ সচেতন। স্বভাবতই এই সচেতনতা এসেছে অনেক বাধা-বিপত্তি-বিরোধের মধ্যে দিয়ে। ঢোঁড়াই প্রথম থেকেই পরিবর্তনে নানাভাবে সাহায্য করেছে। বাইরের সমাজের উত্তেজনা তাদের কাছে নতুন করে ব্যাখ্যাত হয়েছে। রাজনৈতিক পরিবর্তনকে তারা নিজেদের মতো করে বুঝতে চেয়েছে, তাদের প্রয়োজনের মতো করে নিয়েছে। অন্ত্যজ সমাজ তার পুরনো মূল্যবোধ-সংস্কার-জীবনধারা-অর্থনৈতিক-সামাজিক ভিত্তির বদল ঘটিয়েছে বাইরের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ও মানসিকতার পরিবর্তনের সাহায্যে। সেই পরিবর্তনের চিত্রটি স্পষ্ট করলেই সমাজমানসটি তার সম্পূর্ণ চেহারা নিয়ে উঠে আসে।

বাইরের দিক থেকে যে ঘটনার ঢেউ উপন্যাসের প্রথম চরণে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সে হলো গান্ধীজীর অসহযোগ, আইনঅমান্য, সত্যাগ্রহ ইত্যাদি। সাধারণ অজ্ঞ মানুষগুলি নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে নিয়েছে এই উত্তেজনাপূর্ণ দশকটির কার্যকালাপ। এই রাজনৈতিক ঘটনা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে ভূমিকাই গ্রহণ করে থাকুক না কেন, সাধারণ মানুষের জীবনে তার প্রভাব যে কি বিচিত্র, আশ্চর্য অথচ পরিপূর্ণ সততায় ভরপুর—তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে "ঢোঁড়াই চরিতমানসের"র পাতায় পাতায়। তাদের

মতো করে বোঝার ফলাফল তাদের জীবনকে এরই প্রভাবে যে পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে সেও যে কত বিস্ময়কর—তা মননশীল লেখকের জনসংযোগমূলক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া আমাদের পক্ষে কোনভাবেই জানা সম্ভব হতো না।

তাৎমা মানুষগুলোর পরিচিত চৌহদ্দির মধ্যে ছিল স্বাভাবিক মানসিক দূরত্বের শহরে মানুষগুলি। এদের সঙ্গে তাদের ভাব বিনিময় নেই বললেই চলে। আছে শুধু কায়িকশ্রমের সূত্রে যোগাযোগ—ঘর ছাওয়ার কাজে, তাৎমা মেয়ে পুরুষ বাবুসমাজে যাতায়াত করলেও কোনোদিন কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পারে নি। বৈষয়িক সূত্রে উকিল মোক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও সম্পর্কটা সমীহের ও ভয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। ফলে তাদের এত কাছাকাছি সভ্য সমাজজীবন থাকা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে কোনো হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ঘটিয়ে পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে নি। তাৎমা প্রভৃতি অন্ত্যজ সমাজ শহর নির্ভর শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে সহজাত বিভেদনীতির মানসিকতায় আপন সমান্তরালতাকে রক্ষা করে চলে আসছিল। এ চেহারা শুধু বিশ শতকের প্রথম দশকগুলির উত্তর বিহারের চিত্র নয় ; বলা যেতে পারে গোটা ভারতবর্ষের শহরসংলগ্ন গ্রামীণ জীবনধারায় এরই স্বরূপ আজও অপরিবর্তিত আছে। সুতরাং এই সব প্রাচীন প্রথা বিশ্বাসী সমাজজীবনে কোনো বিরাট আন্দোলনের, নতুনত্বের ঢেউ যখন এসে পড়ে তখন তার প্রাথমিক চেহারাটা বড়ো উত্তেজনা, বড়ো বিচলত অবস্থা সৃষ্টি করে। গান্ধীজীর আবির্ভাব, তাঁর জীবন ও কর্মধারায় ঢেউই এই সমাজের কাছে সবচেয়ে বড়ো উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই সব সরল সাধাসিধে মানুষগুলির আবেগনির্ভর মন প্রবলভাবে নাড়া খেয়েছিল। শিক্ষিত মানুষের যুক্তিবুদ্ধি বিবেচনা ও কার্যধারার অনুসরণ তাদের মধ্যে আশা করা যায় না। তাদের সে পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভবও নয়। তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছিল, আন্দোলনকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তার ফলাফলও একটা হয়েছিল। তারা কিন্তু সাময়িক উত্তেজনা কেটে গেলে পুরনো জায়গায়, পুরনো ব্যবস্থায় স্থির থাকতে পারে নি। তাদের নিজেদের মতো করে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। বাইরের ঘটনা তাদের চলিষ্ণু সত্তাকে কিছুটা বেগ দিয়েছিল—তারা সেই পথ ধরে চলতে চেয়েছিল, বাধা পেয়ে পিছিয়ে পড়েছে কিন্তু থেমে থাকে নি। কারণ ভিত্তিমূলে যে নাড়া খেয়েছিল তাতে একই বৃত্তের চারপাশে ঘোরা সম্ভব নয় ; কেন্দ্র বিন্দু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। ঢোঁড়াই ও তার সমাজের এমনিভাবেই পথরেখা তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

তাৎমা প্রভৃতি অন্ত্যজ মানুষের কাছে সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য ও গান্ধীজী একটা বড়ো ঘটনা ও মহৎ মানুষের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। গান্ধীজী সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারার প্রকাশ সম্পূর্ণ তাদের নিজেদের ভাবনার ফসল। গান্ধীজী তাদের কাছে সন্ত, সাধু, রামজীর সমান। বারবারই এই মানুষটির ভাবমূর্তিকে তারা নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছে। তাদের সমাজের সম্ভ্রম দূরত্বের মানুষ মাস্টার সাহেব গান্ধীজীর আহ্বানে চাকরী থেকে ইস্তফা দিয়েছেন, ইংরেজ সরকারকে অস্বীকার করে সভা বক্তৃতা করেছেন—এসব তারা শুনেছে বাবুলাল চাপরাসীর কাছে। কিন্তু ব্যাপারটা তাদের কাছে তেমন গুরুত্ব পায় নি। নিজেদের

মতো করে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে মাস্টারসাহেবের কর্মপদ্ধতির—' নৌকরি থেকে সরকার নিশ্চয়ই বরখাস্ত করেছে। টাকা পয়সার ব্যাপার নিশ্চয়ই কিছু আছে।' লক্ষ্য করবার মতো বিষয় এই মানুষগুলির বিশ্বাসবোধ ও ব্যাখ্যার সারল্য বাবুভাইদের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে 'অর্থের এদিক ওদিক' ব্যাপারটা জড়িয়ে থাকতে পারে এমন কথা তারা অকপটে বিশ্বাস করে। বাবুলালের মুখেই প্রথম গান্ধীজীর কথা শুনে তাদের কৌতূহল জেগেছে—

'গাণহী বাবা কে? গাণহী বাবা?

বড় গুণী আদমী। বৌকাবাওয়া আর রেবণ গুণীর চাইতেও নামী। সিরিদাস বাওয়ার চাইতেও বড়, না হলে কি মাস্টারসাব চেলা হয়েছে। গাণহীবাওয়া মাস-মছলী, নেশা-ভাঙ থেকে পরহেজ (সংযমী)। সাদি বিয়াকরেনি। নাঙ্গা থাকে বিলকুল।'

এমনিভাবে পরিচিত মানুষগুলির সাধুতা ও সদ্‌বৃত্তির তুল্যমূল্যের অনুষঙ্গে তারা গান্ধীজীকে সেদিন নিজেদের মনের আসনে 'পরভেজ' বা 'মহাত্মা'র আসনে প্রতিষ্ঠিত করে উত্তেজিত, আন্দোলিত, শিহরিত, পুলকিত বোধ করেছিল। কিন্তু ঢোঁড়াই-এর বাবুলাল সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাসুলভ দীর্ঘ-লালিত মনোভাব গড়ে উঠেছিল। তাই সে সম্পূর্ণভাবে বাবুলালের কথা বিশ্বাস করতে পারে নি। সারাক্ষণই সংশয় সঙ্কটে মনকে আলোড়িত করেছে—'গাণহীবাওয়া রেবণগুণীর চাইতেও বড়, বৌকাবাওয়ার চাইতেও বড়, মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ির মোহন্তের চাইতেও বড় ; এক নম্বরের ধাপ্পাবাজ বাবুলালটা। ঝুটফুস বললেই হল।'

সংশয়, বিশ্বাস, উত্তেজনা ও ক্রম উচ্চারিত উল্লিখিত ঘটনার সূত্রেই গান্ধীজী এদের জীবনপ্রবাহে বড়ো আলোড়ন তুললেন। এরা অদ্ভুত আকর্ষণে বিচলিত ও উত্তেজনায় আংশিক ভাবে নাড়া খেল। মনের গভীরে ভাব ভাবনার ধীর পরিবর্তন জীবনধারা ও চেতনদৃষ্টিকে সজাগ করল। তারা রবিয়ার বাড়ীর চালে বিলিতি কুমড়োয় গান্ধীর মূরত দর্শন করল। কিন্তু 'এরকম করে তো গাণহী বাওয়াকে হিমে রোদ্দুরে ফেলে রাখা যায় না। ঠাকুরদেবতার ব্যাপার।' বালক ঢোঁড়াই বৌকাবাওয়ার থানের ভকত এই অধিকারে সেই 'মূরত' স্পর্শ করার অধিকার পেল। ঢোঁড়াই নিজে গৌরবান্বিত বোধ করল। তার আত্মমর্যাদাবোধের প্রথম ধাপটা এমনিভাবে বলিষ্ঠতা পেল সমাজে। সে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করল উপযুক্ত মর্যাদায় যথাস্থানে গান্ধী মূরতকে প্রতিষ্ঠিত করতে। ঠাকুরবাড়ীতে রামসীতার মূর্তির পাশে মহারাজের মূর্তি রাখা ঠিক নয় এটা তারা বোঝে ; কারণ রাম সীতা তাদের জীবনপথের প্রথম দিশারী ভগবান। সমস্ত সমাজটার মর্মমূল থেকে দুঃখের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয়—'নহি দরিদ্রসম দুখ জগমাহী।' কারণ তারা দরিদ্র, বাবুভাইদের মতো টাকা থাকলে এই নতুন 'সন্ত' বা 'পরভেজ'-এর জন্য তারা ঠাকুরবাড়ী করে দিতে পারত। কিন্তু কি দিয়ে তারা পূজা করবে। বাওয়ার চোখে জল আসে স্বাভাবিক কারণে, কারণ তিনি এলেন ভক্তের দুয়ারে ; ভক্তের ভিক্ষাবৃত্তি করে চলে ; সে তাঁর মর্যাদা দিতে পারছে না। শুধু বাওয়ার নয়—'এই বিপদের ঝলকে হঠাৎ যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে' সকলের মনে। দারিদ্র্য অনটনে জর্জরিত মানুষগুলির সামনে গান্ধীজী এলেন বিশ্বাস ও সত্যের পূর্ণ মূর্তি নিয়ে ; তারা তাঁকে চাইল নিজেদের গোঁসাই রূপে পেতে। আবার রেবণগুণীর মতো

আবেগপ্রবণ মানুষটার ঘরে শুধু তাঁর ঠাঁই হয় না ; বিলিতি কুমড়োয় দর্শনধারী গান্ধীমূর্তি দেখিয়ে রেবণগুণী তার অনেক দিনের মদের খরচ জোগাড় করেছিল। ঢোঁড়াই ভকত হয়েছিল ; বাটহীর গানের সঙ্গে গাণহী বাওয়ার গান গাইতে গাইতে মনের মধ্যে নতুন উন্মাদনা উপলব্ধি করেছিল। তাৎমা সমাজের পঞ্চায়েত একত্রে বসে স্থির করেছিল গাণহীবাওয়া উঁচুদরের সন্ন্যাসী ; 'মুসলমানকেও পিঁয়াজ গোস্ত ছাড়িয়েছে।' তারা প্রতিজ্ঞা করেছে কালালী টোলাতে যাবে না, মদ ছোঁবে না ; ঘর দোর সাফসুরৎ রাখবে, মেয়েরা একটু পাক সাফ থাকবে। মাহাতো, ছড়িদার গাণহীবাওয়ার আদর্শের সুযোগ নিয়ে পঞ্চায়েতে নিজেদের মর্যাদাকে কায়েম করতে চেয়েছে। বেলগাছের ডালে হুঁকো কলকে বেঁধে প্রত্যেকে সংযম পালন করতে চেয়েছে—'রবিবারে গাণহীবাওয়ার নামে কাজে না গেলে বেশ হয়। রবিবার 'তৌহারের' দিন। সরকার বাহাদুর পর্যন্ত কাছারী বন্ধ রাখে।'

কিন্তু এসব ঘটনার উত্তেজনা বাইরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে মনে করলে ভুল হবে। তলে তলে মানুষগুলিকে পাল্টে দিয়েছে ; রবিবার গান্ধীর নামে কাজে না যাওয়াটা মাহাতোদের অভিনব নির্দেশ ও গান্ধী আনুগত্যের প্রকাশ হলেও ঢোঁড়াই-এর মতো বালকের বুঝতে অসুবিধে হয় নি যে এতে তাদের জীবিকার পথটি সংকীর্ণ হয়ে গেল। ঢোঁড়াই পঞ্চায়েতে প্রথম প্রতিবাদ করে—'আমাদের পেট কেটো না মাহাতো।' কারণ রবিবারের ভিক্ষাতেই তার পয়সা রোজগার বেশি ; বাবুভাইরা ঘরে থাকে সেদিন, অনেক পয়সা দেয়। পঞ্চায়েতে ঢোঁড়াই-এর সেদিনের ক্ষীণ প্রতিবাদ অন্যান্যদের আবেগে অবহেলিত হয়েছিল। কিন্তু ঢোঁড়াই সেদিন বুঝতে ভুল করে নি মাহাতো ছড়িদারদের মানসিকতা, স্বার্থসুবিধাকে। গান্ধীজীর নামে তারা 'ভকত' হয়ে নিজেদের মানুষগুলোর কাছে প্রধান্য পেতে চাইছে 'এমনিই মহতো ছড়িদার, নায়েবদের সম্বন্ধে লোকে কিছুদিন থেকেই অল্প অল্প স্পষ্ট কথা বলতে আরম্ভ করেছে। এ জিনিস আগে ছিল না। ঐ তো সেদিন খোঁড়া চথুরী পঞ্চায়তির মধ্যে চেঁচিয়ে কি সব বলেছিল। খারাপ হাওয়ার দিন আসছে। মহতো নিজের জায়গা আরও একটু মজবুত করতে চায়। বছরের একদিন মাছ খাওয়া ছেড়ে যদি লোকের মুখ বন্ধ করা যায়, তাহলে মহতোগিরি থেকে বেশ দুপয়সা রোজগার করে নেওয়া যেতে পারে। তাহলে তার সমাজে প্রসার প্রতিপত্তি বাড়বে।' কিন্তু অভিজ্ঞতার নিরিখে এরাই পরে বুঝেছে—'না, না, মহতোগিরিতে না আছে আগেকার মতো পয়সা, না আছে সম্মান না আছে এক মুহূর্তের শান্তি।'

এই ভাবেই সমাজচিত্র ধীরে ধীরে ভিন্নরূপ পেয়েছে। অভ্যস্ত সমাজজীবনে বাইরের ঘটনা এসে মানুষগুলির মনের গতিকে ভিন্ন খাতে পথ করে দিয়েছে—তারা নিজেদের ব্যাখ্যায়, অভিজ্ঞতায় নিজেদের জীবন ও সমাজের পটপরিবর্তনে সাহায্য করেছে। ঢোঁড়াই এরপর থেকেই এককভাবে পঞ্চায়েতের প্রধানদের সঙ্গে, অভ্যস্ত জীবনধারার সঙ্গে বিরোধ বিসম্বাদের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। ঝড় ঝঞ্ঝা বিক্ষোভ ও সমর্থন শেষে সকলেই মেনে নিয়েছে নতুন ব্যবস্থা। পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমাজ ও মানুষগুলো অনেক কিছু মেনে নিতে শিখেছে, সামঞ্জস্যরক্ষা করে অস্তিত্ব বজায় রাখতে চেয়েছে। এ সমাজের পুরনো মানুষগুলো দেখেছে চোখের সামনে সব কেমন পাল্টে যাচ্ছে অথচ তারা নিরুপায়। প্রথম

প্রথম উত্তেজনায় ক্ষোভে ও অধিকারবোধে ক্ষিপ্ত হয়ে দল বেঁধে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কালের বিবর্তনে তাদের পুরনো যুক্তিগুলো তাদের নিজেদের কাছেই অসাড় প্রতিপন্ন হয়েছে। গ্রামের 'পঞ্চ' মাহাতোকে বলতে হয়েছে—'কিছুদিন থেকে দুনিয়া দরকারের চাইতেও বেশি তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। ঘটনার পর ঘটনার আঘাত লাগছে তাৎমাটুলির সমাজে, তাৎমাদের মনে। জিনিসটা আরম্ভ হয়েছে হঠাৎ, কবে থেকে তা ঠিক মহতোর মনে নেই। এই 'এক সাল দেড় সাল' হবে আর কী, লোকের মনে কিসের আগুন লেগেছে, কিসের যে স্রোত এসেছে চারিদিকে, মহতো তা বুঝতেই পারে না, তো তার সঙ্গে তার সঙ্গে তাল রাখবে কী করে?'

বাইরের রাজনৈতিক ঘটনার ঢেউ এই গোষ্ঠীনির্ভর সমাজের বুকে নানা ভাবে আলোড়ন এনেছে। ঢোঁড়াই পাক্কীতে কাজ নিয়ে জীবিকার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। জাতের বাইরে জীবিকা অন্বেষণ সেদিন গোটা তাৎমাসমাজ মেনে নিতে পারে নি, তারা ক্ষেপে উঠেছিল। নানা ক্ষোভ-বিক্ষোভ ও পরে পুলিশের কাছে ঢোঁড়াই-এর বিশেষ ভূমিকা গ্রহণে সমাজ তার মেনে তাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তারা নতি স্বীকার করেছিল। পরে এই মাহতোই মান মর্যাদার কথা না ভেবে ঢোঁড়াই-এর কাছে এসেছিল নিজের ছেলে গুদরের কাজের জন্য। ঢোঁড়াই যদি মাটি কাটার কাজে ছেলেটাকে লাগাতে পারে এই অনুরোধ করতে হয়েছিল তাৎমা মাহতোকে। কালের এমনই বিচিত্র গতি আর তারই তালে সমাজের এমনই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন। অবশ্য এই পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অর্থনৈতিক সঙ্কট। ঢোঁড়াই-এর পাক্কীতে কাজের ফলে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও পরে বৌকাবাওয়ার টাকায় গাড়োয়ান হয়ে স্বাধীন শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপায়ের আংশিক নিশ্চিন্ততা মাহতোকে যে ঢোঁড়াই-এর কাছে টেনে এনেছে এ কথা বুঝতে অসুবিধে হয় না। লেখক এই মনোভাবের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। মাহতো ঢোঁড়াইকে বলে—'জানই তো আজকালকার রোজগারের বাজার।..... তোমার ঐ গ্যাং-এর কাজটা গুদরকে পাইয়ে দাও, তুমি তো ছেড়েই দিলে।' ঢোঁড়াই এতোয়ারীকে বলে চেষ্টা করেও পারে নি মাহতোর ছেলেকে কাজ দিতে। মাহতোর সঙ্গে বিরোধ তার অনেক দিনের। মাহতোর আজ ক্ষমতা ফুরিয়েছে, ঢোঁড়াইকে সে পারে না পরাস্ত করতে। কিন্তু ঈর্ষান্বিত তার প্রতি। পুরনো মানসিকতা, সংস্কার নিয়ে এক জায়গায় আড়ষ্ট মাহতো ও তার দলবল। ঢোঁড়াইদের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতে পারে না শক্তির অভাবে, কিন্তু রুষ্ট—'ঐ সেদিনের ভুঁইফোঁড় ছোকরা ঢোঁড়াই, সেই কিনা গাঁয়ের লোকের মুখিয়া হয়ে আগিয়ে আসে। নতুন পয়সার গরমে ফুলে ভাঁথী হয়েছে ছোঁড়াটা।' এই হলো কারণ—মাহতোর ক্ষমতা কমছে, অন্যে মুখিয়া হচ্ছে—আধুনিক কালের গতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলার ক্ষমতা তার নেই, আছে মিথ্যা 'পঞ্চ'-এর আস্ফালন। সমাজ বদলের অভিজ্ঞতায় এমনি ভাবে মনের বদলও ঘটছে। অন্য তাৎমারাও নিজেদের দারিদ্র্যে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে থাকতে ঢোঁড়াই-এর ব্যক্তিসুখের দিকে তাকিয়েছে একটু বক্র দৃষ্টিতে। 'শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াইয়ের গাড়ি-বলদ কেনাই ঠিক হয় ভিখনাহাপট্টির মেলা থেকে। পাড়া আবার সরগরম হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে হয়ে উঠল কি তাৎমাটুলি। বড় যখন হয় এমনি করেই হয়। এবেলা ওবেলা বাড়ে। একেবারে বাবুলালের সমান হয়ে গেল ঢোঁড়াই।'

ঢোঁড়াই রামিয়াকে বিয়ে করে ঘর বাঁধে। বৌকাবাওয়া ঠিক মেনে নিতে পারে নি মন থেকে। কিন্তু তার তো অন্তর জুড়ে ঢোঁড়াই ; তার সুখেই সে সুখী, ঢোঁড়াইকে তো রামজীই তার কাছে পাঠিয়েছিলেন, আর বাওয়া তার নিঃসঙ্গ একক জীবনে ঢোঁড়াইকে পেয়ে স্নেহ সিঞ্চনে হয়ে উঠেছিল পূর্ণ। ঢোঁড়াই-এর বিয়ের ফলে বাওয়া মনে মনে হয়ে উঠল নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তিসন্ধানী হয়ে বাওয়া হঠাৎ চলে গেল তাংমাটুলি থেকে। কিন্তু শুধু কী একাকিত্বের জন্যই বাওয়া চলে গেল? বিবাহিত জীবনেও ঢোঁড়াই তো বাওয়াকে একই রকম ভালোবেসেছিল ; রামিয়াও তো বাওয়াকে অসম্মান করে নি। তবু বাওয়াকে চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু শুধু স্নেহ বিভাজনের জন্য নয় ; আরও কারণ আছে। গান্ধীজীর আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে লবণ আন্দোলনের সময় তাংমা সমাজ স্বভাবসিদ্ধভাবে হয়েছিল চঞ্চল ; উৎসাহ দানে জিরানিয়ার গান্ধী ভক্ত মাস্টার সাহেব আর তার সঙ্গীদের আনাগোনায় তাৎমা মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে একত্রিত হয়েছিল মরণাধারের পাড়ে। লবণ তৈরীতে তারা অংশ নিয়েছিল। তাৎমা মেয়েরা রোজ সন্ধেয় গিয়ে প্রদীপ দিয়ে আসে মরণাধারের নতুন 'থানে'। বৌকাবাওয়া এই নতুন স্থানকে ব্যাখ্যা করেছিল নিজের মতো করে ; বুঝেছিল এ স্থানের মাহাত্ম্য ক্রমেই বাড়বে ; আর তাংমাটোলায় বৌকাবাওয়ার গোঁসাইথান ক্রমেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে—'রামিয়া, মাহতো গিন্নী, রবিয়ার বৌ আরও অনেক 'ঝোটাহা' সন্ধ্যাবেলায় মরণাধারের পুলের কাছে ঐ জায়গাটাতে প্রদীপ দিয়ে এসেছে। কাল একদল এসেছিল মহলা দিতে, আজ আবার এসেছে নতুন আর একদল। এরাই সব আবার গাঁয়ে গাঁয়ে চলে যাবে এরপর। কিন্তু মরণাধারের কাছে থেকে যাবে একটা নতুন 'থান', মহাত্মাজীর থান ঠিক যেখানটিতে আজ জোটাহারা সাঁঝে পিদিপ দিয়েছে, সেই খানটায়। বাওয়া ভাবে যে সত্যি যদি ওখানে আর একটা থান হয়ে যায়, তাহলে তাৎমাটুলিতে গোঁসাই থানের গুরুত্বও কিছুটা টান পড়তে পারে।' আর সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎই বাওয়ার স্মৃতিতে ভেসে উঠল মায়ের শেষ কথাটা—'অযোধ্যাজীতে গিয়ে থাকিস, সেখানে অনেক ভিখ্ পাওয়া যায়।' শুধু বিভক্ত ভালোবাসার বেদনাই বাওয়াকে অযোধ্যাজীর প্রতি আকৃষ্ট করেছে মনে করা যাবে না, থানের গুরুত্ব কমে যাওয়ায় তার কর্মের নিঃসঙ্গতা আসবে এ ভয় তাকে চঞ্চল করেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষান্বেষণে অনিশ্চয়তা তাকে দুর্বিষহ বিপাকে ফেলবে—এই বোধ মনের গভীরে প্রখর ভাবে কাজ করেছিল বলেই বাওয়া নীরবে ছেড়ে চলে গেছে তাৎমাটুলি, ঢোঁড়াই, পরিচিত থান সব পেছনে ফেলে রেখে।

আরো অনেকেই ছেড়ে চলে গেছে। যেতে বাধ্য হয়েছে এই একই অর্থনৈতিক কারণে। প্রথাবদ্ধ সমাজ যে আধারে নিজেকে ধরে রেখেছিল সেই জীবনের 'কৃত্য করণ', বিশ্বাস ক্রমেই অসাড় ; বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া বোঝা মাত্রা হয়ে উঠল মানুষগুলোর কাছে। বহির্সংযোগ, রাজনৈতিক উত্তেজনা ; জীবিকাবৃত্তির পরিবর্তন এ সবের ফলেই অন্ত্যজ মানুষগুলি ক্রমেই গোষ্ঠীনির্ভরতা মুক্ত হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে চাইছিল সচেতন-অসচেতনভাবে। বাবুলাল চাপরাসি, রতিয়া ছড়িদার নিজেদের সমাজবৃত্তের মধ্যে থেকেও মাননীয় ও বিত্তবান ছিল একদিন। তারা সমাজের অন্ত্যজ মানুষগুলির কাছে বিরোধী

বলে চিহ্নিত হলো। চৌকিদারী ট্যাক্স ও মামলায় সাক্ষী দেওয়ার ব্যাপারে এরাই ছিল পঞ্চায়েতের প্রধানের মূলশক্তি। ক্রমে এরা সে মর্যাদা হারিয়ে মাহতোকে নির্জীব করে ফেলল। 'তাৎমাটুলি থেকে লোক চলে যাচ্ছে। রতুয়ার বোনটা মুসলমানের সঙ্গে চলে গেল। হারিয়া মেয়েটার বিয়ে দিয়ে এসেছে মালদা জেলায় টাকার লোভে। আর বলছে যে সেইখানেই চলে যাবে চাষবাসের কাজ করতে।' শুধু তাই নয়, মাহতোর নিজের ছেলে সেও জাতকাজ ঘর ছাওয়া আর বালি ছাঁকার কাজ ছেড়ে মুঙ্গেরিয়া তাৎমা রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে কাজে যোগ দিয়েছে। মাহতোর ক্ষোভ 'মুঠো থেকে সব পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে, কাকে সে আটকাবে? .... মহতো থই পায় না ; একবছরের মধ্যে সে এত বুড়ো হয়ে পড়ল নাকি? .....যাকগে, মরুক গে যা হবার তা হবেই। 'তুম্‌হর্সন মিটহি কি বিধি কে অঙ্কা।' তোমার জন্য কি বিধাতার লেখা বদলাবে, ....পঞ্চায়তির জরিমানার টাকার হিসাব চায় গাঁয়ের লোকে। আশ্চর্য রাতারাতি বদলে যাচ্ছে তাৎমাটুলি। মরণাধারে বালির মধ্যে যেন তার পা ধসে যাচ্ছে।'

ঢোঁড়াইও দেখেছে বদল। নিজে সে অংশ নিয়েছে বদলের কাজে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সংগ্রাম করেছে সে নিজের সমাজের সঙ্গে, প্রথার সঙ্গে। এক একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে আত্মমর্যাদা ও আত্মস্বাতন্ত্র্যের সন্ধান পেয়ে ব্যক্তি ঢোঁড়াই সচেতন হয়ে উঠেছে। সক্রিয় হয়েছে বদলের কাজে — কনিষ্ঠ তাৎমারা তাকে অনুমোদন করে সাহায্য করেছে। তার জীবনধারা দ্বারা সমাজের আর পাঁচজন প্রভাবিত হয়েছে। অথচ ঢোঁড়াইও বৌকাবাওয়ার অন্তর্ধান মুহূর্তে অন্তরের গভীর থেকে অনুভব করেছে—'চলে যাওয়ার দিন এসেছে, ঢোঁড়াইয়ের দুনিয়ায়। শনিচরাটা চলে গেল, ধাঙড়টুলি ছেড়ে ; সেও যাওয়ার আগে দেখা করে গেল না। ঢোঁড়াই ভাবে যে সকলেই তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, পাড়ার মাতব্বরগুলো পর্যন্ত। সেদিন চৌকিদারি খাজনার কথাটা হাকিমকে বলার পর থেকে বাবুলাল আর দুখিয়ার মা তার বাড়িতে আসে না। মহতোর তো কথাই নেই। রতিয়া ছড়িদার আর বাসুয়া নায়েব, সেই পুলিশ আসার দিন থেকে তার সঙ্গে কথা বলে না। থাকার মধ্যে আছে রামিয়া। পৃথিবীর সবকিছু আয়নায় হঠাৎ আলো পড়ার মতো মধ্যে মধ্যে সেখানে ঝলক ফেলে, আবার তখনই কোথায় তলিয়ে যায়।' কিন্তু ঢোঁড়াই তো সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সত্যান্বেষণে ব্রতী হয়েছে। পাক্কীর কাজ, গান্ধীজীর জীবনান্দোলনের প্রভাবে, গাড়ীর গাড়োয়ান হয়ে জগৎসন্ধানী হয়েছে। তাৎমাটোলার বাইরের বৃহৎ জগৎ তার বিচিত্র খবরের সঙ্গে সে পরিচিত হয়, পরিচিত করায় তার সমাজের মানুষদের। চিন্তাধারা, ভাবধারা, দৃষ্টিভঙ্গি মানসভঙ্গির পরিবর্তনে সে সাহায্য করেছে নিজেকে ও সমাজকে বদলাতে। তাকে তো চলে যেতে হবেই সব ব্যক্তিগত বন্ধনসুখ ছেড়ে।

দ্বিতীয় চরণে বিসকান্ধার কৃষিনির্ভর সমাজ জীবনের চিত্র ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। একদিন একরাত হেঁটে জিরানিয়ার অন্য অংশ বিসকান্ধায় পৌঁচেছে। শুধু পথের দূরত্ব নয়, কালের ব্যবধানেও এখানকার রূপ ভিন্ন—সমাজচিত্রের ভিন্ন রকমফের দেখা যাবে। ঢোঁড়াই নিজেও অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে—জীবনের আবেগময় অংশ রামপিয়ারির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। অনেক নিস্পৃহ নিরাসক্ত এখন সে। দ্বিতীয় চরণে তার

আত্মনিরপেক্ষ সত্তা পেয়েছে ভিন্নক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উন্মাদনার দিনগুলি ততদিনে আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। ঢোঁড়াই সহজেই সেই তরঙ্গে আত্মসমর্পণ করেছে—আত্মমর্যাদা পেয়েছে। নেতৃত্বের ভূমিকায় বিসকান্ধার কোয়োরীটোলার মানুষগুলির কাছাকাছি এসেছে। কৃষিনির্ভর সমাজের সাধারণ মানুষগুলির মাটির সঙ্গে নিবিড় অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জীবনের কৃত্য-করণ, আচার-আচরণ মৃত্তিকাকেন্দ্রিক। 'তাৎমাটুলিতে জমির গল্প কেউ করত না। জমিদারের গল্প করত কালে ভদ্রে। কিন্তু এখানকার হাওয়াই অন্যরকম। এখানকার হাসি কান্না গল্প রঙ্গ তামাশা সবই চাষবাস আর জমিদারকে নিয়ে।' কিন্তু মাটি ফসল এ সবের প্রতি অধিকার তারা অর্জন করে নি। ভূমিকে ভালবাসলেও ভূমির ওপর তাদের কোনো জোর নেই। সে সব ভোগ করবে দূরের মানুয বাবুসাহেব, বচ্চন সিং, আনোখিবাবুরা। আর বিল্টা, বুড়হাদাদা যারা ক্ষেতের ফসলের সবুজে বিসকান্ধাকে দেয় নিত্য প্রাণশক্তি তারা খাজনার দায়ে পীড়িত হয়, ফসলের ভাগের জন্য ভিক্ষে করে। দারিদ্র্য আর শোষণ এদের নিত্যসঙ্গী। তার ওপর সময়টা বড়ো খারাপ। সারা দেশ জুড়ে চলছে আকাল, অনাবৃষ্টি। তার সঙ্গে পয়সার আকাল, শুধু বিসকান্ধায় নয়, সারা জিরানিয়ায়। ঢোঁড়াই-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে এরা এদের অবস্থার কথা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করছে— 'ভাল গাঁ বেছেচ রোজগারের জন্য! আমাদেরই আজকাল খাওয়া জোটে না। যা দিনকাল পড়েছে। দিন দিনই খারাপ হচ্ছে। 'বিধিগতি বাম সদা সব কাহু'। ভগবান সব সময় সকলের উপর নারাজ। দেখা যাক ধানটা পাকলে যদি হালত কিছু বদলায়।'

বিসকান্ধা বড়ো গ্রাম। অনেক দল, মানুষে মানুষে স্বার্থভেদ বিচিত্র এবং জটিল। তাৎমা সমাজের সঙ্গে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শহরের মানুষের সম্পর্ক ছিল কম। কিন্তু বিসকান্ধার সমাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজপুতরা জমির মালিক আর কোয়েরীটোলার মানুষগুলো তাদের আধিয়ার। রাজপুতদের জমির নিত্য শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। কোয়েরীরা তাদের জমিতে চায করে; মেয়েরা ঘরের কাজে ঝি-এর কাজ করে। রাজপুত বাবুসাহেবই জমিদার, কিন্তু গান্ধী ভাবাদর্শ গ্রহণ করে নিজেকে 'কিষান' বলে পরিচয় দেয়। আধিয়াররা অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝে 'কিষান' বলায় সুবিধে আছে— সবরকমের সহানুভূতি, সরকারী সহায়তা পাওয়া যায় আবার খাজনার দায়ে দরিদ্র প্রজার জমি সহজেই গ্রাস করাও যায়। এখানকার লড়াই জমির জন্য, ফসলের জন্য— ঢোঁড়াই বুঝেছে বাবুসাহেবরা স্বেচ্ছায় বীজধান, ফসলের ভাগ দেবে না। জোর করে তা আদায় করতে হবে। বিসকান্ধায় সাধারণ মানুষ এই সূত্র ধরেই জেগে উঠেছে। এই সূত্র ধরেই গান্ধীজীর শিষ্য ভলেন্টিয়ার তাদের কাছাকাছি এসেছে। মাটির আকর্ষণে তারা একজোট হয়েছে। অন্যদিকে বাবুসাহেবও বিরোধী শক্তি গড়ে তুলেছে গিধর মণ্ডলের মতো জমি লোভীকে নিয়ে আর দারোগা পুলিশের সঙ্গে সন্তোষের সম্পর্ক বজায় রেখে। ঢোঁড়াই এই সমাজ সত্যকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে— 'পরিষ্কার সামনাসামনি দু'পক্ষের লড়াই জিনিসটা ঢোঁড়াই ছোটবেলা থেকেই বুঝতে পারে। এ কেমন যেন অনেক দলের লড়াই, অনেক লোকের লড়াই, অনেক রকমের ঝগড়ার মুখ জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কে কোন দলে, কোন দল কখন কোন দিকে বোঝা যায় না। হকের ধন সামলাতে লাগে লড়াই, অথচ এক হাতে লড়া যায় না। তাকে একা

পেয়েই না তাৎমাটুলির পঞ্চরা তাকে যা করবার নয় তাই করেছিল। এই একা লড়া যায় না বলেই লোকের জাতের দুয়ারে মাথা কোটে। তাই না বচ্চন সিং অন্য রাজপুতদের রোজ সন্ধ্যাবেলায় সিদ্ধির শরবত খাওয়ায়। জাতের বাইরের যে লোকের সাহায্য পাওয়া যায়, তার কাছেই লোক আপনা থেকে ছুটে যায়। তাই বাবুসাহেব যায় মুসলমান ইনসান আলির কাছে ; তাই না বাবুসাহেব টানে লালা কায়েত ও রামনেওয়াজ মুন্সিকে তার দিকে। তাই জন্যেই না কায়েরীরা ঢোঁড়াইয়ের মতো রামায়ণ না পড়া লোকেরও সাহায্য চায়।'

কিন্তু বিপদের দিনে এই সমাজের মানুষগুলো খুব স্বাভাবিক ভাবেই সব ঝগড়া ভুলে এক হয় । ১৯৩৪-এর ভূমিকম্প বিসকান্ধার জীবনে 'আকালের' মতোই দুঃসময় আর দুঃস্বপ্ন নিয়ে এসে সাধারণ মানুষগুলোকে আরো ঘনিষ্ঠ করেছিল। বাবুসাহেবেরা, রাজপুতরা এই বিপদের সুযোগে সাধারণ মানুষগুলোর কাছে অন্য চেহারা নিয়ে দেখা দেয় বৃহৎ সুবিধা আদায়ের জন্য। সরল গ্রামীণ মানুষগুলো নতুন করে এদের বিশ্বাস করে 'হাজার হলেও রাজপুতরা ভালা আদমী।'লাডলীবাবুরা ভূমিকম্পে রিলিফের কাজে নেমে পড়ে মহাত্মাজীর কর্মপদ্ধতি ছড়িয়ে দিতে চায় সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। ঢোঁড়াইরা লাডলীবাবুদের উৎসাহ বাক্যে দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে বিপদের মুখ থেকে রক্ষার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জমি থেকে বালি সরায়। লাডলীবাবুরা তাদের বোঝান—'এইতো চাই। নইলে সরকারের ভরসায় বসে থাকলেই হয়েছে। পাক্কীর ফাটল মেরামত হবে তবে আসবেন হাকিম সাহেবরা হাওয়া গাড়িতে। পথ দেখাতে পারলে কি আর সাথে চলার লোকের অভাব হয়? এই কাংগ্রিস আর মহাত্মাজীর হুকুম।' এমনিভাবে লাডলিবাবু তাদের সরল দৃষ্টিতে হয়ে উঠেছিল দেবতা। বিসকান্ধার মানুষগুলোর স্থির কর্মময় জীবনে এমনিভাবে মহাত্মাজী 'কলির রঘুনাথ' বিস্তার করেছিলেন মহত্ত্বের আসন। রিলিফের কাজে তারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল; তাদের বোঝানো হয়েছিল তারা ক্ষতিপূরণ পাবে। কিন্তু সরল মানুষগুলো অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিল এসব আশ্বাসবাক্য। যা কিছু অর্থ সম্পদ তার একচেটিয়া অধিকার ধনী কিষাণদের, আধিয়ারদের নয়। লাডলীবাবুর মতো ভলেন্টিয়ারকেও বিশ্বাস করেছিল। ভোটকে কেন্দ্র করে মানুষগুলো আত্মমর্যাদা লাভ করবার উৎসাহে মেতেছিল; ভলেন্টিয়ারের সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। কিন্তু আবারও তারা বিশ্বাস করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল। এমনিভাবে বিসকান্ধার সাধারণ মানুষের সমাজও থেমে থাকে নি এক জায়গায় ; তাদেরও চিন্তায় ও জীবনধারায় পরিবর্তন হয়েছে। মানুষগুলো নানা উত্তেজনা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গের বেদনার মধ্যে দিয়ে বদলেছে নিজেরা, বদল ঘটেছে সমাজের। সত্যসন্ধিৎসা ও জীবনধর্মিতার, সজীব সমাজ আলেখ্য ঢোঁড়াই চরিতমানসের দুটি চরণের সম্পদ।

বিশেষ অঞ্চলের জীবনধারার আলেখ্য, রীতিনীতি কৃষ্টি আচারের অনুপুঙ্খ বিবরণ থাকলেও "ঢোঁড়াই চরিতমানস" দুটি চরণই অঞ্চলকেন্দ্রিক নয়। অঞ্চল এখানে সব রকমের সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠে সার্বিক জীবনবোধের গাঢ়তায় সীমাহীন সামগ্রিতার সত্যে

ভারতবর্ষের বৃহত্তর জীবন পরিধিকে স্পর্শ করেছে। আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্চলিক জীবনচর্যা তাঁর সাহিত্যে বিশেষ প্রয়োগ রীতি হয়ে আসে নি। এসেছে অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক বাস্তব রূপ নিয়ে। শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিকতার মতোই গোটা উপন্যাসে তা সহজভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এ পরিবেশ বাঙালী পাঠকের অভিজ্ঞতার বাইরে হলেও লেখকের সত্যনিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও জীবনবোধের নিবিড়তায় তা কোথাও অসাচ্ছন্দ্য, আড়ষ্ঠভাব আদৌ সৃষ্টি করে নি। 'আঞ্চলিকতা শুধু ভাষার জিনিস নয়, ভাবের জিনিস— এ সত্য সতীনাথের লেখায় যত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারুর উপন্যাসেই তা বোঝা যায় না।'[১০] সাধারণত আঞ্চলিক উপন্যাসে, মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা; তাদের ভাব-ভাষা-আচার-কৃষ্টি-সংস্কারের সঙ্গে গভীর পরিচয়, সেই সঙ্গে নিবিড় সহানুভূতি ও লেখকের স্বভাবসুলভ নিরাসক্তি লক্ষণীয় গুণ বলে চিহ্নিত হয়। এ সব লক্ষণ সতীনাথের রচনায় বিশিষ্টতা ও সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর সমকালীন আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক অভিধায় খ্যাত লেখকদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি পরিমাণে আঞ্চলিক বোধসম্পন্ন ছিলেন।

তবু সতীনাথ 'আঞ্চলিক লেখক' নন। কারণ আঞ্চলিক উপন্যাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঞ্চল বিশেষের প্রতি আকর্ষণে স্থানিকরূপটি প্রাধান্য পায়। কোনো বিশেষ অঞ্চল তার সম্পূর্ণ সত্তা নিয়ে উপন্যাসে নিজেই একটি চরিত্র বা প্রতীক হয়ে ওঠে। সতীনাথের উত্তরণ এখানেই। 'ঢোঁড়াই চরিত' দেহাতী মাটির গন্ধে, গাছ-লতাপাতার ঘ্রাণে, গ্রাম্য মানুষের চরিত্রে, সরল বিশ্বাস, ধর্মবোধ, সংস্কার, আচার-আচরণে এবং অন্যান্য বহুবিধ গুণে যে পরিমণ্ডল রচনা করেছে তা ভারতীয় জীবনের অকৃত্রিম রূপ।'[১১] অঞ্চল এখানে বিশেষায়িত নয়, নির্বিশেষ সত্য জীবনদর্শনে তা সার্থক ও শাশ্বত হয়ে উঠেছে। পূর্ণিয়ার ভৌগোলিক প্রতিবেশ বর্ণনা তাঁর লক্ষ্য নয়। তিনি মানবের চিরন্তন মানবিক সত্তার রূপান্তরের সত্যটিকেই যথার্থভাবে ধরতে চেয়েছেন। তিনি সারা জীবন ধরে মানুষকে দেখেছেন, ভালোবেসেছেন। সাধারণ মানুষের 'প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে' শুধু তাদের জীবনধারাকে আবেগময় দৃষ্টিতে দেখেন নি। তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছিলেন। 'ঢোঁড়াই প্রবন্ধে এ সম্পর্কে পরিষ্কার তিনি জানিয়েছেন 'ধূর্ত অথচ অকপট, নিরক্ষর অথচ জটিল প্রশ্নের সরল সমাধানে সক্ষম; নিজে অন্যায় করে অথচ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনো সময় রুখে দাঁড়াবার সাহস রাখে; স্বার্থপর অথচ একটা অসহায় পশুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত; রঙ্গরসে ভরা বিচিত্র এই ঢোঁড়াই-এর চরিত্র বহুদিন থেকে আমাকে আকর্ষণ করত।'[১২] তাহলে দেখা যাচ্ছে, সতীনাথ এই সমাজের মানুষগুলি ও বিশেষ করে ঢোঁড়াই সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক ছিলেন প্রথম থেকেই। এই সমস্ত মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের গভীরতার সূত্রেই ধরতে চেয়েছিলেন তাদের জীবনের মূল্যবোধকে। জানতে চেয়েছেন কিভাবে নানাধরণের পারিপার্শ্বিকতার চাপে তাদের চিন্তাধারা, ব্যক্তিত্ব, সামাজিক চেতনা ও ব্যক্তি চেতনার মধ্যে ক্রমরূপান্তর ঘটেছে। "ঢোঁড়াই চরিত'-এর দুটি চরণে ঢোঁড়াইকে সেই রূপান্তরের প্রতিনিধি চরিত্র রূপে আঁকতে চেয়েছেন। সুতরাং বিশেষ অঞ্চলের মানুষকে ও তার পরিবেশকে দেখা, বাইরের রূপকে উজ্জ্বল করে তোলা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ভাব-ভাবনায়, ভাষায় ও স্বরূপে সমাজ সংলগ্ন সাধারণ

মানুষের জীবনবোধের গভীরতা প্রকাশই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। সতীনাথ রাজনৈতিক জীবনে এসে বৃহত্তর জন-সংযোগ লাভ করেছিলেন বলে অনেকেই মনে করেন। রাজনীতির সম্পর্কে এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও সাহচর্য গভীর হয়েছিল, একথা ঠিক। কিন্তু রাজনীতি, বৈদগ্ধ এসবের গভীরে ছিল তাঁর সত্যসন্ধিৎসা, অন্বেষণধর্মিতা ও অকৃত্রিম জীবনমুখীনতা। এই কারণেই ব্যবহারজীবী রূপে বেশিদিন একাত্ম হতে পারেন নি। রাজনীতিতে এসেও রাজনীতির স্বার্থ-নীতি তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল কারণ আংশিক দৃষ্টির সীমাবদ্ধতায় জীবনকে সম্পূর্ণ দেখা যায় না। নিজেই নিঃশব্দে সরে এসেছেন এইসব জায়গা থেকে। কিন্তু কাজ তাঁর শেষ হয় নি। আসল কাজ সম্বন্ধে ক্রমেই হয়ে উঠছিলেন সচেতন। অন্তরে তাগিদ অনুভব করেছিলেন সেই কাজকে আকার দেবার। '৪২-এ জেলে বসেই পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। রাজনীতি ছেড়ে বাকী জীবন ধরে সেই কাজেই ছিলেন অনুসন্ধানী ও আত্মমগ্ন। জীবনশিল্পীর চিরন্তন দৃষ্টি দিয়ে জীবনের যথার্থ স্বরূপ সন্ধান করা ও জীবনবোধকে অভিজ্ঞতার আলোকে রূপায়িত করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি জীবনব্রতী। বৃহত্তর জীবনকে সত্যের আলোকে তুলে ধরার ব্রতচারণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন জীবন-রসিক। ব্যক্তিজীবনে একক, নিঃসঙ্গ হলেও জীবন-সাধনায় তিনি পেয়েছিলেন সকলকে—জনগণকে। 'ঢোঁড়াই চরিতে'র পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে মানুষের ও সমাজের পরিবর্তমান গতিশীল জীবনের রূপ যার মধ্যে দিয়ে গোটা ভারতবর্ষের জনজীবনের চেহারাটা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে "ঢোঁড়াই চরিতমানস" পেয়েছে মহাকাব্যের বিশাল ভূখণ্ডের ব্যাপ্তি।

"ঢোঁড়াই চরিতমানস" সমাজ সত্যে অন্বিত ব্যক্তি মানুষের সংগ্রামমুখর জীবনের কাহিনী। লেখক চেয়েছিলেন ঢোঁড়াইকে জনপ্রতিনিধি করতে। এ উপন্যাসের দুটি চরণেরই জনজীবন বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে। দুটি চরণেই ব্যক্তি ক্রমিক বিকাশ ও দ্বান্দ্বিক পরিণতিই প্রাধান্য পেয়েছে। সেই সঙ্গে তার সামাজিক ও ব্যক্তিসত্তার দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের ক্রমিক ইতিহাসও গুরুত্ব লাভ করেছে। অন্ত্যজ সমাজের অতি সাধারণ ঢোঁড়াই নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসে হয়ে উঠেছে ঢোঁড়াইরাম— শ্রেণী মানুষের প্রতিনিধি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার তাকে ফিরে আসতে হয়েছে ব্যক্তিজীবনের আবর্তে। কারণ লেখক জানতেন জন্ম মুহূর্ত থেকে মানুষ একা। একক ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে তাকে মিলিত হতে হয় বহুর সঙ্গে। সংগ্রাম শেষে আবার তার পরিচয় এককরূপেই। সেই একক মানুষ— ব্যক্তি ঢোঁড়াই-ই এ উপন্যাসের নায়ক। তার ট্র্যাজিক জীবনকথাই শেষ পর্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে। এ চরিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে লেখক প্রথম থেকেই ছিলেন অতি সচেতন। তিনি আত্মমুখী মননশীল চেতনার গভীর অনুসন্ধানের সাহায্যে ঢোঁড়াই-এর সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনধারার ক্রম বিকশিত রূপ সম্পর্কে পাঠককে নিশ্চিত প্রত্যয়ে পৌঁছে দিয়েছেন। মানসিক রূপান্তরের প্রতিটি স্তর পেরিয়ে ঢোঁড়াই চরিত্রের বলিষ্ঠ ব্যক্তিসত্তাটি রূপায়িত হয়েছে। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক বদলের চিত্রটি লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে স্পষ্ট করেছেন।

সমাজের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের ফলেই ব্যক্তির মানসিক রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী— এ বিশ্বাস রচয়িতার। এরই ফলে ঢোঁড়াই চরিত্রে ঘটেছে ব্যাপ্তি ও বিস্তার। এ উপন্যাসে এসেছে মহাকাব্যের বিশালতা। ঢোঁড়াই যেন একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল ট্র্যাজিক চরিত্র ও বিশাল মহাকাব্যের লোকনায়ক।

এ চরিত্রটি সতীনাথের বাস্তবের পরিচিত 'ঢোঁড়াই' বা 'ঢোঁড়াহই' চরিত্র। এ নামটা অন্ত্যজ সমাজে খুব চলে বলে লেখক জানিয়েছেন। শিক্ষিত, শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে এ নাম পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারিত হয়— ঢোঁড়াই; যেন ঢোঁড়া সাপ— নির্বিষ। বাস্তব ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সে নিজে থেকেই লেখককে তার জীবনের অনেক কথা অকপটে জানিয়েছে। আর লেখকও কল্পনা করেছিলেন এ চরিত্রকে ঘিরে। ব্যক্তি ঢোঁড়াই ছিল বাক্‌পটু, 'তার সমাজের সকলের মধ্যে সেরা।' তিনি তাকে দেখেছেন বহু-মূর্তিতে। লেখক নিজেই বলেছেন— 'তাকে ভিক্ষা করতে দেখেছি, ঘর ছাইতে দেখেছি, গোরুর গাড়ি চালাতে দেখেছি। ইদানীং সে হয়েছিল রাজমিস্ত্রি-ঠিকেদার।' এ ঢোঁড়াই কুয়োর বালি ছাঁকতে, পাড় বাঁধতে ওস্তাদ। আবার ডালি সাজিয়ে চেয়ারম্যানকে ঘুষ দিয়ে ধাঙড়টুলির সরকারী ইঁদারার কাজে ঠিকে কাজটা পেতেও ইতস্তত করে না। শুধু তাই নয়, লেখকের মতে, 'আমার চেনা ঢোড়াই-এর চরিত্রে আর একটা দিকেরও একটু আভাস দেওয়া দরকার। সে একবার একটা দুরমুশ চুরি করে ধরা পড়েছিল। আর একবার টাকা খেয়ে, জাতের পঞ্চায়েতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে একজনের বিবাহিতা স্ত্রীকে অপরের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করেছিল। এ ছাড়া আরও অনেক দোষ ছিল ঢোঁড়াই-এর। তার সবগুলোই দারিদ্র্যজনিত নয়।'[১৩] এই হলো লেখকের চোখে দেখা বাস্তব ঢোঁড়াইয়ের চরিত্র। অজস্র দোষে ভরা। অথচ একেই, ''রামায়ণে''র রাম চরিত্রের মতো করে আঁকতে চাইলেন। কিন্তু কেন? সে উত্তরও সতীনাথ দিয়েছেন— 'আমার বই-এর নায়ক চরিত্রের আদরা হিসাবে ঢোঁড়াইকে বাছবার কোনো সংগত কারণ ছিল না। চোখের সম্মুখে একটা নকশা থাকলে আঁকবার সুবিধা হয়। পরে সেটার উপর একমেটে কর, দোমেটে কর; প্রয়োজন আর রুচি অনুযায়ী রঙ আর অলংকার দাও। নাইবা থাকল উপলেপের ফলে প্রাথমিক মূর্তির সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য, তবু এই যেন সহজ বলে মনে হয় আমার কাছে।

ধূর্ত অথচ অকপট; নিরক্ষর অথচ জটিল প্রশ্নের সরল সমাধানে সক্ষম; নিজে অন্যায় করে অথচ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনো সময় রুখে দাঁড়াবার সাহস রাখে; স্বার্থপর অথচ একটা পশুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত; রঙ্গরসে ভরা বিচিত্র এই ঢোঁড়াই-এর চরিত্র বহুদিন থেকে আমাকে আকর্ষণ করত। তাই আমার কাজের পক্ষে অনুপযোগী হলেও, রামের খোঁজে বেরিয়ে, তার কথাই আমার সবচেয়ে আগে মনে পড়েছিল।'[১৪]

ঢোঁড়াইকে লেখক নিজের মতো করে নিয়েছেন, বদলেছেন। ঢোঁড়াই-এর চরিত্রে বিচিত্র সদগুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন শুধু ব্যক্তি ঢোঁড়াই-এর স্বভাব অনুসরণ করে নয়, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াবার সময় লেখক ঢোঁড়াই-এর সমাজের সাধারণ লোকদের চরিত্রে যা কিছু ভালো দেখেছিলেন, সেগুলিরই সমাবেশ ঘটিয়েছেন উপন্যাসের ঢোঁড়াই চরিত্রে। কারণ,

শ্রীরামচন্দ্রকে কানা খোঁড়া দেখানো চলে না', আর ঢোঁড়াইকে 'এ যুগের শ্রীরামচন্দ্র করবার কঠিন কাজ ছিল' তাঁর সামনে। 'তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষদের মধ্যে'— এই হলো লেখকের মতামত। তাই ঢোঁড়াই চরিত্রের ত্রুটি, ভয়ঙ্কর দোষগুলি পরিহার করে তাকে গড়ে তুলতে চাইলেন নতুনভাবে— 'কর্তব্যের পথে অবিচলিত থাকবার দৃঢ়তা ও যে কোনো বাধা ঠেলে পথ করে নেবার সাহস তার মধ্যে আনতে হল। তার স্বভাবের হালকা রঙ্গরসের দিকটা যাতে উচ্চারিত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখলাম, কেন না নেতার পক্ষে ও জিনিস বেমানান হত।'[১৫]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঢোঁড়াই চরিত্র নিয়ে লেখক অনেক ভেবেছেন। তাকে প্রথম থেকেই 'বিশেষ', করতে চেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের নেতৃত্ব দেবার জন্য তাকে বেছে নিয়েছিলেন লেখক এবং উপন্যাসের দুটি চরণেই ঢোঁড়াই-এর বিচিত্র ধরণের ক্রমিক রূপান্তরের সাহায্যে বাংলা কথাসাহিত্যে এক বিশিষ্ট নায়ক চরিত্র সৃষ্টি করলেন। ঢোঁড়াই আমাদের পরিচিত নায়ক, সমাজের কেউ নয়। আবার অতি সাধারণ চরিত্র যারা ধীরে ধীরে বাংলা উপন্যাসে ক্রমেই নায়কত্ব পাচ্ছিল সেই করালী বা কুবেরও নয়। সে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পথের সূচনা করল যেখানে সে আজও একা ও অনন্য। আবার মাত্রার গুরুত্বে সে 'গোরা'র সমগোত্রীয় মহাকাব্যোপম উপন্যাসের নায়ক হবার দাবি রাখে। এই চরিত্রকে নিয়ে আর একটি চরণও লেখবার বাসনা ছিল লেখকের। আবার এমন ভাবনাও সতীনাথের স্বীকারোক্তিতে পাওয়া যায় 'যতদিন বাঁচব ঢোঁড়াইদের মনের রূপরেখা এঁকে যাব।' তাঁর মতে 'ঢোঁড়াইদের চরিত্র মানসসরোবরের মতো গভীর।'

প্রথম থেকেই লেখক ঢোঁড়াইকে করতে চেয়েছিলেন প্রতীক চরিত্র। একই সঙ্গে তাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন 'ব্যক্তি ঢোঁড়াই' ও'সমগ্র ঢোঁড়াইদের' প্রতিনিধিরূপে। সে একই সঙ্গে 'কমনম্যান' আবার সেই সঙ্গে 'ইনডিভিজুয়াল। কিন্তু লেখার পর অতৃপ্তি জেগেছে। ঢোঁড়াই 'রামচন্দ্র ' হয়ে ওঠে নি। তাকে মনে হয়েছে average, typical Indian character. আবার ডায়েরিতে অন্যত্র বলেছেন 'ঢোঁড়াই is the type not average'.

এ সকল স্বীকারোক্তি থেকে মনে হয়, লেখকমানসে ঢোঁড়াই চরিত্রটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশক্ষম হয়েছে। অতৃপ্ত লেখক তাকে বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে ক্ষুদ্রগণ্ডী থেকে বৃহৎ পটভূমিতে স্থাপন করে আকার দিতে চেয়েছেন। সমস্যা-সঙ্কট, সুখ-দুঃখ আনন্দ ও আর্তির বিচিত্র অভিব্যক্তির মাধ্যমে ঢোঁড়াইকে লেখক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। কোনো পরীক্ষাই শেষ পর্যন্ত লেখকের কাছে সঠিক মনে হয়নি বলেই ঢোঁড়াই চরিত্রের অন্তর্লোক তন্ন তন্ন করে সন্ধান করেছেন।

মননিষ্ঠ, আত্মমুখী লেখকের ক্রমাগত অনুসন্ধিৎসার ফলে বাংলা সাহিত্যে এক অখ্যাত, অবজ্ঞাত, নামের অগৌরবে, অপরিচিতির সহস্র আবরণ ভেদ করে ঢোঁড়াই হয়েছে বিশিষ্ট নায়ক— সতীনাথের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের সার্থকতম নায়ক। এ চরিত্রের বাস্তব জন্ম যে অযোধ্যা বা জীরানিয়াতেই হোক না কেন; এর প্রকৃত বীজ তো রোপিত হয়েছে জনজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতায় প্রগাঢ় মগ্নচৈতন্যের সাধক সতীনাথের 'মনোভূমিতে। সেই চেতনালোকের আলোকরশ্মির সঞ্জীবিত শক্তিতে পূর্ণ ঢোঁড়াই চরিত্র। তাই ঢোঁড়াই রোমের 'আদরায়'

চিত্রিত হলেও সত্য পূজক, ন্যায় বিচারক 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' নয়। এ যুগের যন্ত্রণার আধার থেকে উঠে আসা এক নিঃসঙ্গ মানবিক চরিত্র।

ভালোমন্দ, প্রেম-অপ্রেম ও আনন্দে-ক্রোধের বিচিত্র সংঘাতে বাঙ্ময় হয়েছে ঢোঁড়াই-এর মন। বাইরে বিচিত্র বাধায় সংঘাতের প্রাবল্যে জেগে ওঠে তার সংগ্রামী চিত্ত- 'বাধা না পেলে ঢোঁড়াইয়ের আসল রূপ খোলে না।'[১৬] জন্মের পর থেকেই বিচিত্র বাধা বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে ঢোঁড়াই এগিয়েছে। দুবছর বয়সের আগেই ঢোঁড়াই হয়েছে পিতৃহারা-মাতৃপরিত্যক্ত। বৌকাবাওয়ার নিঃস্বার্থ স্নেহসিঞ্চন ছাড়া ঢোঁড়াই-এর জীবনে আর সজীব স্পর্শ ছিল না একথা ঢোঁড়াই জ্ঞানোদয় থেকেই অনুভব করেছে। আর যত বড়ো হয়েছে ততই অনুভব করেছে যে এ সংসারে সে একা। জেনেছে বৌকাবাওয়া ভালবাসলেও ঢোঁড়াইকে রক্ষা করার সামর্থ তার নেই। তাই অল্প বয়স থেকেই সে দক্ষ হয়েছে জীবিকা সন্ধানে। ভিক্ষে করতে গিয়ে বালক ঢোঁড়াই যে সব কৌশল প্রয়োগ করেছে অল্পবয়স থেকেই, তা বাওয়াকে পর্যন্ত মুগ্ধ করেছে। বাটহির গানে কি করে শহরে মানুষকে আকৃষ্ট করতে হয়; কিরকম ভঙ্গি করলে সহজে বেশি পয়সা পাওয়া যায় সে জানত। গানের টানে তার ছাতির জোর প্রকাশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জৈবিকসংগ্রামের সম্পর্ক। এ সংগ্রাম শুরু হয়েছে অতি শৈশব থেকেই। আর সংগ্রামের ফলেই সে মনে মনে সমাজের আর পাঁচজনের সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্য অনুভব করেছে। অবশ্য এই অনুভবের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়েছিল ঢোঁড়াইয়ের অভিমানবোধ ও ক্ষুব্ধতা। এ ক্ষোভ একাকিত্বের; এর জন্য সে দায়ী করেছে তার মা বুধনিকে এবং তার নিজের তাংমা সমাজকে। ক্রোধ ও ক্ষোভে সে মায়ের সঙ্গে রচনা করেছে দূরত্বের ব্যবধান। বাবুলাল চাপরাসীর (সৎবাপ) ওপর জন্মেছে প্রবল ঈর্ষা ও অবহেলা। আর সমাজের প্রতি জেগেছে প্রতিশোধের স্পৃহা; সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হয়েছে ঢোঁড়াই। সমাজকে সে ছেড়ে যায় নি, অস্বীকার করে নি। সমাজের মাঝখানে থেকে নিজের পাওনা আদায় করতে চেয়েছে— কারণ আত্মরক্ষা করে অস্তিত্ব বজায় রেখে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেতে চেয়েছে ঢোঁড়াই। এ সংগ্রামের আর এক নাম জীবনসংগ্রাম। আত্মমর্যাদার আঘাতে আহত ঢোঁড়াই-এর ব্যক্তিত্ব এমনিভাবেই দৃঢ়তা পেয়েছে উপন্যাসের প্রথমচরণেই। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগ্রামের ভূমিতে একের পর এক বাধা দূর করে এগিয়ে গেছে ঢোঁড়াই। যত বয়স বেড়েছে ততই সে তার মাকে এড়িয়ে গেছে। স্বাভাবিক নিয়মে বুধনিও কখন ঢোঁড়াইয়ের মা থেকে রূপান্তরিত হয়েছে দুখিয়ার মা রূপে। অবশ্য উপন্যাসে ঢোঁড়াই-এর অসুখের সংবাদে বুধনির মাতৃত্বের প্রকাশ ও রোগজীর্ণ ঢোঁড়াইয়ের মাকে আঁকড়ে থাকায় চিরন্তন মানবিক সম্পর্কটি লেখক কৌশলে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। একটু সুস্থ হতেই ঢোঁড়াই-এর স্বাতন্ত্র্যবোধ স্পষ্ট হয়েছে, সে সরে এসেছে। কিন্তু তার সবচেয়ে রাগ জাত-জীবিকাকে আঁকড়ে থাকা, জীর্ণ সংস্কারের জগদ্দলের প্রতি আনুগত্যে জর্জরিত 'বগুলাভকত' মাহাতো পঞ্চদের বিরুদ্ধে। সে জানে এদেরই অবিবেচনা অদূরদর্শিতায় তার এই পরিণতি। তার সমস্ত ক্রোধ এদেরই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে। সে আঘাত করতে চেয়েছে সমাজকে। জীবিকারীতির প্রথা ভেঙ্গে পাক্কীতে কাজ নিয়ে ক্রীশ্চান ধাঙড়গুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সমাজকে সে বড়ো আঘাত দিয়েছে।

শুধু তাই নয় সমাজবদ্ধ বিবাহপ্রথা ভেঙ্গে সে অন্যদেশের মেয়েকে বিয়ে করেছে। জাতের গণ্ডী অতিক্রম করেছে পৈতে নিয়ে ও অন্যদের উৎসাহিত করেছে—এসব ঘটনা ঢোঁড়াইয়ের ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিচিত্র স্তর ও তার মানসিক বলিষ্ঠতার প্রকাশ। এই সমস্ত স্তর অতিক্রম করেই সাধারণ ঢোঁড়াই হয়েছে স্বতন্ত্র। তাৎমা সমাজের সমবয়স্কদের কাছে সে কখন নিজেরই অজান্তে হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট জন, পঞ্চ মাহতোরাও ঢোঁড়াইকে সম্পূর্ণ মেনে নিতে না পারলেও অস্বীকার করতে পারে নি। সে নিজে বদলেছে ও সমাজকে বদলাতে সাহায্য করেছে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই পর্বটিতে ঢোঁড়াই নিজেই সম্পূর্ণ করেছে নিজের বৃত্ত। আত্মপ্রতিষ্ঠার পর্ব সম্পূর্ণতা পেয়েছে রামিয়ার সঙ্গে বিবাহে। যৌবনের সূচনায় সে পেয়েছে অল্পকালের জন্য সুখ, নিশ্চিন্ততা ও আংশিক প্রতিষ্ঠা। পাক্কীর কাজ থেকে গাড়ীর গাড়োয়ানে রূপান্তরিত হয়ে সে পেয়েছিল অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও জীবনের একটা অস্ত্যর্থক দিকের সন্ধান। রামিয়াকে ঘিরে তার বঞ্চিত হৃদয় পেয়েছিল উষ্ণ আবেগের স্পর্শ—ঢোঁড়াই ভেবেছিল সে পেয়েছে শান্তি ও সুখের স্বাদ। কিন্তু সে জন্ম থেকে ছিন্নমূল, সে কি সুখের শিকড় বিস্তার করতে পারে? ঢোঁড়াই পারে নি তাৎমাটুলিতে নিজের স্থায়ী বাসভূমি গড়ে তুলতে—'যখনই ঢোঁড়াইয়ের জীবনটা চলনসই গোছের হয়ে আসে, অমনি একটা করে আঁধি উঠে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। তার জীবনে বরাবর লক্ষ্য করে আসছে ঢোঁড়াই।'

প্রথম চরণে ঢোঁড়াই বিরুদ্ধতা ও বিক্ষোভের সাহায্যে সমাজকে আংশিক প্রভাবিত করতে পারলেও শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে নিজে পরাজিত হয়েছে; সামুয়েল ও পঞ্চদের চক্রান্তে ঢোঁড়াই হেরে গিয়েছে নিজের কাছে। রামিয়াকে কেন্দ্র করে যে বিশ্বাসঘাতকতার ব্যূহ তৈরী করেছিল তার সমাজ, সেখানে সে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। পঞ্চদের দেওয়া বাইরের আঘাত সে প্রত্যেকবারেই ফিরিয়ে দিয়েছে প্রত্যাঘাত করে। কিন্তু রামিয়া তার হৃদয়ের সর্বস্ব— বিশ্বাসের সেই বলিষ্ঠভূমি যখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল তখন তাকে মিথ্যে আঁকড়ে থাকা ঢোঁড়াইয়ের মানসিক গঠনের বিরুদ্ধ কাজ। তাই সে তাৎমাটুলিতে থাকার আর প্রয়োজন বোধ করে নি; বা, বিসকান্ধা আর তাৎমাটুলির ব্যবধান ঘোচাবার চেষ্টা সে করে নি আর কোনোদিন। বরং একটা পরাজয়ের বেদনা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বলেই কোয়েরীটোলার জীবনে অতীতের তিক্ত পর্বটাকে নানাভাবে আড়াল করে রাখতে চেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাহতোকে তারই গাড়ীটা চালিয়ে বিসকান্ধায় আসতে দেখে নিজেই আশ্রয় নিয়েছে পাক্কীর অন্তরালে। এখানেও অভিমান আর ব্যর্থতার ক্ষোভ তাকে সঙ্কুচিত করে রেখেছে। ঢোঁড়াইয়েব বিড়ম্বিত জীবনের ট্রাজিক বৃত্তটি প্রথম চরণে এইখানেই সম্পূর্ণতা পেয়েছে। সকল বন্ধন ছিন্ন করে তাৎমাটুলির সীমা পেরিয়ে এসে সে দাঁড়িয়েছে পাক্কীতে। তার স্বপ্নের পাক্কী তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূরে। ঢোঁড়াই ব্যক্তি সম্পর্কের আত্মীয়তার সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে নির্বিশেষের মধ্যে। পৌঁচেছে বিসকান্ধায়। মাটি আর মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় ঢোঁড়াইয়ের শুরু হয়েছে নতুন করে সংগ্রাম। এইখানেই ফুটে উঠেছে কর্মচঞ্চল ঢোঁড়াইয়ের আর এক দৃঢ় বলিষ্ঠ রূপ।

বৃহৎ জীবনের বিচিত্র পটভূমিতে ঢোঁড়াই হয়েছে প্রতিনিধি। দ্বিতীয় চরণেও ঢোঁড়াইয়ের

ক্রমিক মানসিক বিবর্তনের ইতিহাসটি অব্যাহত রয়েছে। এই পর্বে তার জীবনের প্রবাহ সমান্তরাল রেখায় এগিয়ে গেলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। সাগিয়াকে কেন্দ্র করে এক ধরণের স্মৃতিসুখ লালন করেছে ঢোঁড়াই। সাগিয়াই ঢোঁড়াইকে ভুলতে দেয় নি তার অতীত জীবনকে— রামিয়ার তিক্ত স্মৃতি আর তাৎমাটোলার প্রতি জন্মসূত্রের আকর্ষণকে। সাগিয়া তার জৈব কামনাহীন প্রেম নিয়ে পুরোনো জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছিল ঢোঁড়াইয়ের অবচেতনে। এই অবচেতনই কার্যকারণ রচনা করেছিল অনেক পরে আজাদ দস্তার ভগ্ন জীবনে যখন ঢোঁড়াই আর একবার 'ব্যক্তি ঢোঁড়াই' হয়ে ছুটে গিয়েছিল 'স্বর্ণসীতা'র সন্ধানে। তাছাড়াও সাগিয়ার কামনাহীন প্রেম ঢোঁড়াইকে আধিয়ারদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হবার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

বৃহত্তর জীবনের আহ্বান ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে জমির লড়াইয়ে ভলেণ্টিয়ারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় ও গান্ধী আদর্শে গভীর আস্থা স্থাপনে। ঢোঁড়াই এ পর্বে অত্যন্ত সক্রিয়, কর্মদক্ষ ও কর্মচঞ্চল। অভিজ্ঞতার সাহায্যে আর অজস্র আদর্শ সংঘাতের মধ্যে দিয়ে ঢোঁড়াই নিজেরই অজান্তে রাজনীতির আবর্তে প্রবেশ করে। ক্রান্তি দলে যোগ দেয়। এখানেও শ্রমতৎপরতায় সে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু তার নিজের মোহ ভঙ্গ হয়। এই মোহ ভঙ্গের জন্য একটা জিনিসের দরকার ছিল তা হলো অক্ষরজ্ঞানের। অশিক্ষিত, অবজ্ঞাত জাতকলহের নাগপাশে আবদ্ধ সমাজের ঢোঁড়াই শিক্ষার আলোকে হয়ে ওঠে রামায়ণজী। অবশ্য রামায়ণ তার জীবনের সঙ্গে সংস্কারের মতোই জড়িয়েছিল জন্মমুহূর্ত থেকে এবং রামায়ণের আদর্শে বিশ্বাস ও ন্যায়বোধ ঢোঁড়াইয়ের জীবনে প্রথম থেকেই প্রবল অনুপ্রেরণার কাজ করেছে। রামায়ণই তাকে বারবার এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে সত্যের পথে। আজাদ দস্তার কৃত্রিমতার মাঝখানেও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ঢোঁড়াই আশ্রয় পেতে চেয়েছিল 'রামায়ণে'। তাই দলের মধ্যে থেকেও নিজেকে সমর্পণ করেছিল রামায়ণের মধ্যে। কিন্তু ঢোঁড়াই কোনো আদর্শ নয়, সে রক্ত মাংসের মানুষ। তার চলিষ্ণু সত্তা কিছুতেই আত্মস্থ হতে পারে নি। ক্রমাগত সংগ্রামে আর ব্যর্থতায় তার চিত্ত বিক্ষুব্ধ, অস্থির। জীবনের যে অংশকেই সে আপন বলে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে সেখানেই সে লাভ করেছে তিক্ত অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় চরণে জমির লড়াইয়ে বা রাজনৈতিক জীবন সংগ্রামে সে জেনেছে বিশ্বাসের ভূমি বড়ো ভঙ্গুর। 'পাক্কী' আর 'রামায়ণ'— এই দুই ছিল ঢোঁড়াইয়ের জীবনের অবিচল সত্য, আদর্শ ও স্বপ্ন। তার বিশ্বাস ছিল— 'ক্ষেতের রঙ বদলায়, লোকের মন বদলায়, আজকের ছোট ছেলেটা কাল জোয়ান হয়ে ওঠে, রোজার 'তাকত' কমে, রোজগারের ধারা বদলায়, তাৎমাদের মোড়ল গোরুর গড়ি চালায়, দুনিয়ার সব জিনিস বদলায়। বদলায় না কেবল পাক্কী আর রামায়ণ। এ দুটোর সঙ্গে যে নাড়ি বাঁধা তার।' কিন্তু অভিজ্ঞতার আঘাতে ঢোঁড়াই এই দুইয়ের প্রতিই আস্থা হারিয়েছে। তার স্বপ্নের পাক্কীর চেহারা দেখে সে ভয় পেয়েছে— 'পাক্কী ঢোঁড়াইয়ের কাছে একটা সজীব জিনিস। তার কোনোরকম সন্দেহ নেই যে পাক্কীটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। লোহাতে ঘুণ ধরেছে, সোনাতে মরচে পড়েছে, এ কি কলির শেষ হয়ে এল নাকি, .....দুনিয়াটা ঠিক বদলাচ্ছে না, ভেঙে পড়ছে, হুড়মুড় দুমদাম করে। এর খুঁটিগুলো এত পলকা তা আগে জানা ছিল না। পায়ের নিচের শক্ত

মাটি, তাতে দাঁড়িয়েও যেন নিশ্চিন্দি নেই,... রোজার রাজ্যে উড়ে এসে বসেছেন রাজা— সরকার বাহাদুর। এতদিন 'ইনরধনুর'— আড়ালে 'ইনরজী মহারাজের' মতো ছিল সাত-সমুদ্দুর তের নদীর পারের রাজা সূর্যি ঠাকুরকে সেই রূপকথার রাজা রাখতেন দারোয়ান। সে দারোয়ানের চোখের পলকটুকু পর্যন্ত ফেলবার হুকুম ছিল না। রাজপুত্তুর 'চলাকুমার আর বিজাসিং'-এর রূপটা তবু পালা গানের সুরে আর ঢোলকের বোলে ধরা পড়ত। এ রাজাকে জানবার সে উপায়টুকুও ছিল না। সেই রাজা এসে গিয়েছেন কাছে।... 'গান্ধী' আর পাটের দামের রাজা, কাপড় আর কেরোসিনের রাজা, মাটিতে জমিদার হাকিম দারোগা ফৌজের রাজা, আকাশে 'হাওয়াই-জাহাজের' রাজা, বাতাসে ফৌজী হাওয়াগাড়ির গন্ধর রাজা। রামায়ণে এ-রকম রাজার কথা লেখা নেই। 'বিলাক'-এর কথা লেখা আছে? ...এসব কথা রামায়ণে থাকে না, থাকে নিলামি ইস্তাহার ওয়ালা মাস্টার সাহেবের কিতাবে। .....বদলায় অথচ বদলায় না। পুরনো রামায়ণ আর নতুন রামায়ণে জট পাকিয়ে যায়।'

সে দেখেছে সর্বত্রই স্বার্থান্ধতার তীব্র প্রতিযোগিতা। আজাদ দস্তাতেও সেই একই রূপ। সুতরাং আদর্শ বারবার প্রতিহত হয়েছে। জীবন জিজ্ঞাসায় জর্জরিত ব্যক্তি মানুষের পক্ষে অন্তঃসার শূন্য জগতের প্রতি আস্থা রাখা অসম্ভব। রামায়ণের আদর্শেও আর স্থির থাকা সম্ভব নয়— ঢোঁড়াইও পারে নি। ঢোঁড়াই স্মৃতি কণ্টকিত যন্ত্রণায় দীর্ণ প্রথম থেকেই। তাই এণ্টনিকে কেন্দ্র করে সে স্মৃতি-সুখে আশ্বস্ত হতে চেয়েছিল। রামিয়ার গর্ভজাত ভেবে এণ্টনিকে নিয়ে সে আর একবার জীবনের পথে ফিরে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু নাস্তি আর বৈনাশিকতা কেবলই যার মূল্যবোধকে ধ্বংস করেছে প্রতি মুহূর্তে, সে কি করে সার্থক হবে? ঢোঁড়াই স্বয়ং নিজেই প্রত্যক্ষ করেছে তার অনিবার্য পরিণাম। চরম শূন্যতা আর অস্তিত্ব বিনাশ একাকিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ঢোঁড়াই। তাই চিরকালের মতো চলে যাবার সময় রামায়ণটাও সঙ্গে নেবার প্রয়োজন বোধ করে নি।

"ঢোঁড়াই চরিতামানস" দুটি চরণ লিখতে গিয়ে লেখকের সামনে আদর্শ ছিল "তুলসীদাসের রাম চরিতমানস"। শুধু তাই নয় সতীনাথ চেয়েছিলেন মহাকাব্যের বিশাল আধারে জনজীবনের দ্বান্দ্বিক বিবর্তন ও বদলের রূপরেখা আঁকবেন। ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে অজস্র কথা উপকথার বৃত্তে, বহু বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনার সংঘাতে নাটকীয়তা সৃষ্টি করে এক নতুন মহাকাব্য (নব রামায়ণ) রচনা করবার বাসনাও অগোচর থাকে না। সাধারণ মানুষকে করতে চেয়েছিলেন 'রামের মতো', কারণ রামের আদর্শ ছাড়া উত্তর ভারতীয়দের মন ভরে না। সাধারণ মানুষের কথা ও সাধারণ মানুষের বাসভূমিকে চিরন্তন করতেই রামায়ণের বিশালতা, মহাকাব্যের ব্যাপ্তি লেখকের শিল্পীমানসে এনেছে বিশেষ সচেতনতা। আর 'ঢোঁড়াই চরিতে'র পাঠক দুটি চরণ পাঠ শেষে পেয়েছে বিশালতার স্বাদ যা অনেকটাই মহাকাব্য লক্ষণাক্রান্ত অথচ জীবনমুখর উপন্যাসের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার।

উপন্যাস ও মহাকাব্যের গঠন প্রকৃতি এক না হলেও উপন্যাসের প্রাণ লুকিয়ে আছে মহাকাব্যের বিশালতায়। "ঢোঁড়াই চরিতে" সেই এপিক লক্ষণ একেবারেই অদৃশ্য নয়। কাহিনী, চরিত্র, ভাব, ভাষা এমন কি ফলশ্রুতিতেও "ঢোঁড়াই চরিতমানস" মহাকাব্য

লক্ষণাক্রান্ত, মহাকাব্যোপম উপন্যাস। সমালোচকের মতেও—'এই পৌরাণিক মহাকাব্যের অনুসরণের পদ্ধতিটা কি পাশ্চত্য সাহিত্যের আর একটি অনুরূপ প্রয়াসের কথা মনে করিয়ে দেয় না, জেমস্ জয়েসের ইউলিসিস হোমারের ওডিসির আধুনিক বিকল্প। তার ঘটনাস্থল ডাবলিন, কাল একটি দিন, নায়ক ব্লুম। সতীনাথের ঢোঁড়াই চরিতমানসের ঘটনাস্থল জিরানিয়া জেলা, কাল অন্ততঃ বিশ-ত্রিশ বছর বা আরও একটু বেশি হতে পারে (১৯২০-১৯৪৫?)। নায়ক ঢোঁড়াই, শ্রীরামচন্দ্রের আধুনিক বিকল্প।'[১৭] তবে দেশী বা বিদেশী পৌরাণিক মহাকাব্যের ছায়া নয় 'ঢোঁড়াই চরিত'। কারণ এখানে লেখক সমাজ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহায়তা বদলের চেহারাটাকে দেখাতে চেয়েছেন। তাই ঢোঁড়াই ব্যক্তি হয়েও একা নয়—প্রতিনিধি, জিরানিয়াও বিশেষস্থান না হয়ে বিশাল ভূখণ্ডের রূপ পেয়েছে। বদলটাও সামগ্রিক বদল।

মহাকাব্যের মতোই এই উপন্যাসের কাহিনী শেষ পর্যন্ত বিশেষ সীমায় আবদ্ধ থাকে নি। তাংমা-ধাঙড়-কোয়েরীসমাজের জীবনধারা শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষের বিশাল ভূখণ্ডকে ও ভারতবাসীকে স্পর্শ করেছে যার সঙ্গে তুলনা হতে পারে মহাকাব্যের ত্রিলোকব্যাপী পরিধির। অভ্যস্ত আপাত স্থানু জীবনধারা কালপ্রবাহে যে বিস্তার লাভ করেছে তা সীমাতীত রূপরেখার ইঙ্গিত দিয়েছে—আঞ্চলিক জীবনচর্যা সমবেত আধারে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে—তাই জীর্ণারণ্য শেষ পর্যন্ত মূল্যবোধ বিনষ্ট, দারিদ্র্যে জর্জরিত লাঞ্ছনাজীর্ণ ভারত ভূখণ্ডের দ্যোতক হয়ে ব্যাপ্তি লাভ করেছে এ উপন্যাসে।

মহাকাব্যের কাহিনীতে থাকে অলৌকিকত্ব ও বিস্ময় যা পাঠক মনে বিশেষ বিস্ময়ভাব ও রসের সঞ্চার ঘটাতে সক্ষম। আর সময়ের দিক থেকেও মহাকাব্যের ব্যাপ্তি কালান্তরের সূচক। ঢোঁড়াই চরিতমানসের কাহিনী অতি সাধারণ মানুষের নিয়ত সংগ্রামের ঘাত প্রতিঘাতে, ব্যর্থতায় ও ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে নিজেকে গড়ে তোলার কাহিনী। সংগ্রামী ঢোঁড়াইয়ের জীবনধারায় গোটা ভারতবর্ষের মানুষের অধিকার সচেতনতা, আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটি এই উপন্যাসে বিধৃত হয়ে আছে যা পাঠককে বিস্মিত ও শ্রদ্ধাশীল না করে পারে না। আর সময়—ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বাধীনতা পূর্বকালের সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ সঙ্কটকালটিকে লেখক বেছে নিয়েছেন। ১৯১৭-১৯৪৫, এই উপন্যাসে 'অনাদিকালে'র সূচনা করেছে। এত বড়ো রাজনৈতিক পরিবর্তনের অধ্যায়কে লেখক বেছে নিয়েছেন যার তরঙ্গ সমাজজীবনের সর্বস্তরে কম বেশি তরঙ্গাঘাত সৃষ্টি করে উদ্বেলমুখর করে তুলেছিল। জাতীয় জীবন তার সামগ্রিক সচেতনতা নিয়ে এই বিশেষ সময়টিকে ধরে রেখেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। 'অসহযোগ' থেকে 'ভারত ছাড়ো' ও পরবর্তী ক'টা বছর (অর্থাৎ ১৯১৭-১৯৪৫) গোটা ভারতবর্ষের মূল সুর একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে সার্বিক মুক্তির সাধনায় উন্মুখ হয়েছে। এই সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত শুধু কংগ্রেস, গান্ধীবাদী, সোস্যালিস্ট বা বিশেষ রাজনৈতিক দলের সংগ্রাম হয়ে থাকে নি। সাধারণ মানুষ এই সময়েই সম্পূর্ণভাবে নিজের মতো করে অনুভব করেছিল নিজেদের মুক্তি সংগ্রামের কথা—শোষণ আর পীড়ণ, দারিদ্র্য আর সংস্কার, অজ্ঞতা আর অশিক্ষা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামমুখী হয়েছে সাধারণ মানুষ। তাদের অন্তরে জেগেছে অধিকার সচেতনতা। অভিজ্ঞতা

দিয়ে নিজেদের মতো করে অনুভব করতে শিখেছে অধিকার আদায় করে নিতে হবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে। ঢোঁড়াই-চরিতে এই সত্যটিই ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং সমবেত জাতির জীবনে বন্ধন মুক্তির কাল (আংশিক) বলে ধরে নিলে এ কাল-পরিধি 'কালাতীত' বলে মনে হয়। সতীনাথের অসামান্য লেখন দক্ষতায় ঢোঁড়াই হয়ে উঠেছে গণনায়ক, জীর্ণারণ্য পেয়েছে ভারতবর্ষের মতো ভূখণ্ডের পূর্ণরূপ; ঢোঁড়াই ও তার সমাজের মানুষের বদলে যাওয়ার স্বরূপ, অভিজ্ঞতাসঞ্জাত অধিকারবোধ; তাদের রামায়ণের প্রতি তথা সত্যের প্রতি আত্মস্থ ভাব, গভীর বিশ্বাসবোধ পাঠককে এমন একটা জায়গায় উপনীত করে যেখানে স্থান-কাল-অনুভূতিতে কেবলই প্রতিভাস হয় ব্যাপ্তি আর বিশালতা।

স্বাভাবিকভাবেই এরপর আসে মহাকাব্যের নায়কের কথা। ঢোঁড়াই আদৌ মহাকাব্যের সুর বা সুরস্থানীয় নয়। অতি সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ, একান্তভাবেই উপন্যাসের চরিত্র। জন্ম পরিচয় থাকলেও পিতৃহীন, মাতৃপরিত্যক্ত। কিন্তু কর্মদক্ষতায় সে একে একে জন্মের বন্ধন, মাতৃত্বের স্নেহসিঞ্চন, সমাজের বঞ্চনা আর তাচ্ছিল্য অতিক্রম করেছে। সে হয়ে উঠেছে মহাকাব্যের নায়কেরই মতো—মহানায়ক; লেখকের বাসনায় রামচন্দ্র—সত্য আদর্শের প্রতীক। সাধারণ ঢোঁড়াই থেকে রামায়ণজীতে রূপান্তরিত হওয়ার পথেই সে অর্জন করেছে মহাকাব্যের, বিশেষত ট্র্যাজেডির নায়কের মতো সার্থকতা। তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জাগে ও সেই সঙ্গে সহানুভূতিতে দ্রবীভূত হই।

মহাকাব্যের নায়ক অসাধারণ। কোনো ক্ষুদ্রতা, নীচতা দ্বারা এই চরিত্র খণ্ডিত নয়। এই ধরণের চরিত্রে একই সঙ্গে ঘটে থাকে বীরত্ব ও ঔদার্যের সমাবেশ। ঢোঁড়াই এই অর্থে নিশ্চয়ই অসাধারণ—তার প্রতিবাদের সাহস ও শক্তি সেই সঙ্গে স্বার্থত্যাগের মহিমা ছড়িয়ে আছে উপন্যাসের পাতায় পাতায়। মানবিক প্রেমে সে তুলনাহীন—তাই বড়কা মাঝিকেও লোহা মানতে হয় তার কাছে যখন গুটি পোকার বাক্সগুলি বাইরে রেখে রেশমকুঠি দহনের কাজে এগিয়ে যায় ঢোঁড়াই। জীবপ্রেমের এমন সজীব উদাহরণ এমন আর কোথায় আছে! বিশ্বাসে আদর্শে মহত্ত্বে ঢোঁড়াই সত্যিই মহৎ—রামায়ণের প্রতি, সত্যের প্রতি, ন্যায়ের প্রতি তার অবিচল বিশ্বাস তাকে একের পরএক বাধা অতিক্রমের পথে শক্তি দিয়েছে। সে বিশ্বাস করেছিল মানুষকে। বোঝে নি রাজনীতির কুটিল চক্রগুলিকে। সে শুধু বুঝেছিল অন্যায় শোষণ আর পীড়ণ থেকে উদ্ধারের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। বার বার ঠকে গিয়েছে, পরাজিত হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকেই অর্জন করেছে নতুন করে বাঁচবার জন্য সংগ্রামের শক্তি। নৈতিক চেতনায় সে সরল, অকপট ও দৃঢ়।

মহাকাব্যে মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়। মহৎ ভাব মানবমনকে আলোড়িত করে এবং এর আবেদন সার্বজনীন। তাই ঢোঁড়াই শুধু তাৎমাটুলির ঢোঁড়াই, বৌকাবাওয়া আর রামিয়ার ঢোঁড়াই হয়েই শেষ হয় নি। তাকে তার চারিত্রিক মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য হতে হয়েছে 'সকলের'। তাই সে ছেড়েছে তাৎমাটুলি, বাওয়াকে, রামিয়াকে। পক্ষান্তরে ঢোঁড়াইকে ব্যাপক জীবনের মাঝে আনতে এরাও একে একে ছেড়ে গেছে কোনো না কোনো সূত্র রচনা করে। ঢোঁড়াইকে আনতে হয়েছে সজীব মাটি আর সবুজের সংস্পর্শে; মাটি সংলগ্ন মানুষের কাছাকাছি; দেশপ্রেমের বৃহৎ আদর্শে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কিম্বা আরও শেষে শ্রেণীভেদহীন,

জাতপাতহীন কারাগারে। এই সমস্ত পরিবেশে বিচিত্র পরিস্থিতিতে আত্মোৎসর্গের মাধ্যমেই তার মধ্যে মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে হয়ে উঠেছে জীবনপ্রেমিক।

মহাকাব্য যেমন, মহাকাব্যোপম উপন্যাসেও নৈতিকচেতনা শিল্পকর্মের সঙ্গে এক হয়ে প্রকাশিত হয়। তাই তার ভাষাও হয় তাৎপর্যময়। ঢোঁড়াই চরিতমানসের ভাষার মধ্যেও রয়েছে বিশালতার স্পর্শ। অঞ্চল বিশেষের লোকভাষা লোকজীবনের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের জনজীবনকে একত্রিত করেছে এই উপন্যাসে। এ ভাষার লৌকিক মাধুর্য 'রামচরিত মানসে্র' উদ্ধৃতি উপমার স্পর্শে সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে পঞ্চমাহতোদের চক্রান্তে ঢোঁড়াইয়ের যে রূপ বর্ণনা করেছেন লেখক সে ভাষা মহাকাব্যের বিশালতার দ্যোতক— 'টাকা খেয়ে সাক্ষ্য করছে, শালা চোট্টার দল! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে ঢোঁড়াই। তার হিংস্র চোখের মধ্যে দিয়ে ঠিকরে পড়ছে অজস্র বজ্রের স্ফুলিঙ্গ। 'বজরঙ্গবলী' মহাবীরজীর অসীমশক্তি এসে গিয়েছে তার দেহে আর বাহুতে। অনেক বড় দেখাচ্ছে তাকে।' ....সারা পৃথিবী তার চোখের সম্মুখ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যে পচ্ছিমা সাপটাকে সে পুষেছিল সেটা এতদিনে ছোবল মেরেছে।....পৃথিবীতে আগুন লেগে গিয়েছে—কাঁপছে, ঘুরপাক খাচ্ছে, ধসে যাচ্ছে পায়ের নীচের মাটি। ...থাক, কারও শক্তি নেই সেই সাপটার কাছে যাবার পথে তাকে বাধা দেয়, মহাবীরজীও না, গোঁসাইও না, খোদ রামচন্দ্রজী এলেও না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হাওয়া শান্ত হয়ে গিয়েছে, তার প্রতিটি স্নায়ুর উদ্দণ্ড আলোড়ন দেখে। তার হাত মুঠো হয়ে আসছে, প্রচণ্ড শক্তিতে পৃথিবী গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে পারে এখনই, এর প্রতিটি অণু পরমাণু তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে সারাজীবন।' আর উপন্যাসের শেষ অংশে নিঃস্ব রিক্ত ঢোঁড়াই যখন জেনেছে রামিয়া মৃতা, এন্টনি রামিয়ার গর্ভজাত সন্তান নয়, তখন তার মনের অবস্থা ব্যক্ত করেছেন লেখক কি অসাধারণ উপমা প্রয়োগে— 'কথাগুলো ঢোঁড়াই শেষ পর্যন্ত বোধহয় শোনেও নি। কয়েকটা কথার বালি পড়ে তার শরীরের আর মনের সব যন্ত্রণাগুলো বিকল হয়ে গিয়েছে। জুয়োখেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে সে। ...এই নিঃসীম রিক্ত জগৎটার মধ্যে 'পাক্কী' নাকী নামের যেন একটা অপরিচিত রাস্তা দিয়ে সে চলেছে। ঠিক অনুতাপ নয়। হতাশায় গ্লানি তার নিঃসঙ্গতাকে আরও নিবিড়, আরও দুঃসহ করে তুলেছে। একেবারে একা সে আজ দুনিয়াতে। বুকের বোঝার চাপে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আশমানে দিনের চাকা ঘুরোনোর গোঁসাই 'পশ্চিমে' ঝুঁকেছেন। তাঁর কাজের কামাই নেই নিচে গোঁসাইথানের গোঁসাই হাল ছেড়ে দিয়ে ভাঁট বনে উইয়ের ঢিবি হয়ে গিয়েছেন। পশ্চিমে ধুলোর ঝড় জিদ ধরেছে থামবে না বলে। ঝাপসা চোখের মধ্যে একটা আকৃতি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সর্বগ্রাসী শূন্যতার মধ্যে এই পথটা তবু পা রাখবার একটু শক্ত জমি। সিধা চলে গিয়েছে কাছারি, জেলখানা, আরও কতদূরে!'

মহাকাব্যের চরিত্রগুলির প্রাণ নাটকীয় ভাব ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসে নাটকীয় চমৎকারিত্ব বারবার সৃষ্টি হয়েছে, ফলে একের পর এক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ ও প্রকটতর হয়েছে। আর তারই তীব্র দ্বন্দ্বে নায়ক আলোড়িত, ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। ঢোঁড়াইয়ের

পাক্কীতে কাজ নেওয়ার ফলে থান জ্বালানো, গান্ধীর মূরত দর্শনে নাটকীয় উত্তেজনা, রামিয়ার প্রতি আকর্ষণ-বিবাহ ও বিচ্ছেদে নাটকীয় ভাবাবেগ; দ্বিতীয়চরণে ধানের গোলা আক্রমণ, ভূমিকম্পের ঘটনা, সাগিয়ার অর্ন্তধান, সতিগরিয়ার উৎসব, তিতলিকুঠি দহন, আজাদ দস্তার জীবন, এন্টনির আবির্ভাব ও স্বর্ণসীতার আকর্ষণ ঢোঁড়াইয়ের জীবনের চরম পরিণতি নিঃসন্দেহে নাটকীয় জীবনচর্যার পরিচায়ক।

সবশেষে আসে মহাকাব্যে রসের কথা। মহাকাব্যের অঙ্গীরস—বীররসাত্মক। সংগ্রাম মুখর ঢোঁড়াই চরিতে এই রস সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আনুষঙ্গিক রসাবেদনও সৃষ্টি হয়েছে সেই সঙ্গে শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য ইত্যাদি সহযোগে। কিন্তু মহাকাব্যের মূল রস—বিশাল রস; রবীন্দ্রনাথ 'ঐতিহাসিকরস'কে মহাকাব্যের প্রাণ বলেছেন। 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' পড়তে পড়তে পাঠক মনে মহত্ববোধ জাগে বিরাট বস্তুকে আশ্রয় করে—তার ভিত্তি সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়। সাধারণ মানুষ ঢোঁড়াই শেষ পর্যন্ত সত্য ও ন্যায় রক্ষা করতে গিয়ে শূন্যতার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করেছে তা পাঠককে নিশ্চয়ই বিস্ময়াভিভূত ও শ্রদ্ধাবনত করে।

কিন্তু ভারতীয় মহাকাব্যের পরিণতি শান্ত রস প্রবাহে। এস উপন্যাসেও চরম দুঃখের কারুণ্যে, শূন্যতার গর্ভে নিমজ্জিত, বিশ্বাসের শেষ বিন্দু রামায়ণখানার প্রতিও যার প্রয়োজন ফুরিয়েছে এমন হতভাগ্য মহৎ নায়কের প্রতি রুদ্ধ-রোদনাবেগে পাঠক চিত্ত হয় বিমূঢ় স্তব্ধ। সর্বরিক্ত ঢোঁড়াই নিঃসঙ্গ যুগমানসের প্রতিনির্ধির মতো একা দাঁড়িয়ে তার প্রিয় পরিচিত অথচ চির অপরিচিত পাক্কীর ওপর—দূরের ইশারা নিয়ে সামনে অনন্ত মহাপ্রস্থানের পথের মতো পড়ে আছে পাক্কী। সমস্ত রূঢ়তা ক্রুরতা, তামসিকতা, রাজসিকতা ও বহু অশ্রুর শেষে ঢোঁড়াই, চির সংগ্রামমুখর অথচ চির পরাজিত মহানায়ক এগিয়ে চলেছে সেই পথ ধরেই।

## টীকা

১. 'ভাদুড়ীজী' 'ফণীশ্বরনাথ রেণু, ''সতীনাথ-স্মরণে'', সুবলচন্দ্র 'গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ৩৬।

২. 'গ্রন্থপ্রসঙ্গ' সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, অরুণা প্রকাশনী, পৃ. ৪৯৫।

৩. তদেব, পৃ. ৪৯৪।

৪. তদেব, পৃ. ৪৯৫।

৫. 'গ্রন্থপ্রসঙ্গ : ঢোঁড়াই', সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯১ দ্রষ্টব্য।

৬. তদেব, পৃ. ৪৯১।

৭. 'নখদর্পণে ভারতবর্ষ : ঢোঁড়াই চরিতমানস', সুমিতা চক্রবর্তী, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'', শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৯, পৃ ২৩৮।

৮. 'ঢোঁড়াই চরিতমানসের' প্রায় সমকালে লেখা গল্পে পীড়ণের চিত্রটি তুলে ধরেছেন লেখক—'সমুদ্রের নীলরং দেখিবার সুযোগ তাহাদের হয় নাই; আকাশের নীলের দিকে তাহারা কোনো দিন তাকাইয়া দেখে নাই ; কুঠির বড় বড় চৌবাচ্চায় তাহারা দেখিয়াছে গোলা নীলের সমুদ্র, বহু পরিচিত আত্মীয় স্বজনের দেহে দেখিয়াছে নীল কালশিরার দাগ।'

'আংটা বাংলা', "সতীনাথগ্রন্থাবলী" ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯।'

৯. 'সতীনাথ ও পূর্ণিয়া', সন্তোষকুমার মজুমদার, "জলার্ক" ৩-৫ম সংখ্যা। ১৩৮৭ কার্তিক-আষাঢ় ১৩৮৮, পৃ. ১০-১২।

১০. 'ঔপন্যাসিক সতীনাথ ও উত্তরকাল', উজ্জ্বল কুমার মজুমদার; তদেব পৃ. ১১৭।

১১. 'সতীনাথ ভাদুড়ী—যেমন ভেবেছি', বিমল কর; "সতীনাথ স্মরণে", সুবলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ৮৪।

১২. 'গ্রন্থপ্রসঙ্গ' : সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, অরুণা প্রকাশনী, পৃ ৫৯৫।

১৩. 'গ্রন্থপ্রসঙ্গ' : তদেব, পৃ. ৪৯৩।

১৪. তদেব, পৃ. ৪৯৫।

১৫. তদেব, পৃ. ৪৯৫।

১৬. "ঢোঁড়াই চরিতমানস", ২য় চরণ, স. গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮০।

১৭. "সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা", গোপাল হালদার, পৃ. ৫৯।

'ঢোঁড়াই চরিতমানস' প্রবন্ধ লেখার সময় "জলার্ক" পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৮৭-আষাঢ় ১৩৮৮) প্রকাশিত গুণময় মান্নার 'ঢোঁড়াই চরিতমানস', একটি পুনর্মূল্যায়ণ', "অনুষ্টুপ", দ্বাদশ বর্ষ ১৩৮৬ ২য়, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত ইরাবান বসুরায় রচিত 'সতীনাথ ভাদুড়ী : 'রাজনীতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধ এবং "সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা", গোপাল হালদার—গ্রন্থটি থেকে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি।

## ঢোঁড়াই চরিতমানস প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে উল্লিখিত সমকালীন সময় সারণী :

১. ১৯১২—ঢোঁড়াই-এর জন্মের পাঁচ দিনের দিন তার বাপ দরবারের জুলুষ দেখতে গিয়েছিল। মা বুধনী যেতে পারে নি বলে আক্ষেপ করেছিল।
   ১৯১২-তে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। সেই উপলক্ষে উৎসব হয়।

২. ১৯১৩—কেলভী সাহেবের মোটর গাড়িতে আগুন লাগে। R. G. Kilby, I. C. S. ১৯১৩-তে ছিলেন পূর্ণিয়ার জেলা শাসক। ঢোঁড়াই-এর বাপ পাক্কীতে আর পাঁচজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে মোটরগাড়ী দেখছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে জ্বর নিয়ে ঘরে ফিরে সে অচৈতন্য হয় এবং এই জ্বরেই তার মৃত্যু হয়। অর্থাৎ ১৯১৩-তে ঢোঁড়াই পিতৃহারা হলো।

৩. ১৯১৭—যুদ্ধের খরচ তোলবার জন্য চাঁদা নিয়ে মক্‌ফাইট দেখানো হয়। উপন্যাসে 'ইংরেজ-জার্মান লড়াই' (ইংরেজ ও জার্মানের মকফাইট)-এর উল্লেখ আছে।

৪. ১৯১৯-২০—দেশে হরতাল ও মাদক দ্রব্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়। সে সময়ে ঢোঁড়াই-এর অসুখ করেছিল। রেবণগুণীকে পান সুপারি দিয়ে তুষ্ট করে ঢোঁড়াইকে ব্যাধিমুক্ত করা যাবে। রেবণগুণীই বুধনীকে উপায় বলে দিয়েছে। তার মুখেই শোনা যায়—'কালই তো শনিবার। কাল আসিস। কাল তো আবার হাড়তাল না কী বলে, ওই কী একটা নতুন হয়েছে না আজকাল, গতবছরেও হয়েছিল একবার—দিনের বেলা সওদা মিলবে না, সাঁঝের পরে দোকান খুলবে, কাল আবার তাই আছে।'

এর কাছাকাছি সময়ে বিহারে লোক গণনা (আদম শুমারি) হয়। তাৎমাদের বিশ্বাস এর ফল ভালো হয় না—'সেবার মাসখানেক থেকে তাৎমাটুলিতে চড়াইপাখি দেখা যাচ্ছে না। সবাই বলাবলি করে যে একটা বড় অসুখ শিগগিরই আসছে। তার উপর বাড়িতে নম্বর দিয়ে দিয়ে লোক গুনে গিয়েছে। সকলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। তার পর যা ভাবা গিয়েছিল তাই। জিরানিয়ায়, তাৎমাটুলিতে, ধাঙড়টুলিতে কী অসুখ।' লেখক 'রেবণগুণীর কৃপায় ঢোঁড়াইয়ের পুনর্জীবন লাভ' অংশে ঢোঁড়াই-এর আটবছর বয়সের উল্লেখ করেছেন।

৫. ১৯২১—গান্ধীজী সর্বাত্মক অসহযোগের ডাক দেন। এর আগেই তিনি বিহারের চম্পারণে কৃষকদের পাশে দাঁড়ান। এ ছাড়াও আমেদাবাদের কাপড়ের কলের শ্রমিক ও গুজরাটের কইরা জেলার কৃষকদের সত্যাগ্রহে সহযোগিতা করে জন সমর্থন লাভ করেন। চম্পারণে গান্ধীজীর উদ্যোগে কৃষকদের এতকালের তিনকাঠিয়া ব্যবস্থার উচ্ছেদ হয়, তারা ক্রমেই সচেতন হয়ে ওঠে। এরই পর ১৯২১-এর অসহযোগ, বয়কট সত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে মহাত্মা হয়ে ওঠেন। ঢোঁড়াই চরিতমানসে গান্ধীজীর এই আবির্ভাব মুহূর্তটি নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঢোঁড়াইদের শ্রদ্ধার আশ্রয়স্থল মাস্টার সাহেব চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে গান্ধীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন।

৬. ১৯৩০—গান্ধীজী মার্চ মাসে লবণ সত্যাগ্রহের ডাক দেন। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত জায়গা এই আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেয়। এই আন্দোলনে উত্তর বিহার, বিশেষত সারান, চম্পারণ, মজঃফরপুর, ভাগলপুর, পূর্ণিয়ার মানুষ বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 'From 16 to 21 April, 1930, the city of Patna witnessed one of the most heroic scenes in the face of naked Violence on the part of the Police. Regardless of all personal considerations, people jumped into action with perfect non-Violence and maintained wonderful patience and restraint even under grave provocation. Patna inaugrated a Satyagraha on 16th April, 1930, and volunteers proceeded to Nakhas Pind, a place about two miles to the east of Mangles Tank in Patna city, which had been selected as the spot for violation of Salt laws by manufacturing Salt. [Bihar through the ages–Gener. editor : R. R. Diwakar, Bombey, Orient Longmans, 1959.]

"ঢোঁড়াই চরিতমানসে" লবণ সত্যাগ্রহের চিত্রটি যথাযথভাবে চিত্রিত হয়েছে। ঐ সময় মরণাধারের পাড়ে তাৎমাটুলির লোকেরা সমবেত হয়েছিল। গাঁয়ের সকলের সঙ্গে ঢোঁড়াই-এর বৌ রামিয়াও গিয়েছিল সেখানে। বৌকাবাওয়া মনে করেছে ঐ স্থানেই নতুন থান গড়ে উঠবে ক্রমে ক্রমে। এই সময়ই বৌকাবাওয়া ঢোঁড়াইকে ছেড়ে চলে গিয়েছে অযোধ্যায়। আর তার ফলেই ঢোঁড়াই-এর সবচেয়ে নিরাপদ বন্ধন ছিন্ন হলো এই সময়।

১৯৩৪—এই বছর জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখে বিহার জুড়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, টেলিগ্রাফ লাইন ও মানুষের জীবনহানি ঘটে। কৃষিজমিগুলি বালিতে পূর্ণ হয়ে যায়; নলকূপগুলি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এই সময় ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি কংগ্রেসকর্মীরা বন্দী ছিলেন; তাঁদের সকলকেই এই দুর্ঘটনায় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্য মুক্তি দেওয়া হয়।

ঢোঁড়াই এই ভূমিকম্পের সময় তাৎমাটুলির সব বন্ধন ছিন্ন করে বিসকান্ধায় ভূমিদাস হয়ে বাস করছিল। ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা ঢোঁড়াইকে ক্রমেই রাজনৈতিক জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কৃষিজমির বালি সরাবার কাজে, কুয়ো সারাবার কাজে এগিয়ে এসে ঢোঁড়াই ক্রমেই কংগ্রেসী ভলেন্টিয়ার, নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লাডলিবাবুরা, গান্ধীজীর ভলেন্টিয়াররা সকলে রিলিফের কাজে গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

১৯৩৪ মার্চ-এপ্রিল—গান্ধীজী পূর্ণিয়ায় আসেন। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের আশ্বাস দেন। তাঁর উপস্থিতিতে নওরত মাঠে সভা হয়, সেখানে তিনি ভাষণ দেন। উপন্যাসে ঢোঁড়াই, সাগিয়া এবং সারা জীর্ণারণ্যের মানুষ গান্ধী দর্শনে গিয়েছিল। গান্ধীজী বিহারের আরও অন্যান্য জায়গায় ভ্রমণ করেন ১১-ই মার্চ, ১৯৩৪ থেকে মে, ১৯৩৪ এবং তারপরও কিছুকাল। দুর্গত মানুষদের উদ্দেশ্যে তাঁর মানবিক প্রীতিপূর্ণ ভাষণ সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করেছিল। গান্ধীজী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন—'I believe that God's ways connot be comprehended fully by man, I have firm faith that not a leaf falls without His will, ...if we had enough humility, we would have no hesitation in accepting the recent earthquake as a just retribution for our sins...Today, more than ever, our hearts need a through cleansing and I would go so far as to say that even the earthquake would not be too great a price to pay, if it enabled India to cast of the canker of untouchability.' ['Mahatma', Vol. III, Page 313, D, G. Tendulkar.]

ঢোঁড়াই শুনেছে মহাত্মাজীর ভাষণ—'কত কী কথা বললেন মহাত্মাজী! তাঁর কথা নিজে কানে শুনতে পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা!

...'পৃথিবীর পাপের বোঝা বেড়েছে। তাই জন্যই দেশে এই ভূমিকম্প হয়েছে।' ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় ঠিক বলেছেন মহাত্মাজী। রাজপুতের পাপ; তাৎমাটুলির মোড়লের পাপ।

...'অছুৎ হরিজনদের উপর আমরা অন্যায় করি। তাদের মানুষ বলে ভাবি না। ধরতিমাই পাপের বোঝা সইতে পারেন নি।'

১৯৩৭, জানুয়ারী — বিহারে আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঢোঁড়াই এই সময় ভোট কথাটি শোনে। ভোটকে কেন্দ্র করে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার চিত্র উপন্যাসে

ছড়িয়ে আছে। গান্ধীজীর কাছ থেকে তার নামে চিঠি ; বিনা টিকিটে তার দেওয়া জবাবী চিঠি মহাত্মাজীর কাছে পৌঁছে যাবে ভোটের বাক্সে ফেললে, এই বিশ্বাস তাকে পুলকিত করেছে —'ঘরের মধ্যে সাদা বাক্সটাতে প্রণাম করে ঢোঁড়াই চিঠিখান তাঁর মধ্যে ফেলে। ধন্য হো মহাত্মাজী, ধন্য হো কাংগ্রিসের বলন্টিয়র, যাদের দয়ায় নগণ্য ঢোঁড়াই রামরাজ্য কায়েম করবার কাজে, কাঠবেরালির কর্তব্যটুকু করবার সুযোগ পেয়ে গেল।'

১৯৩৯ — ক্রমেই সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। কংগ্রেস সরকারি কাজে অসহযোগিতা করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ৩১-শে অক্টোবর সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকারি কাজ থেকে পদত্যাগ করে। ঢোঁড়াইদের কাছে এই ঘটনার খবর পৌঁচেছে—'সবচেয়ে জবর খবর কংগ্রিস রংরেজ সরকারের দেওয়া পাটনার গদিতে লাথি মেরে চলে এসেছে।' ভলেনটিয়ার গ্রামে এসেছে ঢোঁড়াইদের কংগ্রেসী ফৌজে ভর্তি করে নিতে। কিন্তু কংগ্রেসী কর্মীরা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সঙ্গ ছাড়ে নি। লাডলিবাবু ডিস্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ ছাড়ে নি তা ঢোঁড়াই লক্ষ্য করেছে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

১৯৪০ — দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আভাস গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। জাপান যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। ঢোঁড়াইরা দেখেছে পাক্কীর পথ দিয়ে ফৌজী গাড়ী চলেছে। ট্রাক ভর্তি করে জিনিসপত্র চলেছে। জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই চড়া হয়েছে। তাদের কাছে খবর পৌঁচেছে —'কাপড়ের জাপানীরা হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবার বাঘের খেলা, জার্মান বালা।' আর অষ্টপ্রহর ফৌজী হাওয়া গাড়ী চলছে পাক্কীতে। ঢোঁড়াই-এর আশঙ্কা 'তার পাক্কীও তাহলে বদলে গেল।'

এমন সময় রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজী অহিংস সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত নেন। দেশ জুড়ে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ডাক দেশে বিশেষ উত্তেজনা সৃষ্টি করে। গ্রামে গ্রামে সতিগরিয়ার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪২ — ক্রীপস্-এর দৌত্য ব্যর্থ হওয়ায় বোম্বাই অধিবেশনে ৭-ই আগস্ট কংগ্রেস থেকে গণআন্দোলনের প্রস্তাব নেওয়া হয়। সারা দেশ জুড়ে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়।

৮-ই আগস্ট, গভীর রাতে মহাত্মাগান্ধী ও কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়।

৯-ই আগস্ট, 'ভারত ছাড়ো'-র ডাক গোটা দেশের মানুষের মনে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে। দেশবাসী উত্তাল হয়ে ওঠে।

উপন্যাসে ঢোঁড়াইরা অঙ্গীকার করে —'মহাত্মাজী গ্রেপ্তার! হো যাও তৈয়ার।' মহাত্মাজী বলে গিয়েছেন এই তাঁর শেষ লড়াই, দুনিয়াতে রামরাজ্য আনবার লড়াই। অর্থাৎ 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র ডাক। এই ডাকে সারা বিহার জেগে ওঠে। বিহার জুড়ে চলে বিয়াল্লিশের বিক্ষোভ আন্দোলন— 'এবার

মরদের লড়াই রেললাইন তুলবার তার কাটবার।' ঢোঁড়াইরা এই উত্তেজনার বশেই তিতলি কুঠি দহন করে।

ইতিমধ্যে সরকারের তরফ থেকে কংগ্রেস সহ অন্যান্য সক্রিয় দলগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। অন্যান্য নেতৃস্থানীয়দের বন্দী করে আন্দোলনকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে ধরপাকড়ের মাত্রা বেড়ে যায়। দেশ জুড়ে চলে ব্রিটিশ সরকারের তীব্র দমন নীতি। কিন্তু হাজারীবাগ জেলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ৪২-এর নভেম্বরে জেলে বসে দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, যোগেন্দ্রনাথ সুকুল, রামনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি। এঁরা জেল থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ, সূরজ নারায়ণ সিং এবং অন্যান্য নেপালে পালিয়ে যান। সেখানে তাঁরা নতুন সংগঠন করেন — তার নাম 'আজাদ দস্তা'।

উপন্যাসে ঢোঁড়াই এই আজাদ দস্তায় প্রবেশ করে এবং এইভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্পর্শে আসে। এখানে এসেই অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হয়। তার নতুন নাম হয় —রামায়ণজী। আজাদ দস্তাই পরে ক্রান্তি দল নামে পরিচিত হয়।

১৯৪৩-৪৪— বিয়াল্লিশের আন্দোলন ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য, নেতৃস্থানীয়দের প্রায় সকলেই কারান্তরালে। আর বাইরে যাঁরা আছেন তাঁরা আত্মগোপন করতে ব্যস্ত। ক্রান্তি দল এই সময় নিষিদ্ধ আত্মগোপনকারী সংস্থা। দলের যারা বাইরে, তারা গোপনে অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করে আন্দোলনকে উজ্জীবিত রাখার চেষ্টায় পরিশ্রান্ত ও হতাশায় জর্জরিত। বিহারের সাধারণ মানুষের কাছেও 'কেরাণ্টি' বা 'ক্রান্তি' ত্রাস সৃষ্টি করছিল। উপন্যাসের শেষ অংশ জুড়ে ঢোঁড়াই-এর বিচিত্র অভিজ্ঞতায় এ পর্বটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ১৯৪৪ সালের মে মাসে গান্ধীজী বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলেন।

১৯৪৫— এই বছরের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। দেশের রাজনৈতিক কর্মীগণ, কংগ্রেসের সংগঠন কর্মীরা এবং অন্যান্য সদস্যগণ— যাঁরা ৪২-এর আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন, যুদ্ধাবসানের পর সে সময়কার বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নির্দেশে জুন মাস থেকে একে একে সকলে মুক্তি লাভ করতে থাকেন।

এর আগে কংগ্রেসকে অবৈধ প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এই সময় সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল সিমলায় কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের আহ্বান করেন অন্তবর্তী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য। সিমলা বৈঠক চলে ২৫শে জুন, ১৯৪৫ থেকে ১৪ই জুলাই, ১৯৪৫ পর্যন্ত। কিন্তু বড়লাটের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

গান্ধীজী এই সময় নিজের দলের আত্মগোপনকারীদের 'সারেণ্ডার' করার নির্দেশ দেন।

"ঢোঁড়াই চরিতমানসে"র শেষাংশে 'রামায়ণজীর ক্ষোভ ও নিরাশা' অংশে আছে—'মাস্টার সাহেবদের জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। মাস্টার সাহেব বেরিয়েই ছাপা ইস্তাহার বার করেছেন কংগ্রেসের লোক যাঁরা আজও ফেরারী আছেন, মহাত্মাজীর আদে অনুযায়ী তারা সরকারের সম্মুখে অবিলম্বে নির্ভীক চিত্তে হাজির হয়ে যান। মহাত্মাজীর এই আদেশের পর আর আত্মগোপন করে থাকবার অর্থ হয় না। সর্বসাধারণকেও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এই মাসের পর কোনো ফেরারী ব্যক্তিকে তাঁরা যেন কংগ্রেসের লোক বলে ভুল না করেন। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী যাঁরা কাজ করেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত এই সময়ের মোকদ্দমাগুলির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আমরা বহন করব।' এরই কিছুকাল পরে সব দিক থেকে ব্যর্থ পরাজিত ঢোঁড়াই এগিয়ে গিয়েছে এস. ডি. ও. অফিসের দিকে 'সলণ্ডর' করত।*

---

* রাজনৈতিক কাল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে পূর্ণ সাহায্য পেয়েছি ডঃ অলোক রায়ের কাছ থেকে।

উপন্যাসের উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে "সতীনাথ গ্রন্থাবলী", ২য় খণ্ড, অরুণা প্রকাশনী, জুলাই, ১৯৭৩ থেকে।

## পরিশিষ্ট—১

### গ্রন্থাকারে ও গ্রন্থে অংশ বিশেষে সতীনাথ সম্পর্কিত আলোচনা


১. সতীনাথ-স্মরণে—সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, নভেম্বর, ১৯৭২, ভারতী ভবন, পাটনা ১; পৃষ্ঠা-ভূমিকা+১০+১৭৪।

২. সতীনাথ ভাদুড়ী জীবন ও সাহিত্য—ডঃ অরূপকুমার ভট্টাচার্য, ১৯৮৪, অনর্তপ্রকাশ, ৩২ বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলি ৩৪, পৃষ্ঠা ৩১২।

৩. সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা—গোপাল হালদার, জানুয়ারী, ১৯৭৮, অয়ন, কলিকাতা-৯; পৃষ্ঠা—নিবেদন+৪+মুখবন্ধ ৯-১১+১২-১২৬।

৪. সতীনাথ বিচিত্রা, প্রকাশভবন, প্রথম সংস্করণ, কার্তিক, ১৩৭২, ৩১৪ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থে—সতীনাথ স্মরণে-পৃ. ১-২। প্রকাশকের নিবেদন-পৃ. ১।

৫. উত্তর শরৎ বাংলা উপন্যাস, নারায়ণ চৌধুরী, জিজ্ঞাসা, কলকাতা-৯, মে, ১৯৮০, পৃ. ৫৩-৬৭।

৬. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়; পরিমার্জিত সংস্করণ ১৩৭২, মর্ডান বুক এজেন্সী, প্রা. লি. কলকাতা-১২; পৃ. ৭১৩, ৮১৪।

৭. বাঙলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি, গোপাল হালদার, ২য় সংস্করণ, ১৩৬৯, অগ্রহায়ণ, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা-৬, পৃ. ১৪০-৫৭।

৮. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়; পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, জুন ১৯৮০; পৃ. ৩৩৬-৩৭, ৩৪৫-৩৪৭।

৯. বাংলা উপন্যাসের ধারা, অচ্যুত গোস্বামী, পাঠভবন, ১২/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২। পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬৮; পৃ. ৩৬৯-৭১।

১০. বাংলা উপন্যাসে সমাজ চিন্তার বিবর্তন—ডঃ অসিত সিংহ, গ্রন্থমেলা, কলকাতা-৭, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১৭৮-৭৯।

পরিশিষ্ট—২

## বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সতীনাথ সম্পর্কিত রচনার তালিকা


১. অচিন রাগিণী অথবা টান ভালবাসার গল্প'; সুরজিৎ ঘোষ, "জলার্ক", কার্তিক ১৩৮৭-আষাঢ় ৮৮, পৃ. ৯০-৯৭।
২. 'আধুনিক এপিক : ঢোঁড়াই চরিতমানস', অশ্রুকুমার সিকদার, "পরিচয়", আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮০/১৩৮৭।
৩. উপন্যাস ও রাজনীতি', অলোক রায়, "অ" পত্রিকা, শারদীয়া ১৩৮৯, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৪৬-৪৯।
৪. 'ঔপন্যাসিক সতীনাথ ও উত্তরকাল', উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, "জর্লাক", কার্তিক ১৩৮৭ আষাঢ় ১৩৮৮; পৃ. ৪২-৪৯।
৫. ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়; "সাহিত্য ও সংস্কৃতি" শ্রাবণ, আশ্বিন ১৩৯১, পৃ. ২৪৩-২৬৬।
৬. 'গণনায়ক', নীরেন্দ্রনাথ রায়, "পরিচয়" জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৫৬।
৭. "চিত্রগুপ্তের ফাইল : ব্যক্তি ও রাজনীতি", মানব চক্রবর্তী, "জলার্ক", কার্তিক, ১৩৮৭ আষাঢ়, ১৩৮৮, পৃ. ৪২-৪৯।
৮. 'জনপদের জাগরণ : বিজন ভট্টাচার্যের উপন্যাস', সুবীর রায়চৌধুরী, "গন্ধর্ব" পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৮৪, পৃ. ৬২।
৯. 'জাগরীর সমালোচনা', অতুলচন্দ্র গুপ্ত, "দেশ", ৩০ চৈত্র, ১৩৫২।
১০. 'জাগরীর সমালোচনা', 'পুস্তক পরিচয়', নীরেন্দ্রনাথ রায়, "পরিচয়", ভাদ্র ১৩৫৩।
১১. জাগরী : একটি মনস্তাত্ত্বিক নির্মাণ, মঞ্জীর দেবরায়, "জলার্ক", কার্তিক ১৩৮৭-আষাঢ় ১৩৮৮, পৃ. ১৩-২৫।
১২. 'জাগরীর বাস্তব', পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, "জলার্ক", শ্রাবণ ১৩৮৮, পৃ. ১০১-১১।
১৩. 'জীবন শিল্পী সতীনাথ' গোপাল হালদার, "জলার্ক" কার্তিক ১৩৮৭ আষাঢ় ১৩৮৮, পৃ. ৫-৮।
১৪. 'ঢোঁড়াই চরিতমানস : একটি পুনর্মূল্যায়ণ', গুণময় মান্না; "জলার্ক", কার্তিক, ১৩৮৭-আষাঢ়, ১৩৮৮, পৃ. ২৬-৪১।
১৫. 'তাৎমাটুলির ঢোঁড়াই', রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, "বীক্ষণ", শারদ সংখ্যা, ১৯৭০ পৃ.—?
১৬. 'দিগভ্রান্ত উপন্যাসের শিল্পরহস্য', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, "জলার্ক", কার্তিক, ১৩৮৭-আষাঢ় ১৩৮৮, ৬৭-৭৫।

১৭. 'নখদর্পণে ভারতবর্ষ : ঢোঁড়াই চরিতমানস', সুনিতা চক্রবর্তী, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৯; পৃ. ২৩৬-৪৫।
১৮. 'পুরাতনী', সুনীল দাশ, "দেশ"২০শে আগস্ট, ১৯৮৩, পৃ. ৫৭।
১৯. 'পূর্ণিয়া ও সতীনাথ', 'সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, "স্মরণিকা', বিহার বাঙালি সমিতি, পাটনা, আগস্ট, ৮১।
২০. প্রবাসী সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী—শঙ্কর ঘোষ; 'অনুভূতি' ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২/২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা; পৃ. ১৮-২০।
২১. 'প্রসঙ্গ সতীনাথ ভাদুড়ী'; ডঃ অরূপকুমার ভট্টাচার্য, "সাহিত্য দর্পণ", শারদীয়া ১৩৯১, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ৬৫-৭৫।
২২. 'বাঙলা উপন্যাসে রাজনীতি, অশোক রুদ্র, "মহানগর", ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩, পৃ. ১৫-২৪।
২৩. 'বাঙলা উপন্যাসে ভারত চিন্তা', চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, "দেশ", সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৪, পৃ. ৮১-৮৭।
২৪. 'বাঙলা উপন্যাসে মনোবিকলন : বিকাশ ও বৈচিত্র্য', পশুপতি শাসমল, "ধূসর পাণ্ডুলিপি", ৪র্থ বর্ষ, ১২ সংকলন, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮২ পৃ. ৮৫-১০৮।
২৫. ক. 'বাঙলা রাজনৈতিক উপন্যাস', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, "শিলাদিত্য", জুলাই, ১৯০১ পৃ.?।
খ. 'বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস (১৯৪৮-৮২)' তাপস মুখোপাধ্যায়, 'আন্তরিক', ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ৮৩, পৃ. ৪৭-৫২।
২৬. 'বাঙালীর ফরাসীচর্চা', স্বপন দাস অধিকারী, "অন্বিষ্ট", অক্টোবর, ১৯৭৭ পৃ. ১৪৩-১৬৯।
২৭. 'বিহারের লেখনী চিত্রকর সতীনাথ', শঙ্কর ঘোষ, "পত্রপুট', ১৯৮৪, ১৪ সংখ্যা, পৃ. ১১-১৫।
*২৮. 'মহৎ লেখকের শেষ উপন্যাস', ভবানী মুখোপাধ্যায়, 'অমৃত', ২১শে এপ্রিল, ১৯৬৭; পৃ.?
২৯. 'রাজনীতি উপন্যাস সতীনাথ ভাদুড়ী', কার্তিক লাহিড়ী, "এক্ষণ", ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৭৮, পৃ. ২২-৩৭।
৩০. 'রাজনীতি উপন্যাস সতীনাথ ভাদুড়ী : বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস', কার্তিক-লাহিড়ী; "সারস্বত",? বছর; পৃ. ১২৯-৩৫২।
৩১. 'রাজনৈতিক ভাবান্দোলনের পটভূমিকায় বাঙলা উপন্যাস ও জাগরী', উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, "সারস্বত", শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৮ পৃ. ১৯৩-২০৩।
৩২. 'রামায়ণী জট ও ঢোঁড়াই', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'জলার্ক', ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম সংকলন শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৮৮; পৃ. ১২২-১১৮।
৩৩. 'লেখকের লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী', শঙ্কর ঘোষ; "পুরশ্রী" ২৯শে মার্চ, ১৯৮০;

২য় বর্ষ, ২৩ সংকলন, পৃ. ১২০০-১২০২।
৩৪. 'শ্রদ্ধাস্পদ সতীনাথ ভাদুড়ী', বনফুল; "দেশ", ১০ই এপ্রিল, ১৯৬৫ পৃ. ৯৩৭।
৩৫. 'সতীনাথ ও পূর্ণিয়া', সন্তোষ কুমার মজুমদার, "জলার্ক", কার্তিক ১৩৮৭-আষাঢ় ১৩৮৮, পৃ. ৯-১২।
৩৬. 'সতীনাথ প্রসঙ্গে', ফণীশ্বর নাথ রেণু, "কৃত্তিবাস", অগ্রহায়ণ ১৩৮১, পৃ.?
*৩৭. 'সতীনাথ প্রসঙ্গে', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "দেশ" ১০ই জুন, ১৯৭২।
৩৮. 'সতীনাথ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য', "জলার্ক", কার্তিক ১৩৮৭ আষাঢ় ১৩৮৮, পৃ. ১৪৬-৫১।
৩৯. সতীনাথ, প্রাসঙ্গিক তথ্য, "জলার্ক", শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৮৮/৬-৮ম সংকলন সতীনাথ অনুপূরক ক্রোড়পত্র, পৃ. ১১৯-১২২।
*৪০. 'সতীনাথ মনন ও শিল্প', মিহিরকুমার মজুমদার, 'পল্লী পত্রিকা', (অধুনা লুপ্ত)।
৪১. 'সতীনাথ ও সত্যি ভ্রমণ কাহিনী', কুমার ভট্টাচার্য, "জলার্ক", কার্তিক ১৩৮৭-আষাঢ়, ১৩৩৮; পৃ. ৫০-৬০।
৪২. "সতীনাথ সম্পর্কিত রচনাপঞ্জী", মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, "জলার্ক", কার্তিক ১৩৮৭-আষাঢ়, পৃ. ১২৫।
৪৩. 'সতীনাথ : সামাজিক শৈলী বিজ্ঞানের একটি সমীক্ষা', বীতশোক ভট্টাচার্য; "জলার্ক", কার্তিক ১৩৮৭-আষাঢ় ১৩৮৮, পৃ. ১৩৪-৪০।
৪৪. 'সতীনাথ সাহিত্যে অবহেলিত মানুষ', শঙ্কর ঘোষ, "ধনধান্যে", ১-১৫ই অক্টোবর, ১৯৮৪, ষোড়শ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা; পৃ. ২১-২২।
৪৫. 'সতীনাথ সাহিত্যের চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ', ধীমান দাশগুপ্ত, "জলার্ক" কার্তিক ১৩৮৭-আষাঢ় ১৩৮৮, পৃ. ১৪১-৪৫।
৪৬. 'সতীনাথের বাস্তবতা', সুব্রত পাণ্ডা, "জলার্ক", কার্তিক, ১৩৮৭-আষাঢ় ১৩৮৮, পৃ. ১১০-১৬।
*৪৭. 'সতীনাথের ছোটগল্প', শচীন বিশ্বাস, "অনুক্ত", শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭৭ পৃ.?
৪৮. 'সতীনাথের মৃত্যু সংবাদ', "আনন্দবাজার পত্রিকা", মার্চ, ৩১, ১৯৬৫ পৃ. ১ম।
৪৯. 'সতীনাথ ভাদুড়ী', আশা দেবী, "অমৃত", নববর্ষ সংখ্যা, ২৬শে বৈশাখ, পৃ. ১০৪-১০৫।
৫০. 'সতীনাথ ভাদুড়ী', নারায়ণ চৌধুরী, "চতুষ্কোণ" শারদীয়া সংখ্যা, ১৭ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৮৪, পৃ. ৪২৪-৩২।
৫১. 'সতীনাথ ভাদুড়ী : চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা ও উপাদান', ধীমান দাশগুপ্ত, মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি প্রকাশিত "প্রতিবিম্ব", ৩য় সংখ্যা '৭৮, পৃ. ১-৬।
৫২. 'সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেণু', অলোক রায়, "দিগঙ্গণ", অক্টোবর ১৯৮২। লেখাটি পুনঃ প্রকাশিত হয় শারদীয় "লোকায়ত", ১৩৯০, দশম বর্ষ,

পৃ. ১৯-২৪।

৫৩. 'সতীনাথ ভাদুড়ী ও বাংলা ছোটগল্প', তমাল বন্দোপাধ্যায়', জলার্ক', কার্তিক, ১৩৮৭-আষাঢ়, ১৩৮৮, পৃ. ৭৬-৮৯।

*৫৪. 'সতীনাথ ভাদুড়ী : যেমন ভেবেছি', বিমল কর, "দেশ", ১০ই এপ্রিল, ১৯৬৫।

৫৫. 'সতীনাথ ভাদুড়ী, রাজনীতি ও সাহিত্য', ইরাবান বসুরায়, "অনুষ্টুপ", দ্বাদশ বর্ষ, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ২-৪র্থ সংখ্যা ১৩৮৬ পৃ. ৪৭-৮১।

৫৬. 'সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্প', তাপস মুখোপাধ্যায়, "শিলাদিত্য", নবপর্যায় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১/১-১৫-ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩/বাং ১৪-২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৯০, পৃ. ২২-২৪।

৫৭. 'সতীনাথ ভাদুড়ীর রোজ নামচা', শঙ্কর ঘোষ, "তিতাস" এপ্রিল-জুন ১৯৮৪, ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা পৃ. ১৩-১৬।

৫৮. 'সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখায় আদিবাসী ও অবহেলিত মানুষ', শঙ্কর ঘোষ, "বেতার জগৎ", ৫৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা; ১৬-৩১ জানুয়ারী, ১৯৮৩; পৃ. ৩৮-৪১।

৫৯. 'সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য ও তার উত্তরাধিকার', সুনীল দাশ, "প্রমা", ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ১৯৮১; পৃ. ৪১-৫৫।

৬০. 'সমালোচনার নামতা ও ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী', উদয়নারায়ণ সিংহ, "গাঙ্গেয় পত্র", ৩য় সংকলন, আশ্বিন, ১৩৮৩; পৃ. ১২-২৯।

৬১. সংকট : 'একটি অসংলগ্ন আত্মানুসন্ধান', প্রতীপ রায়গুপ্ত, "জলার্ক', কার্তিক, ১৩৮৭-আষাঢ়, ১৩৮৮, পৃ. ৫৭-৬৬।

৬২. 'সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী : মনস্তত্ত্বের আলোকে', অরুণা-হালদার, "জলার্ক', কার্তিক ১৩৮৭-আষাঢ়, ১৩৮৮; পৃ. ১২২-৩৩।

* চিহ্নিতগুলি "সতীনাথ-স্মরণে", সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

রচনাপঞ্জী প্রস্তুত করতে গিয়ে লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর সহৃদয় বন্ধু সন্দীপ দত্তের সহযোগিতা পেয়েছি। এছাড়া "জলার্ক" "সতীনাথ সংখ্যা" ১৩৮৭-৮৮ থেকেও সাহায্য নিয়েছি।

12.04.24